জাগ্রত দক্ষিণপূর্ব এশিয়া

শিশির সেনগুপ্ত

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

কলকাতা • ১৩৫৩

প্রথম প্রকাশ—১৩৫৩

প্রচ্ছদপট—পি, দেব।

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে
জে, এন, সিংহ রায় কর্তৃক প্রকাশিত
২২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলকাতা।
দি প্রিন্টিং হাউস, ১৫৭এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা থেকে
হীরেন্দ্রকুমার দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের উদ্দেশ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে 'দিল্লী চলো' আওয়াজ তুলে আজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিরিশ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়কে জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য মিলিত প্রচেষ্টায় ব্রতী হতেই হবে।

এই তিরিশ লক্ষ ভারতীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। সেই কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের এবং ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে কিছু জানা একান্ত প্রয়োজন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে বহুকাল ধরেই বৃহত্তর ভারত বলে জগৎবাসী জানত। তার কারণ ভারতের সঙ্গে ওসব দেশের পরিচয় এবং লেনদেন ইতিহাসের মতই প্রাচীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চীনা এবং আরব বিবরণী থেকে ভারতের এইসব কীর্তিকথা উদ্ধার করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকের খনিত্রের মুখে পুরাণো দিন উদ্ঘাটিত হয়েছে ভাস্বর আলোয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ এবং সভ্যতার দিকে তাকালেই আজো ভারতের সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে সহজভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্য ও ইতিহাস থেকেও সেদিনকার মালমশলা পাওয়া গেছে যথেষ্ট। আংকর এবং বরবড়রের মন্দিরের বিরাট মহিমা আজো সেইসব সমৃদ্ধ দিনের সহস্র কাহিনীর মূক সাক্ষী হয়ে আছে।

খৃষ্ট শতকের প্রথম দিক থেকেই ভারত হতে উপনিবেশ গঠন-কামী মানুষের দল ভারতভূমি ত্যাগ করে দূরের পাল্লা দিতে সুরু করেছে। সিংহল, মালয়, বর্মা, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, শ্যাম, কম্বোজ এবং ইন্দোচীনে তারা বাণিজ্য চালিয়েছে। ফিলিপাইন, ফারমোসা অবধি তাদের পাল্লা গিয়েছে। এইসব এলাকার ভাষায় সংস্কৃত এবং দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার সংমিশ্রন অত্যন্ত। এই উপনিবেশ সৃজনকারী দল ভারত সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকেই গিয়েছিলেন, কেন না প্রায় একই সময়ে এইসব বিস্তীর্ণ দ্বীপ ও ভূভাগে ভারতীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত হতে পেরেছিল। নবম শতক অবধি এই ঢেউ চলেছিল অবিরাম গতিতে। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রের যেসব প্রয়োজনীয় অধিকার থাকা প্রয়োজন একটি রাষ্ট্রের পক্ষে সেইসব গুরুত্বপূর্ণ এলাকাতেই ভারত সাম্রাজ্য উপনিবেশ রচনা করেছিল। তৎকালীন যুগে সেইসব এলাকার নামকরণও হয়েছিল ভারতীয় প্রসিদ্ধ স্থানের নাম অনুযায়ী। আজকের দিনের ইন্দোচীনের কম্বোডিয়া সেদিনকার কম্বোজ। শ্যাম সম্পূর্ণ ভারতীয় নাম। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপে ভারতের দান অতুলনীয়। আংকর বহুদিনের পরিচিত ওংকার ধাম। কবি সত্যেন দত্তের ভাষায়—

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি,
শ্যাম কম্বোজে ওংকার ধাম মোদের প্রাচীন কীর্তি।

মনে রাখা প্রয়োজন যে উপনিবেশ রচনায় মন দেবার অনেক যুগ আগে থেকেই ভারত থেকে ঐসব দ্বীপদেশে এবং সেগুলি অতিক্রম করে আরো দূরতর দেশেও ভারতের বাণিজ্য ডিঙা পাড়ি দেওয়া সুরু করেছিল। সেইসব বাণিজ্যিক বিবরণী নানা সূত্র থেকেই প্রামান্য হিসেবে পাওয়া গেছে। ভারতের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ এবং বর্ধমান অর্থনীতির ফলেই ভারত আরো দূর দূর দেশে বাণিজ্য বীতংস ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।

রাজা অশোকের সময় থেকেই ভারত থেকে বৌদ্ধ প্রচারকের দল এইসব বাণিজ্য ডিঙার সঙ্গে নানা দিগদেশে ছড়িয়ে পড়তে সুরু

করেন। দিনে দিনে [illegible] ভারতের তীরভূমি ডিঙিয়ে এইসব দেশে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। ভারতের সঙ্গে আর এক নূতন ধর্ম বাঁধনে জড়িয়ে পড়তে সুরু করে সেইসব দেশের মানুষ। চীন, ভারত, পারস্য, আরব এবং [illegible] বাণিজ্যিক সড়কের মধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলি পান্থশালার মত। বহু প্রাচীন কাল থেকেই ঐসব দ্বীপ ও ভূভাগের প্রাকৃতিক সম্পদের কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

অনেক পণ্ডিতের মতে ভারত থেকে যেসব বাণিজ্যিক বহর এইসব বহির্ভারতীয় দেশে বাণিজ্য চালাত তাদের অধিকাংশেরই কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলা এবং উড়িষ্যা। বর্মা এবং মালয়ের ভিতর দিয়েও বাণিজ্য প্রবাহ সমুদ্রে গিয়ে পড়ত। দক্ষিণ ভারতও বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রবল হয়ে ওঠে এই সময়।

খৃষ্ট শতকের প্রথম থেকে সুরু হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম বিরাট কেন্দ্রীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয় শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য নামে নবম শতাব্দীতে। মালয় উপদ্বীপে এই সাম্রাজ্যের পত্তনী হলেও এক সময় সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব চালু হয়। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের মূল অনুপ্রেরণা বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের সমসাময়িক কালেই মালয়ে, কম্বোজে, জাভায় এবং আনামে ছোট ছোট রাষ্ট্র ক্রমশঃই শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। এই সময় জয়বর্মা নামে একজন সম্রাটের অধীনে এইসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সংহত হয়ে ওঠে এবং শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করে। এই রাষ্ট্র সংঘের রাজধানী ছিল ওংকার ধামে। এরা সময় সময় শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব মেনে নিলেও বারে বারে নিজেদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনেছে। এই মিলিত রাষ্ট্রসংঘের স্বাধীন সমৃদ্ধিশালী সত্তা প্রায় চারশ' বছর ধরে পরাক্রমশালী সম্রাটদের সুশাসনে দিনে দিনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। একসময় ওংকার সারা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নগর হয়ে ওঠে। এই কম্বোজ সাম্রাজ্য চতুর্দশ শতাব্দী অবধি গৌরবান্বিত হয়ে থাকে। কিন্তু তারপর

আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এতবড় নগর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অনেক বিজ্ঞানীদের মতে মেকং নদীর হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের ফলেই এই মহৎ সর্বনাশ ঘটে—যার ফলে সমগ্র ওংকার নগর ও তার প্রতিবেশী অঞ্চল পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিণত হয়।

নবম শতাব্দী থেকেই জাভার সম্রাটও শৈলেন্দ্র রাজাদের প্রভাবমুক্ত হবার চেষ্টা করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে সেই সংঘর্ষ প্রখর হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ভারতের চোলা সাম্রাজ্যের সঙ্গে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের যুদ্ধ বেধে ওঠে এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে চোলারাই ইন্দোনেশিয়ায় শ্রেষ্ঠত্ব অধিকার করে। কিন্তু পরে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য আবার ইন্দোনেশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় বটে কিন্তু তার পরাক্রম তখন যথেষ্ট ক্ষুন্ন হয়ে এসেছে। আরো তিনশ' বছর পরে জাভা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। শ্যামও সেই সঙ্গে স্বাধীন রাষ্ট্র শক্তিতে পরিণত হয়।

জাভাদ্বীপের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস বহুদিনের। এখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবান্বিত রাষ্ট্র বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তার সত্ত্বেও শক্তিমান ছিল। জাভার অধিবাসীরা অধিকাংশ নৌবাণিজ্য প্রিয়। পাথরের বড় বড় মন্দির ও প্রাসাদ তারা নির্মান করেছিল আশ্চর্য সুন্দর করে কুশলী হাতে। এই ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রশক্তি শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অগ্রগতি ও বিস্তৃতিকে কঠিনভাবে প্রতিরোধ করেছিল। ১২৯২ সাল থেকে জাভার ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদ উদ্ঘাটিত হোল। মাঝপীঠ নামে নূতন একটি নগর পত্তনী হোল সেখানে এবং এই মাঝপীঠ সাম্রাজ্যই অবসন্ন শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পর সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিপত্তি-শালী হয়ে ওঠে। এক সময় এই মাঝপীঠ রাষ্ট্রের সঙ্গে চীন সম্রাটের সংঘর্ষ বাধে। চীন সম্রাট কুবলাই খাঁয়ের আক্রমণকারী সৈন্যদের কাছ থেকেই এরা বিস্ফোরকের ব্যবহার শেখে এবং সেই বিস্ফোরক ব্যবহারের ফলেই জাভায় শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এই দুই রাষ্ট্রশক্তির সর্বনাশা কলহের ফলেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরবের ইসলাম শক্তির প্রাবল্য বেড়ে ওঠে।

মাঝপাহিৎ রাষ্ট্র জাভাকে সর্ব প্রকারে সমৃদ্ধ করে তোলে। জাভা পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়। কিন্তু আত্মবিরোধের সুড়ঙ্গ দিয়ে আরব শক্তি এখানে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করে এবং কিছুকালের মধ্যে মালয়, সুমাত্রা, বোর্ণিও এবং ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে। যার ফলে এইসব এলাকায় আজ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু আরবরা এখানে শান্তিতে রাজ্যচালনা করতে পারেনি' বেশীদিন। ষোড়শ শতাব্দীতে মাঝপাহিৎ সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এবং আরব সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার মুখে মুখেই ১৫১১ সালে পর্তুগীজ শক্তি মালাক্কায় এসে অবতরণ করে এবং দ্বীপ দখল করে।

বহু প্রাচীন আর্য সভ্যতার ইতিহাসের অব্যাহত ধারা যে মুহূর্তে থমকে পড়েছে য়ুরোপের নবজাগ্রত শক্তিগুলি সেই মুহূর্তেই এসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হামলা সুরু করেছে।

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস গৌরবময়। মাত্র পাঁচশ' বছর আগে অবধি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্র সখ্যতা ছিল প্রধান। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নাম বৃহত্তর ভারত। আজকের দিনের আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় নিক্ষেপ করে তাই স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সঙ্গে এইসব দেশের ঘনিষ্ঠতা কত।
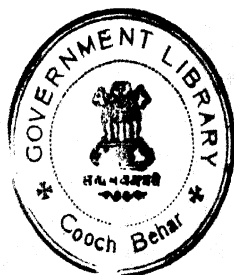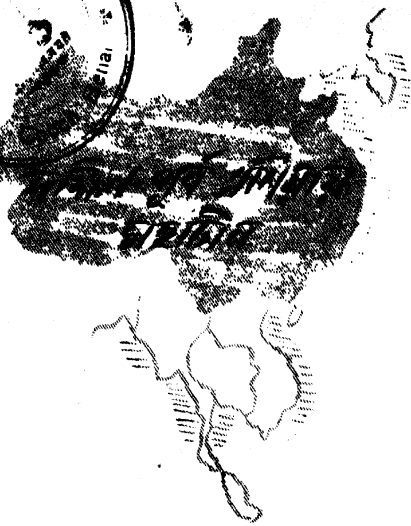
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে এবং ভূভাগে সভ্যতার উত্থান পতনের ক্রমনিবদ্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চীনা সাহিত্য ও ইতিহাস থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছে। এই সব দেশে চীনা এবং ভারতীয় পরিব্রাজক, ধর্মপ্রচারক ও ব্যবসায়ীরা বহুকাল ধরে আনাগোনা করছেন। ভারতীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসও বহু দিনের। তবু অতি আধুনিক কালেও ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির জোয়ার একেবারে স্তিমিত হয়ে আসেনি সেখানে। কেননা নিছক সাম্রাজ্য বিস্তার ও পুঁজিবাদি শোষণের অভিপ্রায়ে ভারতীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়নি সে-সব দেশে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতা এবং সংস্কৃতির যে-সব নিদর্শন সেখানে আজও বিরাজমান তা দেখেই বলা চলে যে, এক সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সভ্যতার উন্নত শীর্ষে উঠেছিল।

পরবর্তী যুগে পৃথিবীর নানা দেশ এখানে ব্যবসা চালিয়েছে। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে। হানাহানি, ধ্বংস এবং কুটচক্রান্তের চাকার নীচে সে দেশের নিরীহ

মানুষ অনেক থেঁৎলে গেছে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিচয় য়ুরোপের সঙ্গে বড় অশুভ লগ্নে। সারা য়ুরোপের মধ্যে ডাচ, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, বৃটিশ এবং আরো পরবর্তী যুগে নয়া পৃথিবীর আমেরিকা—এক হয়ে দুঃশাসন চালিয়েছে, নয়ত শোষকযন্ত্র দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রক্ত শোষণ করছে। য়ুরোপীয় উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া শিক্ষায় বঞ্চিত হয়েছে, স্বাস্থ্যহানিতে জীর্ণ হয়েছে এবং মনুষ্যত্বের বিনিময়ে ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতে করতে ক্লীবত্বের নরকগামী হতে বসেছিল।

সাম্প্রতিক যুগে সারা দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ তার বীভৎস দংষ্ট্রায় আত্মপ্রকাশ করেছে। পুঁজিবাদের জীর্ণ মুখোস খসে পড়েছে। এও ঐতিহাসিক বিবর্তন। সারা দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষ আজ মুক্তি চাইছে। অসত্য আর অন্যায়ের কবল থেকে মুক্ত হয়ে সে প্রসন্ন সূর্যালোকের প্রত্যাশী। তার জন্য যা কিছু তপশ্চর্যা ও সংগ্রাম তা সে করতে প্রস্তুত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

প্রাক্‌যুদ্ধকালে বিশ্বের মানুষ এই সব এলাকার অধিবাসীদের কথা গভীরভাবে চিন্তা করেনি। তমিস্রার অন্তরালে চলে গিয়েছিল যেন সে দ্বীপপুঞ্জ। যদিও বিশ্বের দরবারে সে দেশের মানুষের আজাদী পুকার মন্দ্র মন্দ্রিত হয়নি—তবু একথা ভাবা অত্যন্ত লজ্জার হবে যে, সেখানে জাতীয় গণ-চেতনা ইতিপূর্বে উদ্বুদ্ধ হয়নি। বরং বিংশ শতকের সুরু থেকেই এই সব দেশে জাতীয় আন্দোলন সুরু হয়েছে এবং সেই শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে সে সব দেশে জনবিক্ষোভ প্রবলতর হয়েছে। শাসক সম্প্রদায়ের কঠিন দমনমূলক ব্যবস্থায় সেখানে আপাতঃ শান্তি ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু বহ্ন্যমান আগ্নেয়গিরি প্রতি মুহূর্তে চরম বিস্ফোরণের জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে। যুদ্ধমধ্য এবং যুদ্ধোত্তর মাসগুলিতে ইন্দোনেশিয়ায়, মালয়ে, ইন্দোচীনে, বর্মায় এবং সর্বত্র যে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে তারই ফলে বোঝা

গেছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাগ্রত জনমতের বজ্রমুষ্টি সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের শাসন ও শোষণ চিরস্থায়ী করে রাখতে দেবে না। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে এবং যোগ্যতায় তারা যে আর পিছিয়ে পড়া দেশ নয় এ প্রমাণ তারা করেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নানা সমস্যা। সে সব নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করতে চাই না। আমরা একটিমাত্র বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সে হোল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনা স্বার্থ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদের কথা আজ আর মনে রাখবার প্রয়োজন নেই কারুর। প্রত্নতাত্বিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে, এই দ্বীপপুঞ্জগুলি বহু শতাব্দী আগে থেকেই সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল এবং সেখানকার আদিম অধিবাসীরা সভ্যতার প্রথম কয়েকটি ধাপ অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়েছিল।

এরপর এশিয়ার নানা ভূভাগ থেকে নানা সময়ে এসেছে নূতন ধরণের মানুষ। সংগ্রাম হয়েছে, সংকর জাতি উৎপন্ন হয়েছে এবং ধীরে ধীরে এই সব বহিরাগত মানুষদের চাপে পড়ে আদিম বাসিন্দারা আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া কম বিপজ্জনক এলাকায়। এই সব আদিম অধিবাসীদের আজও দেখা পাওয়া যায় দ্বীপপুঞ্জের গভীর অন্তর্দেশে। তাদের প্রাচীন জীবন প্রণালী আজও অনেকাংশে অক্ষত আছে। এরা বেশীর ভাগই যাযাবর শ্রেণী।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় এবং চীনা সংস্পর্শ অনেক পণ্ডিতের মতে সমসাময়িক। ভারতীয় সংস্কৃতি গিয়েছিল দক্ষিণ ভারত থেকে প্রথমে। পরে আর্যসভ্যতা দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হয়ে ক্রমে ক্রমে সারা ভারতভূমিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ভারতের তীরভূমি ও পর্বত ডিঙিয়ে পৌঁছয় এই সব দ্বীপকেন্দ্রে ও সংলগ্ন ভূমিভাগে। বৌদ্ধ স্বর্ণ-যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অভিভূত ক'রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ ভাব বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং

চীনে বুদ্ধের শরণ ভিক্ষুদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে থাকে। আজকের যুগে বুদ্ধভূমি ভারতে বৌদ্ধ সংখ্যা নগণ্য হলেও ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতে বৌদ্ধরা প্রবল।

হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। সেই সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানও প্রবল হয়ে উঠে। কিন্তু মহাচীন এই সব ভূমিভাগে দশ শতক অবধি কেবল পরিব্রাজক, ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছে। চীনা ব্যবসায়ীরা এই সব সম্পদশালী দ্বীপমালা থেকে বাণিজ্য লক্ষ্মীকে ঘরে আনবার চেষ্টা করেছে। এইসব এলাকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা তার সফল হয়নি—সাময়িক কর্তৃত্ব অচিরেই ধূলিসাৎ হয়েছে।

অথচ আশ্চর্য এই যে, আজকের দিনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়ের সংখ্যা খুব বেশী নয়, কিন্তু চীনা জনসংখ্যা প্রচুর। সে সব জায়গায় চীনা জনসংখ্যা গুণতে হয় লক্ষে এবং এই সব দেশে চীনা প্রযুক্ত মূলধন অর্থাৎ চীনা বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ। সেই হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনারা গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করে তুলেছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক যুদ্ধের শেষে মহাচীন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

এর জন্য একটু পিছনে তাকানো প্রয়োজন।

খৃষ্ট শতকের প্রারম্ভেই চীন বর্মার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। উদ্যোগী চীনা ব্যবসায়ীরা ইন্দোচীন ও মালয়ে আসা-যাওয়া সুরু করেছে। এর অনেক আগে থেকেই চীনা ধর্মপ্রচারক ও পরিব্রাজকরা এই সব দক্ষিণ দেশগুলিকে তাঁদের সফর তালিকায় পেয়েছিলেন। ৪১৪ সালে ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যে একজন চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক গিয়েছিলেন এমন সংবাদ পাওয়া গেছে। ৬৭১ সালে ক্যান্টন থেকে শ্রীবিজয়ে গিয়ে পৌঁছেছিলেন ই-সিঙ নামে আর একজন চীনা ধর্মযাজক।

চীনের তাং সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্তে মালয় উপদ্বীপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীর কথা বারংবার উল্লেখ আছে। জাভা, ক্রণেই এবং দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাজ্য থেকে উপঢৌকন যেত চীনা সম্রাটের কাছে। ঐ সব দেশের রাজদরবারে প্রতিনিধিরা আসা-যাওয়া করতেন। খৃষ্টাব্দের দশম শতকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলত চীনা এবং আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমিকে।

এই সব বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের ফলে ধীরে ধীরে চীনা সম্রাটদের লোভের অগ্নিতে ইন্ধন পড়তে লাগল। সমৃদ্ধিশালিনী প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে প্রাচুর্যের অধিকারিণী কন্যা দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াকে অংকলক্ষী করবার দুর্বার আকাংখায় মত্ত হলেন চীনা সম্রাট। ১২৯৩ সালে কুবলাই খাঁ জাভার রাজপুত্রকে শাস্তি দেবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করলেন। কিন্তু সে আশা বিধ্বস্ত হোল। আরও এক শতাব্দী পরে ইয়ং লো ফিলিপাইনের শাসনকর্তার কাছ থেকে জোর করে বাৎসরিক সেলামী আদায় সুরু করলেন। ১৪০৭ সালে চীনা সার্বভৌম শক্তি দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আর একবার প্রবল চেষ্টা করল। চ্যোং হো নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে এক বিরাট চীনা নৌ-বাহিনী ম্যানিলায় এসে অবতরণ করল। সেখান থেকে অভিযান দক্ষিণমুখী চলল সুলু সমুদ্রভাগে —সেখান থেকে উত্তর বোর্ণিওতে এবং আরো দক্ষিণে ইন্দোচীনে! এই ধরণের আরো কয়েকটি অভিযানের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কতকগুলি দুর্বল ছোট ছোট রাষ্ট্র আত্মসমর্পণে বাধ্য হোল। কিন্তু এ কর্তৃত্ব বেশী দিন অক্ষুণ্ণ থাকেনি। চীনা সাম্রাজ্যবাদ গুটিয়ে নিল তার ধ্বংস বীভৎস।

এ ভিন্ন নানা সময়ে আরো ব্যর্থ অভিযান চালানো হয়। কিন্তু এই সব অভিযানের একটা দূরপ্রসারী ফল হয়েছিল। সে এই যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে চীনা জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে দ্রুত লয়ে। জানা গিয়েছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্পেনীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই মিণ্ডোরো দ্বীপেই চীনা সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল দশ হাজার।

এই ধরণের রাষ্ট্র সংগঠনের চেষ্টা ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়

চীনা ব্যবসায়ীরা নিঃশব্দ বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের ব্যবসায়ের ধরণই ছিল আলাদা। চীনা জাহাজ ভর্তি মাল নিয়ে গিয়ে ব্যবসায়ীরা তীর এলাকায় অবতরণ ক'রে ঘণ্টাধ্বনি করত। স্থানীয় বাসিন্দারা জানতে পেরে বিনিময়-সামগ্রী নিয়ে তীরভূমিতে এসে ভীড় করত। তারপর বিনিময়-পদ্ধতিতে চলতো বেচাকেনা। এই সব নিঃশব্দ বেচাকেনার নিদর্শন আজো দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের ঘরে। সে-সব চীনা সামগ্রী বহুকালের ; বিশেষ করে ফিলিপাইনের অন্তর্দেশগুলিতে সিং, চিং এবং পরবর্তী কালের চীনা শিল্পের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। কেবলমাত্র অতি-প্রতিবেশী দ্বীপগুলিতেই নয়, দক্ষিণ শ্যাম এবং তারও পশ্চিম এলাকায় এই সব নিদর্শন প্রচুর সংখ্যায় সংগৃহীত হয়েছে।

মহাচীনের সঙ্গে এই সব পরিচয় নিছক বাণিজ্যিক ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই সব বাণিজ্যিক সম্পর্কের ফলে যদিও চীনা শিল্প-পদ্ধতি এখানে প্রসার লাভ করেছে, কিন্তু চীনা জীবন, সাহিত্য অথবা সমাজ-জীবনের কোন ছাপ পড়েনি এই সব দ্বীপে। চীনা রাজনৈতিক জীবন এখানে নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ বা সুযোগ পায়নি। যদিও ধীরে ধীরে এখানে চীনা বাসিন্দার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

য়ুরোপীয় শক্তিগুলির এদেশে শাসন-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে চীনা ব্যবসায়ীরা আরো অধিক সংখ্যায় ম্যানিলা এবং অন্যান্য ব্যবসাকেন্দ্রে তাদের যাতায়াত সুরু করল। এই সব এলাকার চীনারা কেবল যে নিজেদের বাণিজ্যিক সুবিধা সম্প্রসারণ চালু করল তা নয়, এই সব সম্পূর্ণ বিদেশী শাসনকর্তা ও সেখানকার বিদেশীদের কাছে তারা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। স্বাধীন ব্যবসায়ী ছাড়াও একদল দালাল এখানে সৃষ্টি হোল। এ ভিন্ন সদ্য আগত বিদেশী বণিক দলের চেয়ে এদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং বহুদিনের ব্যবসায়িক একচেটিয়ার ফলে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ বাধতে লাগল। হত্যা এবং হানাহানি অনুষ্ঠিত হতে লাগল ব্যাপকভাবে।

ম্যানিলায় এদের সহরের একাংশে কোণ ঠাসা হয়ে থাকতে হোত। সংবাদে প্রকাশ যে, ১৬০৩ সালের বিদ্রোহে তেইশ হাজারের বেশী চীনা এখানে নিহত হয়। কিন্তু দু'বৎসরের মধ্যে আবার সেখানকার চীনা জনসংখ্যা ছ'হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম দিকে যেসব চীনা এই সব দ্বীপপুঞ্জে আসত, তারা ধনী চীনা ব্যবসায়ী। তারা কিছুকাল সেসব জায়গায় থেকে স্থানীয় মেয়ে বিয়ে করে স্ফীতোদর হয়ে আবার দেশের মায়ায় ফিরে যেত। কিন্তু পরবর্তী যুগে ক্রমশঃ দরিদ্র চীনারাই এই সব দ্বীপে জীবিকার জন্য দলে দলে আসা সুরু করল। অজস্র দমনমূলক ব্যবস্থা এবং বিধিনিষেধের বেড়াজাল সত্ত্বেও এইসব চীনারা ধীরে ধীরে ব্যবসা এবং শ্রমজীবন দখল করে বসল। দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র তাদের সংখ্যা স্ফীত হয়ে উঠতে সুরু করল। আজকের দিনে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ধনী চীনা এবং শ্রমজীবী চীনার সংখ্যা প্রচুর। এদের মধ্যে শিক্ষাও যথেষ্ট।

মালয়ের চীনাদের সুযোগ ঘটেছিল আরো বেশী। মালয়বাসীরা কোনকালেই এইসব বহিরাগত শ্রমজীবী ও কুলিদের পথে বাধা দেয়নি। ব্রিটিশ পুঁজিবাদ মালয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগে থেকেই এখানকার টিন খনিতে চীনা মূলধন খাটছে। এর পর যখন রবার চাষ সুরু হোল, মালয়বাসীদের অনিচ্ছুক সহযোগিতার পথ ধরে হাজার হাজার চীনা এইসব চাষ এলাকায় এসে জমায়েৎ হোল এবং বৎসরে বৎসরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রথম দিকে সকলেই অস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে এল বটে ; কিন্তু তাদের পক্ষে মালয়ের স্থায়ী বাসিন্দার অধিকার লাভ করতে দেরী হল না। কিছুকালের মধ্যেই সমগ্র মালয়ের অর্থনৈতিক কাঠামোয় চীনারাই হয়ে উঠল প্রধান। সিংগাপুর, পেনাং এবং কুয়ালালামপুরের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব সমৃদ্ধ সহর ও বন্দর এলাকায় চীনারা এমন প্রতিপত্তি লাভ করল যে, এই সব সহরে চীনা জনসংখ্যা দাঁড়াল শতকরা পঁচাত্তর ভাগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র মালয়ের

জনসংখ্যার শতকরা চল্লিশ ভাগই ছিল চীনা। এই সংখ্যা মালয়ের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পৃথিবীর লোকের ধারণা ছিল যে, চীনারা অনগ্রসর এবং কুঁড়ে। বিশেষ করে বহুদিনের গৃহ বিবাদ এবং য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের রাহাজানির ফলে চীনারা সত্যই পিছিয়ে পড়েছিল তাদের আপন মাতৃভূমিতে। মহাচীন কত দাম দিয়ে তার স্বাধীনতা অটুট রেখেছে, তা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল ক্ষুণ্ন। সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বাধীনে চীনের যে নবজন্ম হয়, তার মূলে প্রবাসী চীনাদের দান যে কত তার হিসেব করা সম্ভব নয়। চীনের বাইরে ব্যবসায়ী চীনারা নানা ভাবে, চীনের জাতীয় আয় এবং চীনের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ভিত্তিমূলে শক্তি যোগান দিয়েছে। চীনের প্রতিবেশী দ্বীপগুলিতে বাণিজ্যিক সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য দেড় হাজারের বেশী বৎসর ধরে চীনারা চেষ্টা করেছে এবং সফল হয়েছে। তার বিবরণ আগেই লিখিত হয়েছে। এ ছাড়াও শ্রমিক ও দালাল শ্রেণীর মধ্যে চীনাদের অধিক সংখ্যায় অণুপ্রবেশের ফলে কেবল যে সেসব দেশ থেকে অর্থ চীনাদের হাতে এসে পড়েছে তা নয়, জনসংখ্যার হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে সব দেশের নানা রাষ্ট্রীয় প্রশ্নের সঙ্গেও তারা জড়িয়ে পড়েছে। ঐ সব দেশে চীনারাই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হয়ে বেঁচে আছে, যার ফলে সেখানকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠবার সুযোগ পায়নি।

এই সব এলাকায় যেসব চীনারা নানা কারণে নানা সময়ে এসে বসবাস করেছে, তারা কখনই এক প্রদেশ থেকে অধিক সংখ্যায় আসেনি। মহাচীনের বিস্তৃত ভূভাগ থেকে এসে তারা সমবেত হয়েছে সেই বিদেশী ভূমিতে, যার ফলে কিছুদিন পূর্ব অবধি এই সব প্রবাসী চীনাদের মধ্যে কোন রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধন অথবা আদর্শগত ঐক্য গড়ে ওঠেনি সংহত শক্তিতে। কিন্তু মাতৃভূমি চীনের দুর্যোগের দিনে এই সব প্রবাসী চীনাদেরও টনক নড়ে

উঠেছে। তারাও উপলব্ধি করেছে যে, দেশের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও মহাচীনের বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে তাদের অংগাংগী সম্পর্ক এবং মহাচীনের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করে তোলার জন্য এই সব নিকট-বর্তী দেশে তাদের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। সেই সময় থেকেই এই সব দেশে যখনই চীনা-বিরোধী আইন পাশ হয়েছে অথবা চীনা-বিরোধী আন্দোলন বিক্ষুব্ধ হয়েছে, তারা এক শক্তিতে তার প্রতিবাদ করেছে। যুদ্ধের আগে অবধি সেসব প্রতিবাদের কাজ হোত কম—কিন্তু এখন দিন পরিবর্তিত।

সাম্প্রতিক কালে এই সব নিকটবর্তী য়ুরোপীয় ও আমেরিকান কলোনীতে তারা অধিক সংখ্যায় আসা সুরু করে নানা কারণে। শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপতি হিসাবে অথবা শ্রমিক ও মাধ্যমিক হিসাবে তারা যে শুধু টাকা রোজগার করবে অথবা জীবিকা অর্জন করবে তাই নয়, বিশেষ করে অর্থনৈতিক জীবনে প্রধান হয়ে তারা যে সেসব দেশের রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার অংশ গ্রহণ করতে পারবে এবং ভবিষ্যতের শক্তি চীনা রাষ্ট্রের আওতায় তারা যে সেসব এলাকায় প্রধান হয়ে উঠতে পারবে, এ আশা তারা করেনি এমন নয়। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে এই সব দ্বীপে চীনাদের অধিক সংখ্যায় অণুপ্রবেশের অন্য কারণ দেখানো যায়। দেশের দুর্ভিক্ষ, মহামারী, গৃহযুদ্ধ এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে পড়ে বহু দরিদ্র চীনা ও চীনা পরিবার দেশের মোহ কাটিয়ে এই সব বিভূঁয়ে ভাগ্য ও জীবিকা অন্বেষণ করতে গিয়েছে। হয়ত তাদের এই অণুপ্রবেশের পিছনে কোন রাজনৈতিক চাল নেই। কিন্তু এই পরিস্থিতির ভবিষ্যৎকে নিয়ে চীন যে কূটনীতি চালাবে না, তারই বা স্বপক্ষে তেমন যুক্তি কই ?

যুদ্ধের পূর্ব বৎসরগুলিতে চীনা মূলধন যা খাটত এই সব দেশে, তার মোটামুটি একটা হিসেব দাখিল করে সমস্যার গুরুত্ব বোঝানো দরকার। মালয়ে কুড়ি কোটি, ইন্দোনেশিয়ায় পনের কোটি, ফিলিপাইনে দশ কোটি, শ্যামে দশ কোটি, ইন্দোচীনে আট কোটি

এবং বর্মায় দেড় কোটি। মোট চীনা প্রযুক্ত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় পঁয়ষট্টি কোটিতে, অর্থাৎ কলোনীগুলিতে এবং স্বাধীন শ্যামে বৈদেশিক স্বার্থের এক-চতুর্থাংশ চীনা স্বার্থ। মালয় এবং ফিলিপাইনে শাসক রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের পরেই চীনা নিয়োজিত স্বার্থের পরিমাণ। স্বাধীন শ্যাম রাজ্যে অন্যান্য বৈদেশিক স্বার্থের পরিমাণের চেয়ে চীনা স্বার্থের পরিমাণ অধিক।

এ কথা বিবেচনার বিষয় যে, এই সব কলোনীতে হয় শাসক সরকারের নিজের অর্থ খাটে অথবা দেশের শিল্পোন্নতির জন্য শাসক রাষ্ট্র বন্ধু-রাষ্ট্রগুলিকে স্বাগত করে এনেছে টাকা খাটাবার জন্য। তার ফলে যেমন শাসক সরকারের রাজস্বে অংকের পরিমাণ বাড়ে, তেমনি মুনাফাও আসে। কিন্তু ঐ সব দেশে চীনা স্বার্থ যা খাটে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় ব্যক্তিগত চীনার অথবা চীনা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের এবং তার সঙ্গে চীনা সরকারের সোজাসুজি সম্পর্ক ও দায়িত্ব কিছুই নয়। তা ভিন্ন শ্রমের বিনিময়ে চীনারা যা পায় তাও একান্ত ব্যক্তিগত আয় ও সঞ্চয়। চীনা সরকার এই সব দেশে মূলধন খাটাবার সুযোগ পায়নি কোনকালে।

আগেই বলা হয়েছে যে, চীন কোনদিনই সফলতার সঙ্গে তার সাম্রাজ্যিক সার্বভৌমত্ব চাপাতে পারেনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। যা কিছু হয়েছে তাও একান্তভাবে সাময়িক এবং আংশিক। চীনের বাণিজ্যিক সাহসিকতার ফলে আজও চীনারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে এবং দিনে দিনে বাড়িয়ে তুলেছে।

জনসমস্যার কথাও এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমেরিকানদের হিসেবে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আধা চীনা ছাড়াও চীনা বাসিন্দার সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। বিশেষ করে মালয় এবং সিংগাপুরে চীনারা অন্য সব জাতিগুলিকে কোণঠাসা করে রেখেছে জনসংখ্যার চাপে এবং অর্থনৈতিক অধিকারে। চুংকিং অবশ্য আমেরিকান হিসেব মানে না—তাদের হিসেবে এখানে চীনা

সংখ্যা সত্তর লক্ষ। এই সব দেশে চীনাদের হাতেই অধিকাংশ স্থানীয় বাজার, মহাজনী কারবার এবং সরবরাহ ও পরিবেশনার ভার। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খাদ্য তালিকার দুটি প্রধান অংশ ভাত আর মাছের ব্যাপারে তাদেরই অপ্রতিহত অধিকার। রবার চাষ এবং টিন খনিতে তাদেরই মুখ্য অংশ মূলধনে এবং শ্রমিকতায়। মশলা, চিনি এবং অন্যান্য শিল্প ও কারখানায়ও চীনারা প্রচুর। এভিন্ন চীনা শ্রমিকদের সংখ্যা দিনে দিনে বর্ধমান।

মাতৃভূমি থেকে দূর দেশে বসতি করে এই সব চীনারা দেশের অর্থনীতিকে ফাঁপিয়ে তুলবার চেষ্টা করে। প্রতি বৎসর চীনা ব্যাংকে জমা পড়ে কোটি কোটি টাকা। ১৯৩৭-১৯৪০ সালে আমেরিকান হিসেবে এই সব ভাগ্যান্বেষী চীনারা নানা দেশ থেকে মোটামুটি দু'শো কোটি চীনা ডলার পাঠিয়েছে দেশের তহবিলে। এরা চীনের জাতীয়বাদী আন্দোলনে অর্থ জুগিয়েছে। সান ইয়াৎ সেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রতি তাদের অবিচল নিষ্ঠা দেখিয়ে আসছে।

জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও চীনের নিজের মৃত্তিকাকে শত্রুমুক্ত হবার জন্য ভবিষ্যতে মহাচীনকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নূতন ঘাঁটি তৈরী করতেই হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে চীনা রাষ্ট্রনায়করা উপলব্ধি করেছেন যে চীনের পূর্ব উপকূল ভাগ শত্রুর দ্বারা বেষ্টিত হলে চীন জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যে কারণে উপকূলভাগ রক্ষা করার জন্য বিরাট জাতীয় নৌবহরের প্রয়োজন সেই কারণেই চীনকে পূর্ব উপকূল রক্ষা করা ছাড়াও অন্য কোন দিকে তার যোগাযোগের পথ খোলা রাখতেই হ'বে। রেংগুনকে উন্মুক্ত বন্দর হিসেবে ব্যবহার করে একমাত্র বর্মা সড়কই সেই দুঃসময়ে চীনের হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালন করতে পারবে। সুতরাং বর্মা সড়ক চীনের পক্ষে মারাত্মক। উপকূল ভাগ দিয়েই চীনের বহির্বাণিজ্য এবং যন্ত্র শিল্প গড়ে ওঠার জন্য চীনের দক্ষিণ প্রদেশগুলি বহুকাল ধরে

উপেক্ষিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু জাপান যখন চীন উপকূলবর্তী সমুদ্রভাগ নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল, বর্মা সড়কের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেল এবং বর্মা সড়কই যে চীনের স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখবে এ বুঝতে পেরেই আশ্চর্য দ্রুততা ও ত্যাগের দ্বারা চীনারা সে সড়ক নির্মান করে তুলল। বর্মা সড়ক নির্মাণের সংবাদ পাওয়া মাত্রই জাপানী জংগীনেতারা ইন্দোচীনে ঘাঁটি চাইলেন এবং পেলেন। একমাত্র ইন্দোচীন থেকেই এই সড়কের উপর বিমান হানা সম্ভবপর। এ ঘাঁটি লাভের জন্য জাপানের লোভকে ইন্দোচীনের সরকার কঠিন হস্তে শাস্তি দেয়নি। ইন্দোচীন এবং শ্যামে ঘাঁটি নির্মাণ করে জাপান বর্মা সড়কের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে। তারপর বর্মা দখল করে জাপান চীনের এই শ্বাস-নালীটিকে চিরদিনের মত রুদ্ধ করে দেবারও চেষ্টা করেছিল।

চীন মুক্তি পেয়েছে আবার। তার স্বাধীনতা সে বাঁচিয়েছে। অনেক বৎসরের দুর্যোগ ও মৃত্যুর পথ বেয়ে বেয়ে মহাচীন আর একবার মাথা তুলেছে। জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কেমন করে একদিন তার অস্তিত্বই মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল সে তিক্ত অভিজ্ঞতা মহাচীন ভুলতে পারে না। সুতরাং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা স্মরণ করে চীনকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নূতন করে সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে। ইন্দোচীনের শত্রু ঘাঁটি থেকে চীন আর আক্রমণ সহ্য করবে না—সুতরাং ইন্দোচীনের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চীনের পক্ষে অপরিহার্য। কেবল ইন্দোচীনই নয় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং বর্মার নিরাপত্তার সঙ্গে চীন ও ভারতের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত নির্ভরশীল। সুতরাং এই এলাকায় চীনা সরকারের ঔৎসুক্য কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী লোভের প্রাথমিক সংকেত তা মনে করবার কারণ নেই। চীন আগে বাঁচতে চায় তারপর সে অন্য রাষ্ট্রের উপর তার সার্বভৌমত্ব চাপাতে পারবে। এবং এশিয়ায় জাগ্রত ভারতের প্রতিবেশী ও বন্ধু হিসেবে চীন অপর কোন রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে পারে না। একমাত্র

বহিঃ প্রভাবমুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রমণ্ডলীর প্রতিবেশীত্বে চীনের এই নিরাপত্তা নিরংকুশ থাকতে পারে। সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি যাতে স্বাধীন হ'তে পারে সেদিকে চীনের সক্রিয় লক্ষ্য থাকতে বাধ্য।

যুদ্ধ শেষে চীন নিজের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে দৃঢ় করে তোলবার সকল প্রকার চেষ্টা করবে। জাপানী জংগীবাদের পতনের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রংগমঞ্চে মহাচীনের ভূমিকা অন্যতম। বিশেষ করে এ সব দেশে যে ভাবে জাতীয় জাগরণের ঢেউ ফুলে ফেঁপে উঠছে তাতে এ বিশ্বাস করবার যুক্তি আছে যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ নীতির দুর্বিপাক থেকে এরা মুক্তিলাভের জন্য চরম সংগ্রাম করবে এবং জয়ী হবেই। মহাচীনের প্রতিবেশী এই ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন হয়ে ওঠা মঙ্গলকর। বিশেষ করে এই সব কলোনীতে যে ভাবে সাম্যবাদের তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়েছে সে জলতরঙ্গের সংগে চীনা সাম্যবাদের ঘনিষ্ঠতা কম নয়।

এ ভিন্ন এশিয়ার দেশগুলিতে চীনা বিরোধী আইন অথবা চীনা বিরোধী বিক্ষোভকে স্বাধীন শক্তিশালী চীনা জাতীয় সরকার আর মুখ বুজে বরদাস্ত করবে বলে মনে হয় না। চীনারা নিজের দেশেই শত্রু নিয়ে বাস করে। আর এইসব কলোনীতে তাদের শত্রু হল এক দিকে য়ুরোপীয় শাসক ও য়ুরোপীয় বেনিয়া সভ্যতা এবং অন্য দিকে জাপানীরা। যুদ্ধে হেরে গিয়েও জাপানীরা চীনাদের ক্ষতি করার লোভ সামলাতে পারছে না। জাপানী কূটনীতি যে কত জঘন্য তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ইতিমধ্যেই। আত্মসমর্পিত জাপানী ভাড়াটে সৈন্য ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতাকামী বীরদের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে বিজয়ী ইংরাজের নির্দেশে এবং মালয়ে, সিংগাপুরে, শ্যামে, বর্মায়, ইন্দোচীনে, ফিলিপাইনে স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষেপিয়ে তুলছে চীনাদের বিরুদ্ধে। তার ফলে সংবাদপত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে, চীনাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের জাগরণের। কোথাও কোথাও খণ্ড

আক্রমণ সুরু হয়েছে। কিন্তু চীনা সরকার তা সহ্য করবে না। ইতিমধ্যেই চীনা সরকার আটলান্টিক সিটি সম্মেলনে তাদের দাবী পেশ করেছে, যেখানে যত পরিমাণ চীনা বাসিন্দা হিসেবে ছিল প্রাকযুদ্ধ বৎসরগুলিতে, তাদের স্বার্থযুক্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী মেনে নিতে হবে। স্বাধীন জাতির মানুষ ভিন্ন দেশে গিয়ে যদি তার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অংগীকার না পায় তবে সে গভীর কলংকের এবং কোন স্বাধীন সরকারই সে অপমান সহ্য করে না। পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে যা সম্ভবপর হচ্ছে না, স্বাধীন চীন তা সহজেই সম্ভব করতে পারবে। অবশ্য সামরিক চাপে নয়—বন্ধুত্বের দাবীতে।

ইন্দোচীনের রেলপথ এবং শুল্কহারের ব্যাপারে ফ্রান্স-চীন চুক্তি সেই বৃহত্তর ভবিষ্যতের দিকেই সংকেত করছে।

মালয় এবং সিংগাপুরে যে জাতীয় জাগরণ সুরু হয়েছে তার মধ্যে প্রধান অংশ চীনাদের। সম্প্রতি মালয় ও সিংগাপুরের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা খসড়া করার সময় ইংলণ্ডের লর্ড সভায় ভাইকাউন্ট এলি ব্যাংক যে মন্তব্য করেছেন তা যেমন উপভোগ্য তেমনি সমস্যামূলক। তিনি ভীত হয়েছেন এই আশু বিপদের সম্ভাবনায় যে অদূর-ভবিষ্যতে মালয় ও সিংগাপুর বৃটিশ কলোনী তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাবে এবং চীনা সাম্রাজ্য তাদের গ্রাস করবে। "আমরা যদি সাবধান না হই তা হলে মালয় ও সিংগাপুর আমরা চীনাদের হাতেই তুলে দেবো। এ কথা আমরা ভুলতে পারি না যে চীনে একটি বিশিষ্ট মতবাদ মাথা তুলছে, তাদের পরিকল্পনা প্রাচী জগতকে সম্পূর্ণভাবে চীনা আওতায় নিয়ে আসা। গত সপ্তাহে চুংকিং-এর পথে পাঁচ হাজার চীনা ছেলে এই ধূয়া তুলে শোভাযাত্রা করেছে—'আমরা হংকং ফিরিয়ে চাই।' এখনও যদি আমরা সাবধান না হই, পরবর্ত্তী ধূয়া উঠবে—'আমরা মালয় চাই'।"

অবশ্য এ মন্তব্য ঈর্ষাপ্রসূত। হংকং চীনের ভূভাগের অন্তর্গত।

থাকলেও আজ যদি সে তার জমি ফিরিয়ে নিতে চায় তাতে ইংরাজ, ফরাসীর গা-জ্বালা হওয়া উচিত নয় এবং মালয়ে চীনারাই হোক অথবা চীনা-মালয়ী সহযোগী শক্তিই হোক, যে কেউ বৃটিশ শক্তির শৃংখল ভাঙতে চেষ্টা করবে তার চেষ্টাই সমর্থনযোগ্য। বিশেষ করে স্বাধীন মালয় যে চীনা সাম্রাজ্যের তাঁবেদারী হবে না এ অব্যর্থ সত্য।

এ বিশ্বাস করবার যুক্তি আছে যে অদূর ভবিষ্যতে শৃংখলমুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কলোনীগুলি আজাদী ভারতবর্ষের সংগে যুক্ত হয়ে মহাচীনের সহযোগিতায় পৃথিবীর কৃত্রিম ভারসাম্যকে টলিয়ে দেবে। পুরোণো পৃথিবীর ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নেবে নূতন পৃথিবী—নূতন স্বাধীন মানুষ। পণ্ডিত জওহরলালের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় এমনি ছবিই আছে।

আশা করা যায় যে, য়ুরোপ আমেরিকার বেনিয়া সভ্যতা যা দিতে পারেনি, প্রাচ্যের বনিয়াদী সভ্যতা পৃথিবীকে সেই চিরন্তনী শান্তির দিকে নিয়ে যাবে, সর্বমানবের মুক্তির দিন অনিবার্যভাবে দ্রুত এগিয়ে আনবে।

কলোনিয়াল সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চোখ রাখতে হবে। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে আফ্রিকায়, ভূমধ্যসাগরে পূবে, নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে—আরো পূর্বে ভারত, ব্রহ্ম, মালয়, নেদারল্যাণ্ড পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তরে শ্যাম, ফরাসী ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, চীন ও কোরিয়া সত্যিকার কলোনীর ক্ষেত্র। এখানে হয় দেশগুলির স্বাধীন সত্তা শৃংখলিত অথবা মুষ্টিমেয় শাসক রাজ্যের জমিদারীর ও শোষনের প্রশস্ততম ভূমি। ভারতে ৪০ কোটী, ব্রহ্মে ১ কোটী ৭০ লক্ষ, মালয়ে ৫৫ লক্ষ, নেদারল্যাণ্ড পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ৭ কোটী, থাইল্যাণ্ডে ১'৪, ফরাসী ইন্দোচীনে ২'৩ কোটী, ফিলিপাইনে ১'৬, চীনে প্রায় ৪৫ এবং কোরিয়ায় ২ কোটী মানুষ মিলে একশ কোটী মানুষ। এরা সারা পৃথিবীর জন সংখ্যার অর্ধেক। আফ্রিকা ও নিকট প্রাচ্যের দেশগুলি ধরলে এ অনুপাত আরো অধিক হবেই।

ডেমোক্রেসী রক্ষার যুদ্ধে যোগদান করলেও এদের নিজেদের রাষ্ট্রে ডেমোক্রেসী চালু নয়। কোথাও কোথাও ডেমোক্রেসী

আসছে নয়ত জনমত রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে ডেমোক্রেসীকে গড়ে তুলছে। ইতিহাসের বিবর্তনের সংগে তারা পা ফেলছে। এই সবগুলি দেশ এযুদ্ধে স্বেচ্ছায় যোগ দেয়নি। তাদের কর্তৃত্বশক্তি তাদের জনমতকে লংঘন করে তাদের দেশকে বাধ্য করে টেনে এনেছে এই দুঃখ অরাজকতার মধ্যে।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জাগতিক শান্তি আসেনি। তার কারণ বৃহত্তর রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের মুখে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন মানুষকে গ্রাস করে। সেই স্বপ্ন উপনিবেশের মানুষের মনেও এসেছিল। যুদ্ধের শেষে সারা পৃথিবীতে যে বিরাট অর্থনৈতিক মন্দা এসেছিল তার প্রাবল্যের মুখে এই স্বাধীনতার প্রশ্নই থাবা তুলে দাঁড়িয়েছিল অত্যন্ত কঠিনভাবে। কিন্তু কর্তৃত্বশক্তি যেমন যুদ্ধশেষে তার শপথ রক্ষা করেনি' তেমনি অর্থনৈতিক দুর্দশার দিনেও সেই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় প্রেরণা জোগায়নি'। নিজেদের সুবুদ্ধির ভাণ্ডার থেকে সেই সব শোষিত জাতির জন্য কোন মংগলের দান আনেনি'—অস্ত্রের ঝনৎকারে সেই সব জাগরণের প্রয়াসকে দলিত করেছে: স্বাধীন সত্বা বিকাশের চেষ্টাকে বিদ্রোহ বলে কঠোর হস্তে দমন করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে মানব ইতিহাসের লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছিল এইমাত্র যে কতকগুলি উপনিবেশ পরাজিত রাষ্ট্রের হাত থেকে বিজিত জাতিগুলির মধ্যে লুঠের বখরা হয়েছে। উপনিবেশের প্রাণীগুলি তেমনি দাসই রয়ে গেছে —স্বাধীনতার প্রসন্ন সূর্যালোকে আজাদী মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়নি'। পরিবর্তন কয়েক জায়গায় হয়েছে ডাক নামে অর্থাৎ ছিল উপনিবেশ হয়েছে 'তাঁবেদারী রাষ্ট্র।'

কয়েকটি রাষ্ট্রের হাতে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ ক্রীতদাসের জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে। যে কয়েকটি রাষ্ট্র এইভাবে মানুষকে ক্রীতদাস করে রাখবার চেষ্টায় সর্বপ্রকার দুর্নীতি, অত্যাচার এবং দমনমূলক ও শোষণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তারাই নিজেদের রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা নিয়ে দুনিয়ার আসরে গলাবাজী করছে।

এইসব কপট রাষ্ট্র হোল পশ্চিম গোলার্ধের আমেরিকা. বৃটেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ক্রীতদাস রাখা একের পক্ষে ক্রীতদাস রাখার চেয়ে যে কোন অংশে কম অপরাধ নয় এ বোঝবার সুবুদ্ধি তাদের হোল না। একথা আজ ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে সাম্প্রতিক জাগতিক যুদ্ধে পরাভূত দেশ-গুলিতে ফ্যাসিস্ত জার্মাণী অথবা ইতালী যে শোষণ ও অত্যাচারের তাণ্ডব চালিয়েছে তার তুলনায় পৃথিবীর শান্তির সময় উপনিবেশে মিত্রশক্তি কম তাণ্ডব করেনি'। অথচ যুদ্ধে জয়ী হয়ে তারা নিজেদের সাধু ও নির্দোষ বলে জাহির করতে কসুর করছে না।

প্রথম মহাযুদ্ধে এশিয়ার সর্বভূমিতে রক্তস্রোত বয়নি'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে যুদ্ধ দেবতার প্রলয়লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বরং বলা চলে যে এই দ্বীপ-গুলির ভাগ্যই বর্তমান মহাযুদ্ধের জয়পরাজয় অনেকাংশে নির্ধারণ করেছে। সে হিসেবে নিছক অন্ধকারময় উপনিবেশ এবং ভৌগলিক ভূমি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভারত বৃহত্তর রাজনীতির পটভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি বিচ্ছিন্ন য়ুরোপীয় শক্তির শোষণ থেকে এসে পড়েছিল জাপানী সার্বভৌমত্বের অধীনে। জাপান গণতান্ত্রিক দেশ নয়। পররাজ্যলোভী, সমরলিপ্সু এবং আসুরিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন জাপানের সমরনীতিকরা। সুতরাং এই নব অসুরের হাতে পড়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নূতন দুর্দশায় পড়েছিল। সে কথা সত্য। কিন্তু প্রশ্ন এই যে য়ুরোপীয় ছদ্ম গণতন্ত্র মিত্রশক্তির চরম জয়ের ফলে আবার সে দেশগুলি পুনরধিকার করবে বটে, তবে তাদের দুর্দশার শেষ হবে না। ফ্যাসিস্ত শোষণের অবসানে সে দেশে কি মানুষের স্বাধীন সত্ত্বা আত্ম অধিকারের আনন্দে পৃথিবীর ইতিহাস নূতন করে রচনা করবে—না পুনরধিকৃত দেশগুলিতে মানুষ ক্রীতদাসের মত কেবল-মাত্র পুরাতন প্রভুকে সেবা করবার অধিকার পেয়ে আনন্দিত হ'বে? মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর শোষণরাজ্যই

কি পৃথিবীতে চিরন্তন হবে? সাম্প্রতিক যুদ্ধের সর্বনাশা বিনাশের মধ্যে দাঁড়িয়েও কি মানুষ সত্যিকার পথ নির্দেশ পাবে না?

উপনিবেশ সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হোল ভারতবর্ষ। কেবলমাত্র জনসংখ্যার জন্য নয়, ভারতের মৃত্তিকায় যে সহস্র সহস্র বৎসরের ঐতিহ্য এবং সভ্যতা জড়িয়ে আছে তার জন্যও নয়—অধুনাতন পৃথিবীর ভারসাম্যের পক্ষে চীন এবং ভারতের আজাদী সরকার গুরুত্বপূর্ণ বলে। উপনিবেশ সমস্যার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির একটি ভারত নয়—বিশ্বরাজনীতির আলোচকদের মতে ভারতবর্ষই উপনিবেশ সমস্যার শেষ কথা। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলে সমগ্র উপনিবেশ সমস্যার শেষ হবে। বিশেষ করে একথা সত্য এশিয়ায়। কেন না আজাদী ভারতবর্ষের এত নিকটে যে সব প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ তারাও মুক্তির বাতাস পাবে এবং চীন ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলির সম্মিলিত শক্তি পৃথিবীর ভারকেন্দ্রকে নূতন বিন্দুতে এনে হাজির করবে। এই সমস্যাই উপনিবেশের সমস্যা এবং শোষক রাষ্ট্রগুলির নিদ্রাহারা রাতের কারণ।

এই ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে আজ। ১৯৪২ সালের ৮ই মে আমেরিকার সহ-সভাপতি ওয়ালেশ এই সমস্যাই উপস্থাপিত করেছিলেন। শ্বেতজাতি যে পৃথিবীর অর্ধেক মানবজাতিকে উন্নততর জীবন যাপনের অধিকারী করে তুলেছে এবং ধাপে ধাপে তাদের স্বাধিকারের পথে চালিত করেছে এ কথা ধাপ্পাবাজী। এ যুদ্ধের শেষে যদি সত্যিকারের শান্তি আনতে হয় তবে চিরদিনের মত এই অন্যায় শোষণের যন্ত্রকে বিকল করতেই হ'বে।

উপনিবেশ সমস্যার মূল ধরে আমাদের জানতেই হ'বে যে শাসক শক্তির পক্ষে কলোনী হারানোর দাম কতখানি? একথা অনস্বীকার্য যে হল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড আমেরিকার পক্ষে এই সব কলোনীর চিরস্বত্ব বজায় রাখার মূলে কোন যুক্তি নেই। সেই কারণে সমস্যাকে বিশ্লেষণ করতে হলে মোটামুটি দু'টো চিন্তাধারা আমাদের অনুসরণ করতে হবে। কলোনীর বাসিন্দাদের আজাদী দাবীর শক্তি এবং

শাসক রাষ্ট্রগুলির লাভ ক্ষতি। হয়ত এই বিতর্কের শেষেই বাস্তব উত্তর মিলবে—ফাঁকা বৈঠকে যুক্তি আপোষ এবং মিথ্যা ভাঁওতার ফানুষ উড়বে না।

কলোনী লাভজনক ব্যবস্থা কিনা? সাম্রাজ্যবাদীরা বলে যে শাসক রাষ্ট্রের পক্ষে কলোনী ত্যাগ কোন ত্যাগই নয়। সাম্রাজ্যবাদের জাল যত সত্বর গুটিয়ে নেওয়া যায় ততই জগতের শান্তির পথে মংগল। ১৯৩৯'র আগে এই ধরণের যুক্তি উপস্থাপিত করা হোত জার্মাণীকে তার গত মহাযুদ্ধের পূর্ণ ভৌগলিক অধিকার প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে। যুক্তিও সরল। সত্যিই ত, এইসব বন্ধ্যা ভূখণ্ড নিয়ে জার্মাণীর বাস্তব লাভ কিই বা হবে? এই যুক্তির বিপক্ষে অক্ষ-শক্তি এবং তাদের সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রগুলি দাবী করত—যদি সত্যিই কলোনী এত নগণ্য প্রশ্ন তবে অন্ততঃ পক্ষে যেসব রাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যা বাঁচার পক্ষে প্রচুর অবকাশ পাচ্ছে না অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে যাদের প্রায় সর্বহারা বলা চলে তাদের এই সব কলোনী দিয়ে অন্ততঃ একটু হাত পা ছড়াবার ঠাঁই দেওয়া যাচ্ছে না কেন?

সত্যিই কি কলোনী অর্থকরী? কলোনী অধিকার, রক্ষা এবং সমৃদ্ধ করার ব্যয়ের চেয়ে কলোনী থেকে আয় বেশী হয় কিনা? সত্যিই যদি কলোনীর অধিকার ছেড়ে আসতে হয় তবে শাসক রাষ্ট্রের পক্ষে দেশের আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক কি সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে হবে? এই ধরণের ক্ষতি স্বেচ্ছায় স্বীকার করা যুক্তি সংগত কিনা? কলোনীর শাসন ব্যবস্থা আমূল সংস্কার করে এমন কোন শাসন যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কিনা যার দ্বারা শাসক ও শোষিত দুই দেশই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠবার সুবিধা পাবে? একথা স্মরণ রাখতেই হ'বে যে শেষোক্ত শাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা চালু করার জন্য শাসক শোষিত দুই দেশের পক্ষে অনেকখানি স্বার্থ ত্যাগের অবকাশ আছে এবং সেটুকু স্বীকার করার পক্ষে কি সুবিধা?

অর্থনীতি বিশারদ যাঁরা তাঁরা বলেন যে দুই রাষ্ট্রের তরফ থেকে একটা নিখুঁত লাভ ক্ষতির হিসেব উপস্থাপিত করা প্রয়োজন।

কলোনী তখনই লাভজনক যখন শাসক রাষ্ট্র থেকে সে তার অধিকাংশ প্রয়োজনীয় মাল খরিদ করে। আমদানীর ব্যয় বহনের জন্য অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে রপ্তানী চালু রাখা একান্ত প্রয়োজন। তথাপি কলোনী থেকে শোষণের সুবিধার জন্য প্রযুক্ত মাল এই রপ্তানীর চেয়ে বেশী লাভজনক। তা ভিন্ন জাহাজী খরচ, বাণিজ্যিক একচেটিয়া অধিকার এবং বীমার পক্ষ থেকেও লাভের পরিমাণ ক্রমশঃ ফেঁপে ওঠার সুবিধা হয়। একটি বৃটিশ পত্রিকা সোজাসুজি মন্তব্য করে বলেছেন (The Colonial Problem)—'অধুনা কলোনীর সমৃদ্ধির জন্য শাসক রাষ্ট্রের এবং অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রযুক্ত অর্থ খাটানো হচ্ছে······এই ধরণের মহাজন-দেনাদার সম্পর্কই কলোনীর সঙ্গে শাসক রাষ্ট্রের সম্পর্কের গুরুত্ব নির্ধারণ করে। যতই অগ্রসর হই না কেন মহাজনী কারবারের দিন আজো বাসি হয়নি। বৈদেশিক শাসনের মূল মন্ত্রই হোল—কলোনীতে বাণিজ্যিক অধিকার এবং জাহাজী একচেটিয়া বজায় রাখা'।

এই সম্পর্কে কলোনী এবং অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক লাভের হার লক্ষণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সমগ্র য়ুরোপে বৃটিশ মূলধন যে পরিমান লাভ এনেছে সেই পরিমান স্বার্থই দূর প্রাচ্যের অধিকৃত দেশগুলি থেকে এনেছে তার দ্বিগুণ লাভ।

কলোনীর রপ্তানীর কত অংশ শাসক রাষ্ট্র ব্যবহার করছে তার উপর বাণিজ্যিক লাভ ক্ষতি নির্ভর করে। সে ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত স্বার্থের প্রশ্ন বড়। তার কারণ বাণিজ্যের জন্য শাসক রাষ্ট্র অথবা অন্য বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক সমান গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গিয়েছে যে ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জেও চিনির চাষে প্রযুক্ত স্বার্থ ওলন্দাজদের একচেটিয়া এবং সে চিনি রপ্তানী হল্যাণ্ডের সঙ্গেও নয় তবু মোটা লাভ যায় ডাচ সরকারের তহবিলে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকরা বলেন যে কলোনীর সঙ্গে বাণিজ্যিক

সম্পর্ক মোটেই গুরুতর নয়। এই সব কলোনী তাঁবেদারী সরকারের বাণিজ্যের গৌণ অংশই গ্রহণ করে। যেমন সমগ্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের মোট রপ্তানীর শতকরা ৭·২ ভাগ ১৯৩৮'এ ভারত নিয়েছিল। এসব সমালোচকদের মুখ বন্ধ হয় তখনই যখন তারা বিচার করে দেখেন যে মনিব রাষ্ট্রের রপ্তানীর হার নয়, কলোনীর প্রয়োজনের কত পরিমাণ ভরে ওঠে এই হারে। নিম্ন হার দেখানোর অর্থ এই যে বৃটীশ রপ্তানীর বাজার কত ব্যাপক এবং তার লাভের অংশও কত বিরাট। সুতরাং কলোনীগুলি স্বাধীনতা লাভ করলে তারা যে ভূতপূর্ব রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি করবে তারও যেমন স্থিরতা নেই, তেমনি স্থিরতা নেই চুক্তির সর্তগুলির সুবিধায়। মনিব রাষ্ট্রের পক্ষে এ দুই-ই সমান অস্বস্তিকর।

দুনিয়ার বাজারে মাল চালানোর চেষ্টা আধুনিক কালের সব রাষ্ট্রগুলিরই ভাল করে জানা আছে। যে রাষ্ট্রের অধীনে পৃথিবীর বেশী ভূখণ্ড কলোনী হয়ে আছে তাদেরই বাণিজ্যিক সুবিধা বেশী। তার কারণ, একদিকে বাঁধা বাজার এবং অপর দিকে জাহাজী ব্যবসার সার্বভৌমত্ব। কলোনীগুলির যেভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলছে, তা যে সর্বদিক দিয়ে প্রভু রাষ্ট্রের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এ অস্বীকার করার উপায় নেই। দেশীয় জনমত দমিয়ে, দেশীয় শিল্পের উপর অযথা করপীড়ন করে এবং অন্যান্য একশোটা দাবী ঘাড়ে চাপিয়ে সমস্ত জাতীয় শিল্পকে মেরে ফেলার ভঙ্গীটুকু আকস্মিক বলে মনে করার কারণ নেই। এই পরিস্থিতির চরম রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে—একটি বিবরণীতে (Callis, Foreign Capital in South East Asia, 1942)। 'স্বাধীন শ্যামে বৈদেশিক রবার প্রতিষ্ঠানের উপর যে পরিমাণ উচ্চহারে লাভকর, পথকর আদায় করা হয় তা' বাণিজ্যিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক অথচ মালয় কলোনীতে শোষণযন্ত্র চমৎকার কুশলীভাবে কাজ করতে পারে।'

অনেকে বলেন যে কলোনীর ভূমি বা খনিজ সম্পদ কর্তৃত্বশালী

রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান নয়। এই সম্পর্কে দু'ধরণের যুক্তি পেশ করা হয়।

যন্ত্রশিল্পের পক্ষে যেগুলি বেশী প্রয়োজন যেমন লোহা, পেট্রোলিয়াম, তামা, তুলা অথবা পশম—সেগুলি মোটামুটি স্বাধীন শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির কবলিত। একথা অনেকাংশে সত্য বটে, তবু কলোনীগুলি এইসব খনিজ ও ভূমি সম্পদের বাজারে নিজেদের সরবরাহও রাখতে পারে হয়ত ছোট ভাবে। তা ছাড়া আধুনিক যন্ত্রশিল্পের পক্ষে অন্যতম প্রয়োজনের রবার ও টিন কলোনীর একচেটিয়া সরবরাহ। এ ছাড়াও যথাযথ ভাবে অনুসন্ধান করলে এইসব কলোনীগুলির অজ্ঞাত অনেক সম্পদের সন্ধান মিলবেই। শাসক রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে সে সম্বন্ধে চরম উদাসীনতা সেইসব কলোনীর জাতীয় সম্পদের নিম্নতার বড় কারণ। এ উদাসীনতার কারণ অন্য জায়গায় বিবৃত করা হ'রে।

অধিকৃত কলোনীর ভূমি ও খনিজ সম্পদ ব্যবহারের জন্য শাসক রাষ্ট্রকেও দাম দিতে হয় এ অনুযোগ শোনা যায়। কলোনীর বাসিন্দাদের উচিৎ এইসব জাতীয় সম্পদকে রাষ্ট্রশক্তির বল্গা-ধারীদের হাতে বিনামূল্যে তুলে দেওয়া—এ সরল সত্যটুকু বুঝি কলোনীর জাতীয়তাবাদী মন কিছুতেই বুঝতে চায় না। তবু অন্য কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন করে এইসব মাল কিনতে গেলে যে পরিমাণ দাম ও শুল্ক দিতে হয় আপন কলোনী থেকে তার চেয়ে অনেক কমে সেগুলি পাওয়া যায়। তাছাড়া কলোনীতে নিজের চালু মুদ্রা বিনিময় থাকাতে বিদেশী মুদ্রাবিনিময়ের জালে আটকে পড়তে হয় না—সেও এক পরম সুবিধা। সাম্প্রতিক যুদ্ধের ঠিক আগে এই ধরণের দু'মুখী ব্যবসা বাড়তির মুখে চলছিল।

এইসব চিন্তাবীর সমালোচকরা বিস্মৃত হন যে শক্তি-সাম্যের জন্য কলোনী গুরুতর। যুদ্ধের সময় কলোনীগুলি শুধু যে বিপজ্জনক এলাকায় ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হ'বে তা নয়—

কাঁচা মাল, সৈন্য ও অন্যান্য সরবরাহের নিশ্চিন্ত কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে এবং সেগুলি যুদ্ধজয়ের প্রচেষ্টায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ই। বৃটেনের যুদ্ধ জয়ের পক্ষে তার কলোনীগুলি এ যুক্তির স্বপক্ষে রায় দিয়েছে। বিপরীত দিকে কলোনী যে কোন কারণেই হাত ছাড়া হলে সেইসব এলাকায় রাষ্ট্রশক্তি পঙ্গু হয়ে পড়ে এবং স্বদেশের রক্ষা ব্যাপারেও অত্যন্ত মারাত্মক দুর্বলতার প্রশ্রয় দেয়। সেই কারণে কলোনীগুলিকে যুদ্ধ ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তুলবার একটা অন্ধ চেষ্টা চলছে দিকে দিকে।

কলোনীগুলি শাসক রাষ্ট্রের বর্ধমান জনসংখ্যার চাপকে হ্রাস করতে পারে কিনা? এ প্রশ্নের জবাবে দেখা গেছে যে সত্য সত্যই অধিকৃত কলোনীতে শাসক রাষ্ট্রের জনসাধারণ ভীড় করে এসে জমায়েত হ'তে চায় না যদিও কলোনীতে বাঁচার সুখ মাতৃ-ভূমিতে বাঁচার চেয়ে ঢের বেশী, যদিও অর্থ রোজগারের পক্ষে, শাসন ক্ষমতা চালানোর পক্ষে এবং অন্যান্য নানাভাবে মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণকর বহু প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবার সুবিধা বেশী—তবু সাধারণ মানুষ দেশের বাইরে যেতে চায় না। অনেক ক্ষেত্রে আইনের জোরেও এই চেষ্টা সফল হয়নি'। দেশের জন-সংখ্যাকে এইভাবে ছড়িয়ে দিতে পারলে স্বদেশে রাষ্ট্রের পক্ষে অনেকগুলি সুবিধা হয় বটে, তবু তা' সম্ভব না হলেও ক্ষতি হয় না খুব বেশী। কারণ কলোনীগুলি শোষণ করে দেশের বাণিজ্যিক এবং শিল্প সম্পদ বাড়িয়ে তোলা যায়। দেশের জনসাধারণের ব্যক্তি আয় বেড়ে যায়, দেশের সমৃদ্ধি গড়ে উঠে। সেগুলি যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইংগিত এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ভারসাম্যের দিক দিয়ে রাষ্ট্রের পক্ষে অনুকূল।

এইদিক থেকে বিবেচনা করে অনেক যুক্তিপরায়ণ চিন্তাশীল মনে করেন যে, সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত শেষ হলে, সারা পৃথিবীতে স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তি সৃষ্টি হ'লে বিশ্বমৈত্রীর ফলে প্রতি দেশ তার স্বদেশের জনগণের সত্যকার মংগল করতে পারবে। এ শুধু

কবি-কল্পনা নয়—বিশ্বভ্রাতৃত্বের উর্বর জমিতে সর্বমানবের মংগল সূর্যের প্রসন্নতায় সারা পৃথিবীতে সোনার ফসল ফলবেই।

উপরোক্ত কয়েকটি কারণ ছাড়াও দুনিয়ার আসরে সেই শক্তি তত শক্তিমান যার হাতে যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ কলোনী। এই গুরুত্ব নির্ভর করে তার ভৌগলিক অবস্থানের উপর—তার ভূমি ও খনিজ সম্পদের উপর—তার জনসংখ্যার উপর এবং তার জংগী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের সুবিধার উপর। তা ছাড়া কলোনীর কারণে স্বদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ একটী ভঙ্গী গড়ে ওঠেই। কলোনী হাত ছাড়া হলে অথবা কলোনীর শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হলে স্বদেশের কাঠামো এমন গভীরভাবে নাড়া খায় যার ফলে হয়ত তার ভিত্তিই নড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক বনিয়াদ ধ্বসে পড়ার দুঃসময় আসে। সেই জন্য শাসক রাষ্ট্রের দিক থেকে এর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

কলোনী তৈরী হয় সাধারণতঃ দুভাবে। সভ্য পৃথিবীর অজ্ঞাত কোন দ্বীপ বা ভূভাগ যখন কোন দেশের সাহসী মানুষের দল আবিষ্কার করে যেখানে সভ্যতার প্রগতি কিছুদুর গিয়েই স্থিতি স্থাপকতা পেয়েছে, যেখানে খনিজ ও বনজ সম্পদের সম্ভাবনা প্রচুর, যেখানে ফসলের মৃত্তিকা প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে স্নেহশীল সেখানে আবিষ্কর্তার দেশের লোক দলে দলে ছুটে আসে বসতি করতে। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে অনেক কলোনী। আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় এইভাবে কলোনী হয়েছে। এইসব দেশের আদি-বাসীরা ক্রমশঃ সভ্য জগতের দস্যুতায় কোণঠাসা হয়ে গিয়েছে। আগন্তুক বাসিন্দারা দেশকে ঐশ্বর্যশালী করবার চেষ্টা করেছে এবং নবলব্ধ সম্পদ দিয়ে মাতৃভূমির উন্নতি করবার চেষ্টা করেছে। অবশ্য পরে এইসব বাসিন্দারাও মূল দেশের বন্ধন অস্বীকার করে স্বাতন্ত্র দাবী করেছে এবং রক্তাক্ত পথে সে স্বাধিকার অর্জন করেছে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ সেই স্বাধিকার লাভের জ্বলন্ত ইতিহাস।

আর এক প্রকারে কলোনী সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে আবিষ্কারের অভিযান থাকলেও বসতির প্রশ্ন গুরুতর নয়। যুদ্ধ ও চক্রান্তের দ্বারাই এক দেশের রাষ্ট্র অপর দেশের রাষ্ট্রকে বশ্যতা স্বীকার করাতে বাধ্য করে। সেক্ষেত্রে উপনিবেশ রচনার প্রশ্ন নয়, অধীনতা চাপানোর রাহাজানি। গৃহবিপ্লব, আত্মকলহমগ্ন দুর্বল রাষ্ট্রের উপর এইভাবে সার্বভৌমত্ব চাপিয়েই অধিকাংশ কলোনী হয়েছে। ভারতবর্ষ, এবং বৃহত্তর ভারতবর্ষে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছে ডাচ, পর্তুগীজ, স্পেন, বৃটিশ, আমেরিকা ও ফ্রান্স।

কিন্তু কলোনী অধিকারের আসল কারণ হোল অর্থ নৈতিক। দেশ যত সমৃদ্ধিশালী হবে এবং শিল্প প্রসারে যত উন্নত হবে দেশের সীমান্তের বাইরে বাণিজ্যিক সুবিধা, বাঁধা বাজার ও কাঁচামালের জন্য তাকে তাকাতেই হবে। য়ুরোপের জীবনে শিল্প বিপ্লবই তাকে কলোনী সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে। বস্তুতঃ কলোনী এই শিল্প বিল্পবেরই শিশু। একদিকে এই শিল্প বিপ্লব, বাইরের বাজার ও কাঁচামালের সুবিধা কলোনী সৃষ্টির পথ করেছে। অপরদিকে কলোনীর অবস্থান, ঐশ্বর্য ও বাজার মনিব রাষ্ট্রের শিল্প প্রগতিকে নূতন নূতন খাতে চালনা করেছে। এই অনিবার্য মিলনের ফলে কলোনীর দেশীয় দুর্বল রাজতন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে এবং বিদেশী অর্থ নৈতিক প্রভুত্বকে ঘাড়ে নিতে বাধ্য হয়।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক প্রতিদ্বন্দীতা হ্রাসের জন্যই এইভাবে কলোনী আবিষ্কার ও অধিকারের চেষ্টা হয়েছে বারে বারে। কলোনী না করতে পারলে জাতীয় আয় ও জীবন যাত্রার মান শীর্ষমুখী হতে পারে না। তা ভিন্ন নানাভাবে অর্জিত দেশের অর্থ প্রয়োগক্ষেত্রের অভাবে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়। যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এই নিষ্কর্মা অর্থ ক্ষতিকর।

কলোনী সৃষ্টি ও বসতি করার জন্য 'গোল্ড রাশ' এক জলন্ত উদাহরণ। নানা সময়ে নানা দেশে মূল্যবান ধাতু আবিষ্কারের

সংগে সংগে দলে দলে মানুষ সেখানে ছুটে যায় লোভে। হানাহানি ও জঘন্যতার পথে একদেশের জাতীয় সম্পদ আর একদেশে অথবা অন্য অনেক দেশে চালান হয়। এইভাবেই আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় বসতি হয়েছে নানা রাষ্ট্রের মানুষদের।

বৈদেশিক রাষ্ট্রের এই অর্থ নৈতিক প্রভুত্বের ফলেই কলোনীর কাঁচামাল দেশজ শিল্পকে উন্নত করতে পারে না। কলোনীর আয়ের মান খাড়াইয়ের দুর্গম পথে দেশের মানুষকে তুলতে পারে না, বৈদেশীক শোষণের দ্বারা সৃষ্ট উৎরাইয়ের পথ ধরে দ্রুত নামতে থাকে। মহাযুদ্ধের আগে অবধি প্রায় প্রত্যেক মনিব রাষ্ট্রই এই ভুল করছিল। কলোনীর মানুষদের জীবন মান না বাড়ালে তার ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ে না। সুতরাং মনিব দেশের শিল্প প্রসার যত উন্নত হতে থাকে, কলোনীর ক্রয়ক্ষমতা সেই হারে বৃদ্ধি পেতে পারে না। তার ফলে এক সময় আসে যখন মনিব দেশের শিল্প-প্রসার চরম শীর্ষে উঠে থামতে বাধ্য হয়। তখন আবার রাষ্ট্রের পক্ষে নূতন কলোনী সৃষ্টির প্রয়োজন হয় অথবা অন্য কোন দেশে অর্থ নৈতিক প্রভুত্ব চাপানোর তাগিদ হয় জরুরী।

তা ভিন্ন কাঁচামালের জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রের এই কলোনী নির্ভরতা যে কত ক্ষতিকর তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রমাণ হয়েছে। ভারতবর্ষে শত্রু অধিকার না হওয়ার জন্য ভারতকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি হারিয়ে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হয়েছে। কেবল মনিব রাষ্ট্রের পক্ষেই নয় তার উপর নির্ভর-শীল অন্যান্য মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রের জীবনেও তা গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই সব করণে কেবলমাত্র শাসন ক্ষমতা হস্তচ্যুত হওয়ার চেয়েও মনিব রাষ্ট্রের পক্ষে বাণিজ্যিক সুবিধা রক্ষণ ও মূলধন খাটানোর প্রশ্ন প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও ডাচ রাষ্ট্র নানাভাবে অর্থ-নৈতিক ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের অর্থ নৈতিক

বনিয়াদকে আবার দৃঢ় করে তুলতে হলে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা তাদের বৃদ্ধি করতেই হবে। সেইজন্য কলোনীর সুবিধা হারানো তাদের সহজ নয়।

সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর চিরস্থায়ী শান্তির সব প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলেছে। শুধু শান্তিই নয় পৃথিবীর বৃহত্তর অর্থনৈতিক সাম্য ও অগ্রগতির পক্ষে সে একটা প্রচণ্ড বাধা। অধিকন্তু সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে অর্থ ও শক্তি ব্যয় হয় সেটুকু একেবারে জলে ফেলে দেওয়া। সে অর্থ, সে সামর্থ মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের কাজে লাগলে অনেক উপকারই হ'তে পারত। ১৮১২ সালে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব বলেছিলেন—'উত্তর আমেরিকা যখন গ্রেট বৃটেনের কলোনী ছিল তখনকার চেয়ে বিচ্ছিন্ন অথচ বন্ধুভাবাপন্ন আমেরিকার কাছে গ্রেট বৃটেন ঢের বেশী সুবিধা পেয়েছে।' আমেরিকার কলোনী হস্তচ্যুত হবার ফলে গ্রেটবৃটেন আর্থিক দুঃস্থতায় পড়েনি। বরং শান্তির সময়ে এবং যুদ্ধের অসময়ে সেই আমেরিকাই বৃটেনকে সাহায্য করেছে, বাঁচিয়েছে।

ভারতকে কলোনী করে রাখবার চেষ্টায় এবং পৃথিবীর অন্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলি নিজেদের কলোনী বাঁচাবার চেষ্টায় সেই প্রচণ্ড ভুলই আবার করতে বসেছে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যে নীতি সাম্রাজ্যবাদকে জন্ম দিয়েছিল এবং ফাঁপিয়ে তুলেছিল বিংশ শতাব্দীর মাটিতে সে নীতি ফসল ফলাতে পারবে না। পুঁজিবাদের আগ্নেয় হলের আগায় শোষিত দেশের মাটি ফসল ও সোনা দেবে না—স্বার্থত্যাগ ও প্রতিরোধ শক্তিকে ভ্রূণ-মুক্ত করবে। দেশে দেশে সেই জাগরণের ইতিহাসই রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ করে দিচ্ছে।

সাম্রাজ্য গঠন ও বিস্তারের কাহিনী আকস্মিকতায় ভরা। কোন্ শক্তি কোন্ দেশে কেমন করে শক্তি বিস্তার করেছে তার মধ্যে আকস্মিকতার পরিমাণ অনেক। ষোড়শ শতাব্দীতে একজন পর্তুগীজ আফ্রিকা ঘুরে এশিয়ার তীরভাগে আসছিলেন।

তার প্রয়োজন হয়েছিল পানীয় জলের। সুতরাং চীন কূলবর্তী মাকাও বন্দরে তিনি জাহাজ নোঙর করলেন। হংকংয়ের প্রতিবেশী এই দ্বীপটি চারশ বছর ধরে পর্তুগীজ কলোনী হয়ে আছে।

ফরাসী ইংরাজের টানাপোড়েনে কিভাবে ভারতলক্ষ্মী সর্বশেষে ইংরেজের গলাতেই মালা দিয়েছিলেন তার ইতিবৃত্ত আজ সর্বজন বিদিত। গ্রীণল্যাণ্ডে ডাচ প্রতিপত্তির পরিবর্তে ড্যানিশরা সেখানে শাসনকর্তা। ইন্দোনেশিয়ায় বৃটিশ বিতাড়িত। ডাচ সরকার সেখানে শাসন ও শোষণের চূড়ান্ত চালাচ্ছে।

কলোনী সৃষ্টির আদি কথাই হোল শক্তির অসমতা। দুর্বল রাষ্ট্রের উপর সবলের ঝাঁপিয়ে পড়ার কলংকিত অধ্যায়। পুরাকালে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' ধুয়ায় এই সাম্রাজ্য লিপ্সা চলত—অধুনা এর নাম হয়েছে সভ্যতাকরণ। রাষ্ট্র দুর্বল হলেই তা অসভ্য হয়ে পড়ে এবং ভগবানাদিষ্ট শ্বেত জাতি তাকে বাঁচাবার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসে। ঘৃণ্য দেশশত্রুদের হাত থেকে জন্মভূমি রক্ষা করার জন্য সুরু হয় একটা সমগ্র জাতির জহর।

মানবতার দায়িত্ব নিয়ে কোন জাতি অপর জাতিকে নিপীড়ন ও শোষণ করে না। কেবলমাত্র শক্তির দম্ভেই তা করা সম্ভব। ভারত শাসন করার কোন নৈতিক দায়িত্ব থাকতে পারে না ইংরেজের। ইন্দোনেশিয়া ডাচ শাসন বাদ দিয়েই সার্থক ভাবে বাঁচতে পারে। আবিসিনিয়ার পর্বত ও অরণ্য ভূভাগ ইতালীর সভ্যতা দংষ্ট্রার অনুপ্রবেশ ছাড়াই শান্তিতে বাঁচতে অভ্যস্ত ছিল। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের অনধিকার প্রবেশ নরকের নীতি—পৃথিবীর নয়। সাম্রাজ্যবাদের গোড়ার কথাই এই মানব নীতির নেতি।

এক রাষ্ট্রের আওতায় কলোনী থাকলে সে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধিতে ঈর্ষা জাগা স্বাভাবিক। সুতরাং শান্তির ভিত্তিতে ফাটল ধরে এবং একদিন সেই ফাটল দিয়ে আদিম অগ্ন্যুদগার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। শান্তির সময়েই সত্যকার যুদ্ধের ফসল ফলতে সুরু

করে। যুদ্ধ হোল সেই বিষবৃক্ষের ফল চয়নের সময়টুকু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভিক কালে হিটলারের বক্তৃতায় সেই আক্রোশপ্রসূত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

কলোনী হস্তচ্যুত হওয়ার ভয়ে শাসকশক্তি কলোনীকে নিবীর্য করে রাখে। সর্বপ্রকার বঞ্চনা নীতি অনুসরণ করে সে নিজের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। কেননা অন্যায়ের দাস হয়ে সে সবসময় ভয় করে প্রতিদ্বন্দ্বীর। এই বঞ্চনা নীতির সড়ক দিয়েই আসে বঞ্চিতের আক্রোশ। রঙের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আগ্নেয়াস্ত্রের দাম্ভিকতা কোন মানুষ সহ্য করতে পারে না। তার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। সে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সাম্রাজ্যবাদের দুই শত্রু। প্রথম, কলোনীর জাগ্রত গণ চেতনা, দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদ।

এই বর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের নোংরামিই জাপানের সাম্প্রতিক বিজয়ের প্রধান কারণ। এশিয়ায় য়ুরোপীয় শক্তিগুলি যে ভাবে চরম অত্যাচারের রাজত্ব করছে তার ফলে সমগ্র এশিয়ার চেতনা য়ুরোপীয়দের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। বিশেষ করে নবজাগ্রত জাপান যে ভাবে বিংশ শতকের প্রথম দশকে য়ুরোপীয় শক্তি রাশিয়াকে পরাজিত করেছিল তার ফলে সমগ্র পরাজিত এশিয়ায় এই নূতন বোধ এসেছিল যে সত্যিসত্যিই য়ুরোপ অজেয় নয়। এশিয়ার বুক থেকে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দৈত্যকে চিরদিনের মত দূর করে দেওয়া সম্ভব। এশিয়ার সংকটি কলোনীতে এবং চীনে জাতীয়তার স্বপ্ন এই একটি মাত্র ঘটনায় আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছিল।

একথা আজ চিরদিনের মত প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, নূতন সাম্রাজ্যবাদীর শৃংখল পায়ে পরে এশিয়া ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হবে না, স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তির মিলিত সখ্যতায় এশিয়ায় নূতন শক্তির কেন্দ্র গঠিত হয়ে উঠবে। এবং যে কোন রাষ্ট্রের দাম্ভিকতা সেই স্বাধীনতার পথ রোধ করে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে সারা এশিয়ার কৃষ্ণ পীত মানব গোষ্ঠী সর্বপণ করে লড়বে সেই দস্যুতার সংগে।

এশিয়ায় য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের উন্মাদ নর্ত্তন চিরদিনের মত শেষ হয়ে গিয়েছে। জাপানী জংগীবাদের পতনের সংগে সংগে এশিয়া-জাত সাম্রাজাবাদের মৃত্যু ঘটেছে।

অদূর ভবিষ্যতে মিলিত এশিয়ার সংগে মিলিত য়ুরোপ আমেরিকার কুরুক্ষেত্র বেধে ওঠবার যেমন কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই, তেমনি তা অবিশ্বাস্যও নয়। পরাজিত এশিয়া য়ুরোপীয় দাম্ভিকতা আর বরদাস্ত করতে চায়না। 'ভারত ত্যাগ কর' এ শুধু ভারতীয় জাতীয় চেতনার নির্দেশ নয়—'এশিয়া ত্যাগ কর' এই হল সমগ্র এশিয়ার নির্দেশ য়ুরোপের প্রতি। সে কথায় সুষ্ঠুভাবে কর্ণপাত না করলে তার ফলও হ'বে বিপজ্জনক। যুদ্ধে জয়ী হয়ে বিজিত জাতিগুলিকে অপমানসূচক প্রস্তাবে মাথা নামাতে বাধ্য করার মধ্যে আন্তর্জাতিক শান্তির বীজ থাকতে পারে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও যদি সাম্রাজ্যবাদের ভ্রান্তি না ঘুচে থাকে য়ুরোপের তবে সে পৃথিবীর ভীষণতম দুর্যোগকেই আমন্ত্রণ করছে বলতে হ'বে। গত মহাযুদ্ধে জার্মাণীকে পরাজিত করেছিল বটে ইংরেজ আমেরিকা, কিন্তু ভার্সাই চুক্তিতে সে নাৎসী নীতিকে সৃষ্টি করেছে, সে অপরাধ ইংরেজ ফরাসীর। বিজিত জার্মাণীর নয়। গত মহাযুদ্ধে রাশিয়াকে ভার্সেলে আসন দেওয়া হয়নি'। এই যুদ্ধের শেষে রাশিয়া বৃহত্তম শক্তিপুঞ্জের অন্যতম হয়ে উঠেছে। নাৎসী নীতিকে রাশিয়াই মূলতঃ পরাস্ত করেছে। এ যুদ্ধে এশিয়ার মধ্যে একমাত্র স্বাধীন চীনও শান্তিপর্বে ইংরেজ মার্কিন রুশীয় বহবারম্ভে সখ্যসমতার গৌরব পায়নি। ভারত এবং অন্যান্য দুঃখভোগী জাতিগুলি যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে রইল। কে বলতে পারে আগামী যুদ্ধে এইসব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির কি পরিস্থিতি হ'বে এবং সেদিনকার শান্তিপর্বে তারা কোন শ্রেণীতে বসে যুদ্ধকামীদের বিচার করবে। ইতিহাসের ইংগিত কি আজো প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি? চীন ভারতের ৯৫ কোটী মানুষ তিমিরান্ধকারে নির্বাসিত থাকতে চায় না। থাকবেও না। এশিয়ার

মূল ভূভাগ জেগে উঠেছে—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নবজন্ম লাভ করেছে, সাম্প্রতিক শান্তির জন্য এশিয়াকে একবার চরম যুদ্ধ করতেই হ'বে।

এশিয়ায় য়ুরোপ যে দুঃশাসন চালিয়েছে তার দূরপ্রসারী ফল ফলবেই। তারা য়ুরোপীয় প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে না, য়ুরোপের সততায় তারা সংশয়ী। সুতরাং য়ুরোপীয় শান্তির ভংগীমায় তারা সুস্থ বোধ করে না। করছেও না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মিটেছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় জনমত আজো চাবুক খাচ্ছে, মালয়ে সিংগাপুরে বর্মায় ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদীদের বুদ্ধি ভ্রংশতায় মানুষ পশুর মত জীবন যাপন করছে, ভারতে বিদেশী পুঁজিবাদের নাগপাশ শ্লথ হবার কোন লক্ষণই নেই—তবে যুদ্ধ মিটেছে কোথায়! বিদ্রোহ বিপ্লব এবং অত্যাচার সমান চলছে। এশিয়ার আকাশে দুর্যোগ কাটেনি', যুদ্ধ মেটেনি'। শান্তির মহড়া সম্পূর্ণ ভূয়ো বলেই এশিয়াবাসীর ধারণা। সত্যিকার শান্তি আজো দিগন্তের আড়ালে।

যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু—লাভবান হয়েছে অল্প। কিন্তু সেই অল্পের হাতেই ক্ষমতা। তারা রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী ও চক্রান্তের দ্বারা পুরাতন দিনকেই স্থায়ী করে রাখতে চাইছে। কাইজারের পতন হিটলারকে সৃষ্টি করেছে। হিটলারের পতন ভবিষ্যৎকে রাহুমুক্ত করতে পারেনি'। গণতন্ত্রের নীতির মধ্যেই ফ্র্যাংকেনষ্টাইনের সৃষ্টির বীজ গুপ্ত হয়ে আছে। গণতন্ত্র তা' জানে না। এবং জানে না বলেই সে অম্লানমুখে জাতিবিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে, বাণিজ্যিক চুক্তি করে অসম হারে, শ্রমিক চাষীদের ন্যূনতম প্রয়োজনকে অস্বীকার করে, জাতীয়তাবাদকে অস্ত্রের দ্বারা পরাস্ত করতে চায়। চতুবর্গ স্বাধীনতার ভাঁওতা নিজেরাই বিশ্বাস করে না কিন্তু প্রচার করে উঁচু গলায়।

একথা বোঝাবার দিন আজ এসেছে যে ১৯৩৯ সালের প্রথম সেপ্টেম্বর তারিখে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হলেও, সত্যকার দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধ সুরু হয়েছে ১৯৩১ সালে যখন জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করেছিল—১৯৩৫ সালে যখন ইতালী আবিসিনিয়াকে সভ্য করার জন্য নৃশংসতার মহড়া দিয়েছিল, ১৯৩৬ সালে যখন স্পেনের ঘরোয়া রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছিল হিটলার মুসোলিনী। একথা আজ বোঝবার দিন এসেছে যে এসিয়ায় বৃটিশ আমেরিকার বিপর্যয় ঘটেছিল তার কারণ মাঞ্চুরিয়ায়, অবিসিনিয়ায়, স্পেনে দুদ্ধর্ষ নীতিকে গণতন্ত্র যে কোন কারণেই মেনে নিয়েছিল। একথা মানবার সময় হয়েছে যে ভবিষ্যৎ শান্তিভংগকে রোধ করার জন্য চীনে ভারতে এবং সারা পৃথিবীর কলোনীতে শাসকবর্গের নূতন দৃষ্টিভংগী প্রকাশ করার দিন এসেছে। এশিয়ায় য়ুরোপ আমেরিকা বন্ধু হিসেবে থাকতে পারে কিন্তু প্রভু হিসেবে নয়।

শাসকশক্তি কলোনী নিয়ে ঢাক বাজায়। নিজের কলোনীতে মানুষ কত স্বর্গরাজ্যে বাস করে তার হিসেব দাখিল করে। যতটুকু হয়েছে তাই যে কেবলমাত্র তাদের মমতায় এবং স্বার্থত্যাগে এ প্রমাণ করার জন্য কমিশন ও তাদের রিপোর্ট দাখিল করার বিরাম নেই তাদের। কিন্তু কলোনীতে মানুষের শিক্ষার হার এত কম কেন? না, সেখানে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না? শিক্ষা বিস্তারের পথে হাজারো বাধা। দেশে অনেক ভাষা, অনেক জাতি। ভারতের শিক্ষার হার এত নিম্ন কেন? সেই এক উত্তর।

রাশিয়ায় জার কুশাসনের আমলে শিক্ষা প্রসার সম্ভব হয়নি', কেন না সেখানকার অবস্থা ছিল জটিল—অনেক বাধা অতিক্রম করতে হোত, কিন্তু সেই সব অসুবিধা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার আর্থিক ও অন্যান্য অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও মাত্র তেইশ বছরে স্বদেশের শিক্ষার হার শতকরা ২৭ থেকে ৯০ হয়েছে। সাহসী সংকল্পবদ্ধ প্রগতিপন্থী সোভিয়েট সরকার শিক্ষা প্রসারের পথে কোন বাধাই মানেনি'।

শিক্ষা প্রসারের সংগে সংগে জাতিয়তাবোধ জেগে ওঠে—সুতরাং শাসকশক্তি কলোনীকে অশিক্ষিত রাখার ষড়যন্ত্র করে।

প্রায় দু'শো বছর ভারত শাসনে সভ্য বৃটিশ সরকার ভারতকে আশ্চর্য অন্ধকারে রেখে দিয়েছে। সংস্কৃতির জননী এসিয়ায় য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ শিক্ষার ক্ষেত্রে ফসল ফলাতে পারেনি'। কিন্তু স্বাধীন মিলিত এশিয়া একদিন তা' প্রমাণ করবে যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে এশিয়ার জনচেতনা আজো বন্ধ্যা হয়নি'।

শাসকশক্তি কলোনীকে ততটুকু উন্নত করে যতটুকু তার স্বার্থের অনুকূল। রেল রোড হয় বাণিজ্যিক সুবিধা ও সম্প্রসারণের জন্য, শিক্ষার প্রসার হয় শাসনরাষ্ট্রের কেরাণী তৈরী করার জন্য, বাণিজ্য-বহর তৈরী হয় কাঁচামাল রপ্তানীর জন্য—দেশে কলকারখানা বসে সেই সব মাল প্রস্তুত করার জন্য—দেশে কাঁচামাল নিয়ে উচ্চহারে মজুরী দিয়ে যখন পৃথিবীর বাণিজ্যিক বাজারে পড়তা রাখা সম্ভব হয় না। সুতরাং কলোনীতে যতটুকু কল্যাণ বিতরণ করা হয় তার জন্য যা খরচ তার অনেকগুণ লভ্যাংশ শাসকরাষ্ট্র নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তোলে।

কলোনী চিরস্থায়ী করার আর একটা যুক্তি হোল এই যে, শাসকবর্গ সব সময় সর্বপ্রকার চেষ্টা ও ত্যাগ করছেন কলোনীবাসীদের স্বাধিকারের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে। এ তাদের মহৎ দায়িত্ব। এবং যতদিন না তারা দেখছেন যে কলোনীবাসীরা সম্পূর্ণ দায়িত্ব-শীল হয়ে উঠেছে ততদিন শাসকরাষ্ট্রের মমতাময় তাঁবেদারীতে তারা নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে বাধ্য।

কিন্তু সাম্প্রতিক যুদ্ধে দেখা গেল যে শান্তির সময় যারা শোষণে তৎপর, যুদ্ধের সময় যারা কলোনীবাসীদের বিনা মনোনয়নেই যুদ্ধলিপ্ত করে, নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যারা নিজেদের শক্তির দম্ভে অন্ধ, তারা কেমন করে আরো শক্তিশালী রাষ্ট্রের কাছে বিপর্যয় মেনে নেয়। পলায়ন তৎপরতায় তারা কত প্রখর, হীনচুক্তির অবমাননায় তারা কেমন করে মাথা নামায়। শাসিত অসহায় মানুষকে দস্যুর লুণ্ঠন ও কুশাসনের মুখে ফেলে তারা কেমন করে আত্মরক্ষা করে—এসবই দেখেছে কলোনীবাসীরা। ১৯০৫ সালের

চেতনা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক যুদ্ধে। তবে য়ুরোপীয় শক্তি অজেয় নয়—তারও মধ্যে হীনমনাতা আছে—সেও নৈতিক দুর্বলতায় ভেঙে পড়ে।

সাম্প্রতিক যুদ্ধে প্রমাণ হয়েছে যে কোন রাষ্ট্রই নিজেকে বিপদ ও হীনতা থেকে বাঁচাতে পারে না যদি না সে অন্য রাষ্ট্রের সহানুভূতি ও সাহায্য পায়। উপনিবেশ ভারত অথবা এশিয়া অফ্রিকার অন্য কোন কলোনী তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে কিনা সে প্রশ্ন তোলার আগে প্রশ্নকারী রাষ্ট্রকে প্রতিপ্রশ্ন করা প্রয়োজন সে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে কিনা। বহিরাগত সাহায্য না নিয়েই যদি সারা পৃথিবীর আক্রোশকে ঠেকিয়ে রাখার সামর্থই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র মাপকাঠি হয় তবে পৃথিবীর কোন্ কোন্ রাষ্ট্র সে স্বাধীনতায় অধিকারী তা বিচার্য। স্বাধীনতা এক আশ্চর্য বোধ। সে বোধ যখন আসে দেশ বিদ্যুৎগতিতে বড় হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং ভিন্ন রাষ্ট্রের মিত্রতায় যে কোন দেশই সমৃদ্ধিসম্পন্ন হ'তে পারে। বিশেষ করে আধুনিক আনবিক যুগে পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন কোন রাষ্ট্রই তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিরংকুশ হ'তে পারে না।

কলোনী প্রস্তুত হলে তবে সে স্বাধীনতা পাবে এ নিছক সাম্রাজ্যবাদী ধাপ্পাবাজী ভিন্ন আর কিছুই নয়। শাসক শক্তি যখন তার অসাধু নীতি ত্যাগ করবে, সে দেখবে যে একটা দেশ—যেখানে গণদেবতা জাগ্রত সেখানে প্রস্তুতি কত স্বল্প সময় নেয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তার নীতি ত্যাগ করতে পারে না। এশিয়ার কলোনী ছাড়লে য়ুরোপের অনেক রাষ্ট্রই মুমূর্ষু হয়ে পড়বে। ইন্দোনেশিয়ার বল্‌গা ছাড়লে ডাচ রাষ্ট্র চতুর্থ শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হ'বে। ভারত বর্মা মালয় ছাড়লে বৃটিশের ঘোর অসুবিধা দেখা দেবে। তাই যে কোন দাম, যে কোন অন্যায় ও অসাধু নীতি অনুসরণ করে ডাচ ফরাসী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এশিয়ায় তাদের কলোনী জিইয়ে রাখবার শেষ চেষ্টা করবেই।

জাতি বিদ্বেষ ও শ্রেণী বিদ্বেষ জাগিয়ে রেখে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তিকে জাতীয় স্বার্থের বিপরীত খাতে চালনা করার আশ্চর্য কৌশল জানে সাম্রাজ্যবাদ। ভারতে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, সিংগাপুরে চীনা-মালয় পরিস্থিতি বৃটিশের রচনা। ভারতে হিন্দু মুসলিম দাবীর বৈপরীত্যই যদি ভারতের স্বাধীনতা লাভের অন্তরায় হয়ে থাকে তবে বর্মা স্বাধীনতা পায় না কেন? সেখানে কোনও জাতিবিদ্বেষ নেই। ইন্দোনেশিয়ায় কোন জাতিবিদ্বেষ নেই—ডাচ তার অধিকার ত্যাগ করতে তবে এত কুণ্ঠিত কেন?

আসলে এশিয়ার কলোনীগুলিতে এই শ্রেণী ও জাতিবিদ্বেষ শাসকরাষ্ট্রের তৈরী। নইলে এর চেয়েও অনেক প্রখর জাতিভেদ নিয়েই রাশিয়া অবিভাজ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছে। জাতি বিভেদ না থেকেও য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলিতে গৃহযুদ্ধ চরম ক্ষতি করেছে দেশের। কলোনী শাসন চিরস্থায়ী রাখার এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিদেশের প্রগতিপন্থী জাতীয়তাবোধ উগ্র হয়ে উঠেছে।

বৃটিশ ও ফরাসী শাসন নীতির আর একটি প্রধান অস্ত্র হোল কলোনীগুলিতে তাঁবেদারী শাসক রাষ্ট্র বাঁচিয়ে রাখা। ভারতের দেশীয় রাজ্য এবং মালয়ের সুলতান শাসিত রাষ্ট্রগুলিতে আজো মধ্যযুগীয় শাসননীতি চালু। সারা দেশের রুদ্ধ আক্রোশ যেদিন অগ্ন্যুদ্গার করবে সেদিন এই সব তাঁবেদারী রাজ্যগুলি এক একটি সামরিক ঘাঁটি হিসেবে কাজ করবে বৃটিশের। ভবিষ্যতের দুঃসময়ের জন্য এই দেশীয় রাজ্যগুলির অস্তিত্ব জিইয়ে রাখার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ তার অস্তিত্বের দুর্ঘটনার বীমা করবার চেষ্টা করেছে। এইসব দেশীয় রাজ্যে মধ্যযুগ আজো সচল হয়ে আছে। কিন্তু বিংশ শতকের জাগরণের ঢেউ সেখানকার প্রাচীরেও আঘাত করতে সুরু করেছে এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফাটল ও ভেঙে পড়বার নিদর্শন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে।

ফরাসীরাও এই ভেদ নীতির দ্বারা আনামী শাসন চালায়। ইন্দোচীনে ফরাসীরা আনামকে তিনটি ছোট ছোট রাষ্ট্রে ভাগ করে

রেখেছে। তার ফলে সেখানে জনমত পদে পদে ছোট ছোট স্বার্থের প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরেছে। জাতির বৃহৎ স্বার্থের দিকে একাগ্রচিত্ত হবার পথে বাধা পাচ্ছে। কিন্তু ইন্দোচীনের সাম্রাজ্যবাদীদের কাপট্য ও অসাধুতা আজ তারা স্বচ্ছ আলোয় দেখতে পেয়েছে বলে সেখানে জনমত দাবী করেছে সাম্রাজ্যবাদের অবসান। এবং সে অবসান ঘটাবার জন্য যে কোন ত্যাগ করতেও প্রস্তুত হয়েছে তারা। সংগ্রামশীল জনমতকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না আর মনিবরাষ্ট্র নিশ্চিত।

কলোনী নীতিকে বাঁচিয়ে রাখা অনেক সাম্রাজ্যবাদীর মতে আত্মরক্ষার নীতি। কলোনী থেকে সস্তায় কাঁচামাল আমদানী করে অনেকগুণ চড়া দামে তা কলোনীতেই বেচে মোটা লভ্যাংশ ঘরে তোলা যায়। দুনিয়ার বাজারে যে মাল চলে না কলোনীতে তা বেচে দেওয়া যায়। শুল্ক প্রাচীর খাড়া করে কলোনীতে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার কায়েমী করা সহজ। অর্থ নৈতিক দিক থেকে কলোনীগুলি পুঁজিবাদের কর্ষণ ক্ষেত্র। শোষন নীতি চালানোর জন্য অপরিহার্য। একদেশের মানুষকে দাস করে রেখে তাকে মানবতার সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে শাসক রাষ্ট্র সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে। নিজের দেশে জীবন যাপনের হার বাড়িয়ে তোলে শাসক রাষ্ট্র।

এই কারণে কলোনীকে অনেকে মনে করেন পৃথিবীর মরুভূমির অংশ। অনেকে বলেন সভ্যতার দুষ্ট ব্যাধি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তি করে প্রতি রাষ্ট্রই যে দেশের জীবন মান ঠিক রাখতে পারে এর প্রমাণ ভুরীভুরী। অসাধু নীতির আশ্রয় না নিয়েও অনেক রাষ্ট্র সমৃদ্ধভাবে বাঁচছে। তবে এ মধ্যযুগীয় 'দাস ব্যবসায়' চালু রাখার পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?

কলোনী হারালে আধুনিক সভ্যতার মাপকাটীতে ইংলণ্ড, ডাচ, ফরাসী শক্তিরা প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে এ ঝুট বাত। কলোনী শোষণের ফলে জাতির যে সমৃদ্ধি তা আপাতঃ সমৃদ্ধি—তা' চিরকালের নয়। সেই কারণে ইংলণ্ড ফরাসী ডাচ রাষ্ট্রকে কলোনী হারিয়ে নূতন

করে বাঁচতে শিখতে হবে যেমন হ'বে স্বাধীন কলোনীগুলিকে নূতন পরিকল্পনার দ্বারা সুগঠিত ও আত্মসচ্ছল হয়ে উঠতে।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। ভরা পেট খেতে পাওয়ার দাবী মানুষের মৌল দাবী। এ দুই থেকেই বঞ্চিত হয়ে বাঁচে এবং মরে পরাধীন জাতি। সেই কারণে পরাধীন জাতির ধর্ম হোল তীব্র জাতীয়তাবোধ। রাজনীতি এবং উৎপীড়ন তার বিশ্বাসের মতই প্রয়োজনীয়। পরাধীন দেশের রাজনীতি শূন্য উদরের, শূন্য মনের। পরাধীন দেশের গণদেবতা উপোসী, তার রাজনৈতিক শ্লোগান হোল—'ম্যয় ভুখা হুঁ।'

* * *

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বহুশতাব্দী ধরে বৃহত্তর ভারত বলে পরিচিত। এশিয়ার এই সীমানায় ভারতের সঙ্গে যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে শতাব্দীর পর শতাব্দীতে তার প্রাধান্য কতখানি হয়েছিল বৃহত্তর ভারত এই নামেই হয়ত তার যথার্থ মাপ হ'তে পারে। ভারতের সভ্যতার উত্থান পতন এবং কৃষ্টির নানা ভঙ্গীমার সঙ্গে এইসব দক্ষিণ-পূর্বের দ্বীপ ও দেশগুলি রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক শতাব্দীতে এইসব দ্বীপময় ভারত নানাভাবে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের তাঁবেদারীতে শাসিত ও শোষিত হচ্চে সত্য কিন্তু তাদের মৌল সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে ভারতের নিগূঢ় যোগ—নাড়ির টান। এবং ভারতের সমস্যা সমাধানের সংগেই সেইসব দেশের সমস্যারও জট খোলবার সম্ভাবনা আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরবরা এবং ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা ভারতের হাত থেকে তার নৌশক্তি ছিনিয়ে নেয়। সেই সংগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘনিয়ে ওঠে। ভারতকে ঘাঁটি করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সার্বভৌমত্ব স্থাপন করার স্বপ্ন দেখেছিল পর্তুগীজরা এবং সে স্বপ্ন সফল করার জন্য তারা চেষ্টাও করেছিল। ভারতকে পিছনের ঘাঁটি এবং মালাক্কায় অগ্রগামী ঘাঁটি করে সমগ্র এশিয়ায় দিগ্বিজয়ের রথ চালাবার

পর্তুগীজ প্রচেষ্টাকে প্রথম বাধা দেয় ডাচেরা সিংহল থেকে তাদের বিতাড়িত করে। সিংহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পর্তুগীজরা ভারতের মূল্যবান ঘাঁটি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

একথা উল্লেখযোগ্য যে, বাটাভিয়া ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণ করছিল তাদের নৌঘাঁটি ছিল সিংহল। নেপোলিয়ান যখন য়ুরোপে তার বিজয় শকট চালাচ্ছিলেন হল্যাণ্ডও তার নীচে থেৎলে যায়। সে সময় বৃটিশের ভারতস্থিত নৌ-শক্তিই ডাচ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই নূতন সম্প্রসারণ ক্ষেত্রটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সাম্প্রতিক যুদ্ধকাল অবধি সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার আত্ম-রক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল ভারত বর্মা সিংগাপুরের বৃটিশ নৌবহরের উপর।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলা ও অন্যান্য সম্পদ বহুকাল ধরেই তাকে সারা পৃথিবীর বাণিজ্যিক কেন্দ্রের অন্যতম ক'রে রেখেছে। এইসব রত্নদ্বীপের কাহিনী যুগে যুগে দস্যুকে এনেছে, সাম্রাজ্যবাদকে লোভ দেখিয়েছে, বঞ্চনাকারীর আগ্নেয়াস্ত্রকে প্রলুব্ধ করে তুলেছে। কিন্তু আরো সাম্প্রতিক কালে যখন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বন ও খনিজ সম্পদের কথা জানা গেল, য়ুরোপ থেকে দলে দলে রাষ্ট্রশক্তি হিংস্র দংষ্ট্রায় ছুটে এল সেখানে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্ত জীবনে অকস্মাৎ যেন বৈশাখী ঘূর্ণী এসে সব ওলটপালট করে দিল। সুরু হল সাম্রাজ্যবাদীদের চাতুরীহীন ষড়যন্ত্র, হানাহানি আর নৃশংসতা। ভারত এবং তার প্রতিবেশী এইসব রাষ্ট্র থেকে কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে য়ুরোপ সমৃদ্ধ হয়েছে। ভারতের সোনা ও ফসল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খনিজ, তৈল, মসলা এবং অন্যান্য বন ও কৃষি সম্পদ য়ুরোপকে তথাকথিত সভ্য করেছে, শক্তিশালী করেছে। কিন্তু এখানে কোথাও শাসকরাষ্ট্র তার দায়িত্ব মানেনি। বেনিয়া রাষ্ট্রবুদ্ধি এখানে সঙীনের মুখে লুণ্ঠন চালিয়েছে, অধিবাসীদের রক্ত ক্ষরণের দিকে ফিরেও তাকায়নি। এই এলাকাতে বৃটিশের কলোনীই তাকে আজকের গ্রেট বৃটেন করেছে। সারা দুনিয়ার সেরা নৌশক্তি গঠন করতে

সাহায্য করেছে। অতলান্তিকের গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে আজ প্রশান্ত মহাসাগরের এই এলাকা আন্তর্জাতিক শান্তি ও যুদ্ধের মর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক ভারসাম্য এখানেই নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। বিংশ শতকের সুরু থেকেই দঃ পূঃ এশিয়া রাষ্ট্রশক্তিদের প্রতিদ্বন্দ্বীতার এলাকা হয়ে উঠেছে।

ডাচ ইংরেজ এবং ফরাসীদের সাম্রাজ্যবাদের আঙিনায় একটি নূতন ভাগীদার এসে জুটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ মুখে। ফিলিপাইনে স্পেন সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে আমেরিকা পূর্বদিকে তার একটি ঘাঁটি নির্মাণ করলে। সেই সংগে সংগেই প্রায় জাপান ফারমোসা অধিকার করে বসল। যদিও তখনও অবধি এবং তার পরবর্তীকাল অবধি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশের নৌ-শক্তিই প্রধান তবু এই দু'টি নূতন সাম্রাজ্যলোভী শক্তির অনুপ্রবেশের ফলে প্রশান্ত মহাসাগর অশান্ত হবার জন্য মুহূর্ত গুণতে সুরু করল।

আমেরিকা পার্ল হারবারকে প্রথম শ্রেণীর ঘাঁটি হিসেবে সুরক্ষিত করবার চেষ্টা করতে লাগল। গুয়াম, ওয়েক দ্বীপ এবং মিডওয়ে সুরক্ষিত হোল বটে কিন্তু মাতৃভূমি যেখানে বিচ্ছিন্ন দ্বীপমালা থেকে দু'হাজার মাইলের চেয়েও বেশী দূর সেখানে এইসব দ্বীপকে নৌঘাঁটি হিসেবে শক্তিশালী করবার চেষ্টা কখনো সার্থক হ'তে পারে না। জাপানের একটি আকস্মিক আক্রমণে, তাই এত সহজে সমগ্র ফিলিপাইনের পতন ঘটেছিল।

জাপান যখন ফারমোসা অধিকার করে তখন জাপানের সাম্রাজ্যবাদকে সন্দেহের চোখে দেখেনি এইসব প্রথম শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। বিশেষ করে কোন রাষ্ট্র যে কোনদিন য়ুরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির সমতা অর্জন করতে পারবে এ যেন ধারণার অতীত বস্তু ছিল। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভেও সে ধারণার পরিবর্তন ঘটেনি যদিও এই যুদ্ধে সমগ্র এশিয়ার সত্বাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিল তার প্রত্যক্ষ ফল আজ কঠিন করে বুঝছে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ।

জাপানের রাজ্যলিপ্সা ও সম্প্রসারণের দূরপ্রসারী ইংগিত প্রথম পাওয়া গেল ভার্সাই চুক্তির সময়। পরাভূত জার্মাণীর অধীনে প্রশান্ত সাগরের যে সব দ্বীপমালা ছিল সেগুলি জাপানকে নিজের তাঁবেদারীতে নেবার জন্য দাবী পেশ করল। ওয়াশিংটন চুক্তি অনুযায়ী জাপানের দাবী এমন ভাবে মেনে নেওয়া হোল যার ফলে জাপানের নৌশক্তি বৃটিশ ও আমেরিকার তুলনায় ক্ষুণ্ণ হয়ে রইল। তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেও ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হোল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানকে ছোট করে রাখবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে কসুর করেনি' ইংরেজ আমেরিকা।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার আগে থেকেই একথা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল যে জাপান এশিয়ায় দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি হয়ে থাকতে চায় না। য়ুরোপীয় রাষ্ট্রশক্তি যে এশিয়ায় শোষণ চালাবে অথচ জাপান তার প্রতিবেশী এলাকায় কলোনী বিস্তার করতে পারবে না—এচিন্তা জাপানী সামরিক কর্তাদের মনে শান্তি আনতে দিলে না। হংকংয়ের সুগঠিত ঘাঁটি সত্বেও জাপান হাইনান দ্বীপ অধিকার করে তার সম্প্রসারণ নীতি চালু করতে লাগল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব কটি কলোনীতে এবং ভারতবর্ষে অর্থ নৈতিক অনুপ্রবেশের দ্বারা জাপান পৃথিবীর এই মহলে প্রধান হয়ে ওঠবার সুযোগ খুঁজছিল। বিশেষ করে ভারতবর্ষে জাপানের সামরিক কর্তা নিয়োগের ফলে জাপানের এই অভিসন্ধিতে সন্দেহের আর অবকাশ থাকেনি'। জাপান যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যৎকে নিজের রাষ্ট্রের সংগে জড়িয়ে নিতে চায় এসম্বন্ধে কূটনৈতিক মহলের ধারণা দৃঢ় হয়ে উঠতে সুরু করে। 'এশিয়া এশিয়াবাসীর' ধুয়ার ক্যামোফ্লেজে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী লালসা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভারত ব্রহ্ম চীনে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে পরাস্ত করে সেখানে সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপনের কুটচক্রই করেছিল। এক সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে আর এক সাম্রাজ্যবাদ কায়েমী করবার চেষ্টাই ছিল তার মূল—এশিয়াকে স্বাধীন সম্মিলিত জাতি-

পুঞ্জে গঠিত করে তোলবার সব প্রতিশ্রুতি তার যে স্তোকবাক্য এ বোঝবার জন্য এশিয়াকে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হোল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে এক জাপানী জংগীনীতি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নানা স্তরের রাষ্ট্রনৈতিক শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। এক প্রান্তে স্বাধীন শ্যাম—অন্যপ্রান্তে অকৃত্রিম কলোনী শাসিত উত্তর বের্ণিও। ১৯৪৬ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে স্বাধীনতা লাভের প্রতিশ্রুতিতে প্রস্তুতপরায়ণ ফিলিপাইন—অন্যদিকে বর্মায় শাসনব্যবস্থার আভিধানিক ত্রিশংকুত্ব। মালয়ে কলোনী শাসনের সংগে সংগে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শাসনের সংগে অপ্রত্যক্ষ শাসনের রাসায়নিক সংযোগ। ইন্দোনেশিয়ায় কলোনী শাসন চালু রাখলেও হল্যাণ্ড সরকার বুঝেছিলেন যে এশিয়ায় কলোনী শাসনের দিন অবসান হয়ে আসছে। শাসন ব্যবস্থার নানা ভংগী সত্বেও সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কলোনীর অর্থ নৈতিক কাঠামো ছিল এক। স্বাধীন শ্যামের বৈদেশিক স্বার্থের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছিল বটে কিন্তু পরনির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না শ্যাম সরকার।

বর্মার তৈল খনিজ এবং কাঠের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের করতলগত। বর্মার প্রধান কৃষি ধানে ভারতীয় মূলধনের অংশ অন্যতম। মালয়ের টিন এলাকায় বৃটিশের স্বার্থ প্রধান—মালয়ের রবার বৃটিশ চীনার যৌথ নিয়ন্ত্রণে। ব্যাংকিংয়ের বৃহত্তর ব্যাপারে বৃটিশ কর্তৃত্ব, বেচাকেনা মহাজনী এবং দালালীতে চীনাদের একচেটিয়া অধিকার। শ্রমিকের অধিকাংশ চীনা—কম ভারতীয়। অর্থাৎ মালয়ে মালয়বাসীদের একমাত্র সুযোগ চাষে। বৃটিশ সরকার অন্ততঃ এইটুকু কৃপা করেছিলেন মালয়ীদের উপর যে তাদেরই একমাত্র জমির মালিকানা দিয়ে রেখেছিলেন। এমন কি কোন মালয়ীর কাছ থেকে কোন বিদেশী জমি কিনতে পারবে না এমন আইন প্রয়োগ করেছিলেন বৃটিশ সরকার। যদিও

মালয়ে চীনাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার কিন্তু মালয়ীদের অধিকার নিজের রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে। এর কুফল সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার তৈল, চিনি, রবার, কুইনাইন বিদেশীদের হাতে। থাইল্যাণ্ডে একসময় বিদেশী প্রযুক্ত মূল ধনের শতকরা ৮০ ভাগই ছিল বৃটিশের। ফিলিপাইনে আমেরিকার মূলধন খাটত সবথেকে বেশী।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খনিজ ও আবাদী সম্পদ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক হাটে অন্যতম প্রধান স্থান লাভ করেছে। পৃথিবীর উৎপাদনের মানে, রবারের ৯০ ভাগ, টিনের ১০ ভাগ, কুইনাইনের ৯০ ভাগ এবং সম্পূর্ণ হারে ম্যানিলা রজ্জু এই এলাকা থেকে সরবরাহ হয়েছে। এ ভিন্ন তেল, টাংষ্টেন, ম্যানগানিজ, চিনি এবং মসলা প্রভৃতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দান অতুলনীয়। যুদ্ধের জন্য, শিল্প প্রসারের- জন্য প্রয়োজনীয় এইসব কাঁচামালের লোভেই এখানে বিদেশী স্বার্থ এত নিষ্ঠুর। এই কারণেই এখানকার কলোনী শাসনের অবসানে এত ভয় সাম্রাজ্যবাদীদের। এখানকার মৃত্তিকা সম্পদ থেকেই য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিকতা পুষ্টির রস সঞ্চয় করে।

কলোনী শাসনের ফলেই এখানে দ্বৈত অর্থনীতি চালু। ঘরোয়া প্রয়োজনের জন্য একদিকে প্রাচীন পদ্ধতিতে চলত জমি চাষ এবং ফসল উৎপাদন। অপর দিকে বাধ্যতামূলক আবাদ এবং খনি উৎপাদনের কাজও চলত শাসক রাষ্ট্রের আদেশে। এই জবরদস্তি আবাদের ফলে ধানজমিতে রবার, তুলা অথবা কুইনাইনের চাষও চাপান হোত। কারণ এগুলি এই এলাকার মৃত্তিকার বিশেষত্ব এবং এগুলি পৃথিবীর বাজারে প্রচুর দামে বিক্রী হয়ে মনিব সরকারকে অথবা তার তাঁবেদারী কোম্পানীকে উচ্চহারে লভ্যাংশ এনে দেয়। এই বাধ্যতামূলক চাষের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রে প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন অল্পবিস্তর এমন ধাক্কা খেয়েছে যার ফলে স্থানীয় চাষী সম্প্রদায় দেনায় নিরন্নতায়

এবং রোগজীর্ণতায় দিনে দিনে মুমূর্ষু হ'তে বসেছে। ভারতের নীলকুঠীর দিন আজো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফুরিয়ে যায়নি।

এই দু'মুখী অর্থনীতির বিষফল উপলব্ধি করতে পারলেও বৈদেশিক শাসক সরকার সেদিকে কোন দিন লক্ষ্য করেনি'। কারণ নিজেদের লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা করার সময় কোন বেনিয়া সভ্যতাই পরাধীন দেশের মানুষদের দুঃখবেদনা অথবা ভবিষ্যতের দিকে চায় না। যে সময় সারা পৃথিবীতে অর্থ নৈতিক মন্দা দেখা দেয় তখনই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে নিজেদের অজস্র সম্পদ নিয়েও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কলোনীগুলি কেমনভাবে য়ুরোপ আমেরিকা এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের চাহিদার উপর কত নির্ভরশীল। য়ুরোপে রবারের চাহিদা যে বছর কম হ'বে সে বছরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় তহবিলে এমন অর্থ থাকবে না যা দিয়ে সে তার ক্ষুধার অন্ন কিনতে পারে। কেন না রবার উৎপাদন করলেও রবারের প্রয়োজন নেই তার নিজের দেশে। অথচ শাসক সরকার তাকে চাল উৎপাদন করে অন্ততঃ দেশের খাদ্য সমস্যাকে আত্মনির্ভরশীল করতে দেবে না। বাংলার পাট যেমন অধিক দাম পায় যার ফলে চাষীরা নিজেদের কৃষিজমিতে ধানের বদলে পাটের আবাদ করে,—চীনে যেমন চাল না ফলিয়ে চীনা কৃষক আফিম তৈরী করে দাম বেশী পায়। অথচ কোন কারণে পাট বা আফিমের আন্তর্জাতিক চাহিদা কমে গেলে তারা দুর্ভিক্ষের গ্রাসে গিয়ে পড়ে—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাধ্যতামূলক আবাদও তেমনি আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। রবার অথবা অন্য কোন উৎপাদন জাতীয় আর্থিক কাঠামোকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে দেয় না—জাতীয় সমৃদ্ধিকে পরমুখাপেক্ষী এবং নিরালম্ব থাকতে বাধ্য করে।

ভারতবর্ষে ইক্ষু চাষ এবং তার পরিশোধনের ব্যবস্থা হওয়ায় জাভার চিনিশিল্প প্রচণ্ড মার খেয়েছে। নিয়ন্ত্রণ খসড়ার আগেই মালয়ে এবং ইন্দোনেশিয়ায় রবারের অতি উৎপাদনের ফলে

পাউণ্ড প্রতি রবারের দাম এমন কম হয়ে যায় যে ঐ সব কলোনীর কৃষক সম্প্রদায় নিদারুণ দুঃখের মধ্যে দিন যাপনে বাধ্য হয়। মালয়ের টিন উৎপাদনের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী এলাকা যদি আবিষ্কৃত হয় তবে মালয়ের অর্থনৈতিক কাঠামোও একদিন ধূলিসাৎ হয়ে পড়তে বাধ্য হ'বে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রকৃতির অকৃপণতা সত্বেও কলোনীর দুষ্ট অর্থনীতি তাকে পৃথিবীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে বাধ্য করেছে। ঘরোয়া এবং বৈদেশিক অর্থনীতির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে যেভাবে দেশের আর্থিক বনিয়াদকে প্রথমতঃ আত্মরক্ষামূলক এবং দ্বিতীয়তঃ সমৃদ্ধিমুখী করে গড়ে তোলা হয়—সে নীতি কোন বিদেশী শোষক সরকার গ্রহণ করেন না। কেন না কলোনীকে সমৃদ্ধ করে তোলার দায়িত্ব তাদের নয়। যতটুকু করলে নিজেদের শোষণের সুবিধা বেশী হয় ততটুকু করেই বিদেশী সরকার ক্ষান্ত হয়।

যুদ্ধের বৎসরগুলিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চলাচল বন্ধ হয়ে থাকার ফলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দুঃস্থতা ও দুর্ভিক্ষ প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এই নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে সামরিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করেও জাপান বাণিজ্যিক হার বৃদ্ধি করতে পারেনি'। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক ঋণে জাপানের সংগে এই সব দেশ কাজ করেছে। জাপান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে খাদ্যবস্তু আমদানী করে সেদেশের নিরন্নতা দূর করতে পারবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হতে পারেনি'। অপরদিকে জাপান স্থানীয় অন্য আবাদ কমিয়ে ধানের ফসল বাড়াবার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি'। তারই ফলে আজ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খাদ্যাভাব গুরুতর আকার ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক নিম্নতার দিন এগিয়ে আসছে—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একচেটিয়া উৎপাদনের চাহিদা একদিনেই শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করতে পারবে না, সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবকটি কলোনীতেই আর্থিক অনটন চলবে। মুদ্রাস্ফীতি এবং উৎপাদন বন্ধের ফলে যে বেকার সমস্যা এবং দুঃস্থতা এসেছে

তার নিরসন করাও একদিনে সম্ভব হবে না। সমগ্র কলোনী অর্থনীতিকেই বরবাদ করতে হবে তার জন্য এবং তা একমাত্র করা সম্ভব ঐ সব রাষ্ট্রের সরকারের পক্ষে। বৈদেশিক শক্তির তাঁবেদারী মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন আত্মত্যাগের পথে কৌশলী অর্থনীতি চালিয়েই এই সব রাষ্ট্র পৃথিবীতে সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

অতি নিকট ভবিষ্যতেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্প গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে জাতীয় সরকারকে। তা না হলে সমস্ত কলোনী অর্থনীতির অতি জীর্ণ বনিয়াদ বহ্বারম্ভ নিয়েই মাটিতে গুঁড়িয়ে পড়বে—তাতে আর সন্দেহ নেই।

এই সংগে ভারতের উল্লেখ প্রয়োজন। ভারতবর্ষকে শিল্প-সমৃদ্ধ হয়ে ওঠবার জন্য এই সব এলাকার কাঁচামাল তাকে নিতেই হবে। ভারতের যে সব আশু প্রয়োজন অথচ যে সব তার দেশের মাটিতে উৎপন্ন হয় না—সে সব এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। ভারতবর্ষ বৎসরে ১৫ লক্ষ টন চাল বর্মা থেকে নেয়। দেশের জীবিকার মান বৃদ্ধি পাবার সংগে সংগে এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনে ভারতকে হয়ত তার চেয়েও অধিক পরিমাণ চাল আমদানী করতে হ'বে ভবিষ্যতে। ভারতে টিন খনি আবিস্কৃত হয়নি'—ভারত রবার ফলায় অত্যন্ত কম। এসবের জন্য ভারতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগে চুক্তি করতেই হবে। পেট্রোলিয়াম, মসলা এবং অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ ভারত ঐ সব দেশ থেকে কিনবে। এবং বিনিময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক প্রয়োজন সরবরাহ করবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের সংগে ভারতের ভবিষ্যৎ এক সমন্বয়ে গড়ে উঠবে। মৈত্রী এবং যৌথ সমৃদ্ধির নীতি অনুসরণের ফলে ভারত এবং বৃহত্তর ভারতের সম্মেলন এশিয়ায় নবযুগের পত্তনী করবে।

সাম্প্রতিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে কটি নিদারুণ সত্য সহজভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে তার মধ্যে মোটামুটি এইগুলিই প্রণিধান যোগ্য।

কলোনীতে কোন কোন একান্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামালের একচেটিয়া অধিকারের ফলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক কটু হয়ে উঠেছিল। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির এই সুবিধাজনক পরিস্থিতির ফলে নূতন গড়ে ওঠা রাষ্ট্রগুলি কাঁচামালের উপর অধিকার লাভ করতে পায়নি'। ১৯২৫-২৬ সালে রবার সম্পর্কে আমেরিকার নীতি এই সত্যকেই প্রমাণিত করেছে। টিনের নিয়ন্ত্রণ অধিকার নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে টিনের দাম অস্বাভাবিক চড়া করে যে ভাবে অসাধু ব্যবসা চালানো হয়েছে তার ফলে দেশে দেশে রাষ্ট্রকর্ণধারেরা পরস্পরের প্রতি আক্রোশপরায়ণ হয়ে উঠেছেন। জাপান এবং ডাচ সরকারের মধ্যে বাণিজ্যিক আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পিছনেও এই একই কারণ। কলোনী অধিকারে রাখার ফলে এক একটি রাষ্ট্র বিশেষ এমন সুবিধাজনক অবস্থান পেয়েছে যার জন্য অন্য রাষ্ট্রের শিল্পোন্নতি বাধা পাচ্ছে পদে পদে। এই আক্রোশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে সম্ভব করেছে এবং আরো অনেক যুদ্ধকেই সম্ভব করবে যদি না সাম্রাজ্যবাদ চিরদিনের মত ধ্বংস হয় অনতিবিলম্বে। পৃথিবীর শান্তির শত্রু হোল এই সব পররাজ্য-লোভী সরকার এবং তাদের অবিবেকী অনুচরেরা।

কলোনীতে যে ধরণের শাসন ব্যবস্থা চালু থাকে তার মধ্যে মানুষের জীবন ও জীবিকার কোন নিরাপত্তা থাকে না এর প্রমাণ হোল অধুনা যুদ্ধে। বৃটিশ নৌবহরের উপর নির্ভর করে ডাচ সরকার ও ফরাসী সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের কলোনীকে শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধকারী রক্ষাব্যবস্থা করেনি। ছ'হাজার মাইল দূরবর্তী মহাদেশের কলোনী ফিলিপাইন তাই অমন সহজে শত্রুর করতলগত হতে পেরেছিল। তা' ভিন্ন শাসন অব্যবস্থার জন্য অসন্তুষ্ট স্থানীয় অধিবাসীরা মনিবের জন্য লড়াই করতে

উৎসুক হয়ে উঠবে এ ধারণা উন্মাদের। যতটুকু সাহায্য তারা করেছে তাও বাধ্য হয়ে এবং রুটির জন্য। ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে যে যুদ্ধ জয় করা যায় না আধুনিক যুদ্ধে তারই নির্মম পরীক্ষা হয়ে গেল। কলোনী শাসনব্যবস্থা কলোনীতে ভারী শিল্প গড়ে উঠতে দেয় না। কলোনীর কাঁচামালে শাসকের দেশ শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে মাত্র। এবং যুদ্ধকালে শত্রুব্যূহের বেড়াজাল ডিঙিয়ে ঐ সব এলাকায় যুদ্ধ উপকরণ প্রেরণ করা যে কত অসম্ভব তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। অথচ শিল্প প্রসারের উপরই আধুনিক মারণাস্ত্রের নির্মাণ নির্ভরশীল। কলোনী ব্যবস্থার এই ত্রুটি ইচ্ছাকৃত এবং এই কারণেই অমার্জনীয়।

শাসক সম্প্রদায় কলোনীর বাসিন্দাদের দয়িত্বশীল করে গড়ে তোলবার যে ধাপ্পাবাজী বহুকাল ধরে দিয়ে আসছে তার মধ্যেও অশান্তির বীজ গোপন হয়ে আছে। গত মহাযুদ্ধের পরে পরাজিত জার্মাণীকে কলোনী অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এই অজুহাতে যে জার্মাণী তার কলোনীতে অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষা করতে পারেনি'। কিন্তু বিজিত রাষ্ট্রগুলি তাদের আপন আপন কলোনীতেও সেই একই দুঃশাসন চালিয়ে এসেছে বহুকাল ধরে। এশিয়ার কোন কলোনীতেই, একমাত্র ফিলিপাইন ছাড়া, সত্যকার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হয়নি' অধিবাসীদের। নানা রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং অসামাজিক অসাধুতা করে সেখানকার জাতীয়তাবাদকে নিস্পেষিত করারই ষড়যন্ত্র হয়েছে, দেশের মধ্যে, বিভেদকারী বিভীষণ সম্প্রদায় নানা অজুহাতে সেই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। এই অপরাধ থেকে বৃটিশ, ডাচ এবং ফরাসী কোন রাষ্ট্রই বাদ যায় না। অশিক্ষায় এই সব দেশের অনেকাংশ মানুষ আজো আদিম যুগে বাস করছে। রোগ, অশিক্ষা এবং দারিদ্র্য কলোনীবাসীদের নিত্যসংগী। কোন কলোনী সরকারই উৎপীড়ন ও কুশাসনের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ বিচার সভায় উপস্থিত

হ'লে এইসব রাষ্ট্রকে চরম শাস্তিই পেতে হ'বে। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর রাজনৈতিক হাওয়া যেমন চলছে তাতে অপরাধীরাই বিচারক। কিন্তু ভবিতব্যতার হাতে কোন সভ্যতাই নিষ্কৃতি পায়নি' এবং পাবেও না।

কলোনীর অর্থনীতিতে সেই একই অন্যায়ের প্রতিপত্তি। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির চেয়ে তার অর্থনৈতিক সমস্যাই গুরুতর। এবং সেই অর্থনৈতিক অব্যবস্থার সড়ক দিয়ে জাতীয় আকাংখা ও আক্রোশ দ্রুত এগিয়ে আসছে সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতিকে পঙ্গু করবার জন্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধোত্তর যুগে আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। যুদ্ধপূর্ব বৎসরগুলিতে ধীরে ধীরে এই এলাকায় আমেরিকা অধিকতর পরিমাণে মূলধন খাটাবার চেষ্টা করে আসছে। তা ভিন্ন ব্রিটেনের মত তারও দেশের শিল্প প্রসারের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কাঁচামাল অত্যন্ত প্রয়োজন। ফিলিপাইন অধিকার করার পর থেকে পৃথিবীর এই অংশে আমেরিকা তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে এবং ধীরে ধীরে তার বাণিজ্য বীতংস বিস্তৃত করেছে। যুদ্ধের আগে বৃটিশের পক্ষে আমেরিকার এই সম্প্রসারণ গুরুতর চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। ফিলিপাইনকে এ বৎসরের জুলাই মাসে আমেরিকা যদি স্বাধীনতা দান করে তাহলেই আমেরিকার পক্ষে এই এলাকার অভিনয় শেষ হবে না বরং তার নূতন প্রধান অনুপ্রবেশের দিন আসবে।

আমেরিকা জানে যে যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যিক পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের সময় তার মূল দাবী অস্বীকার করবার উপায় নেই। কেন না এশিয়ার যুদ্ধে আমেরিকার সামরিক শক্তিই জাপানের পতন ঘটিয়েছে।

আমেরিকা জানে যে ভারত, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একশ কোটী মানুষের জন্য আমেরিকার রপ্তানী বাজার পড়ে আছে। তা ভিন্ন দশ বৎসর ধরে চীন যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা থেকে

চীনকে নূতনভাবে গড়ে উঠতে হলে ব্রিটিশ, আমেরিকার মূলধন তাকে গ্রহণ করতেই হবে। চীনের শিল্প প্রসারের জন্যও আমেরিকার মূলধন ও মালমসলা প্রয়োজন হবে। চীনের প্রায় ৫০ কোটী মানুষের জন্য অনতিদূর ভবিষ্যে একচেটিয়া বাজার পাবে আমেরিকা-জাত মাল। বস্তুতঃ যুদ্ধোত্তর যুগে এই চীন আমেরিকার বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নূতন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

চীনের সংগে তার সম্পর্ক অটুট ও নিরুপদ্রব রাখার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্নও অবহেলা করবার নয়। সেই কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভংগীর উপরও আমেরিকার হস্তক্ষেপ হয়ত অসম্ভব নয়। এই সব দেশের ঘরোয়া ও বৈদেশিক রাজনীতির উপর প্রত্যক্ষ চাপ দেবে যুক্তরাষ্ট্র তার ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে।

কলোনী শোষণ করার জন্য যে শাসন পদ্ধতি চালু আছে তার বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীন সত্বা প্রখর আপত্তি তুলবে এ আশা করা যায়। কেননা তার দেশও কলোনী ছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে যেভাবে আমেরিকা বিরুদ্ধশক্তিকে যোগান দিচ্ছে তা শুভ নয়। ফিলিপাইনের পুঁজিবাদী ও মধ্যমপন্থী নেতাদের সংগে ষড়যন্ত্র করে আমেরিকার বৈদেশিক শাসনদপ্তর যেভাবে ফিলিপাইনকে আরও অধিক দিন ধরে রাখবার চেষ্টা করছে তাও শুভ নয়। ফিলিপাইনের রাষ্ট্র ক্ষমতা যদিই বা এই সব পুঁজিবাদীদের হাতে এসে পড়ে তাও ফিলিপিনোদের মংগলের হবে না। কিন্তু আমেরিকা কলোনী সৃষ্টির পক্ষপাতী নয়। কেননা কলোনী মনিব রাষ্ট্রের সুস্থ জীবনে দুষ্ট ক্ষত যা একদিন জনবিক্ষোভে সাম্রাজ্যবাদের মূলকেই উৎপাটিত করবে। সেই কারণে অন্য দেশে শাসন অধিকার চাপানোর চেয়ে সেখানে বাণিজ্যিক সুবিধা গ্রহণ একদিকে যেমন নিরাপদ অন্যদিকে তেমনি লাভজনক। বর্তমান মহাযুদ্ধের শেষে আমেরিকার পুঁজিবাদের ঘরে অজস্র

অর্থ জমেছে। শিল্পোন্নতির ফলে আমেরিকা শ্রেষ্ঠ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে চলেছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যে আমেরিকা যে এশিয়ায় বিস্তৃত বাজার ও মূলধন খাটাবার সুবিধা খুঁজবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ সুবিধা না পেলে তার নিজের দেশে পুঁজিবাদীদের অসন্তোষ ঘনীভূত হবে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতার বিরুদ্ধে এবং দেশে বিপ্লব আসতে বাধ্য হবে। সে দুর্যোগ এড়িয়ে যাবার জন্য আমেরিকাকে বৈদেশিক নীতি পরিবর্তিত করে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব অভিলাষী হতেই হবে। আমেরিকার এই নীতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারত ও চীনের ভবিষ্যৎ জীবনে দূরপ্রসারী পরিস্থিতি রচনা করবে। তা ভিন্ন জাপানকে নিরস্ত্র করে ও তাঁবেদারী রাষ্ট্রে পর্যবসিত করে ফেল্লেও জাপানের আত্মা মরবে না। কেননা এশিয়ায় জাপানই প্রথম নবজাগরণের মশাল জ্বালিয়েছে।

সাম্রাজ্যলিপ্সা ও পররাজ্য শোষণ সে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনীতির কাছ থেকেই শিখেছে। য়ুরোপ আমেরিকার সমরশক্তিকে পরাজিত করে সে এশিয়ার রণশক্তিকেই প্রমাণ করেছে। সুতরাং পরাজিত জাপান এশিয়ার অন্য রাষ্ট্রবাসী পরাধীন মানুষদের আদর্শ হয়ে থাকবেই। যদিও জাপানী জংগী নীতি ও পররাজ্যলিপ্সার দুর্নীতি এরা কেউই ভালো চক্ষে কোনদিন দেখেনি, দেখবেও না।

অনেক সমালোচকের ধারণা যে বিংশ শতাব্দী য়ুরোপী সাম্রাজ্যবাদের অবসানকে গৌরবান্বিত করবে এবং রুশ ও আমেরিকান প্রতিদ্বন্দীতার লড়াইকে প্রত্যক্ষ করবে। ভারত চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই দুই শক্তিশালী বিরুদ্ধবাদী রাষ্ট্র নূতন প্রভুত্ব চাইবে যদিও অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রিয় প্রভুত্বের লালসা রাশিয়ার দিক থেকে আজও খুব প্রত্যক্ষ নয়।

ক্যারেণ ও শান রাজ্যকে নিয়ে বর্মার আয়তন দু'লক্ষ বাষট্টী হাজার বর্গ মাইল। অর্থাৎ আকারে ব্রহ্মদেশ বৃটেনের তিনগুণ। চীন, ইন্দোচীন এবং শ্যামের সীমান্তঘেঁসা পাহাড়গুলিতে বিরলবসতি পার্বত্য জাতির বাস। নিম্ন ব্রহ্ম, বিশেষ করে ইরাবতীর বদ্বীপে পৃথিবীর সর্বোত্তম ধান্য উৎপাদনের ক্ষেত্র। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আশী থেকে দু'শ পঞ্চাশ ইঞ্চি। বর্মার কটীদেশের রুক্ষ মৃত্তিকায় নানা ফসল। উত্তর বর্মায় আবহাওয়া আর্দ্র। ইরাবতীর উপত্যকা ঘিরে পর্বতের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেষ্টনী। এই সব পাহাড় শান, কাচিন, চীন ও অন্যসকল পার্বত্যজাতির বাসভূমি। ১৯৪১ সালের আদমসুমারিতে প্রকাশ যে বর্মার জনসংখ্যা ৬ কোটী ৭০ লক্ষ। এর মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই বৌদ্ধ। ১৯৩১ সালের হিসেবে প্রকাশ যে ক্যারেণরা সংখ্যায় ১৪ লক্ষ। বৃটিশ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় শাসন যন্ত্র যে দেশের উপর যখনই জাঁকিয়ে বসেছে শাসন ও শোষণ ছাড়াও তারা একটি মহৎ সর্বনাশ করেছে সে দেশের মানুষের। এই সর্বনাশের নাম ধর্মপ্রচার। শাসক প্রভুদের কখনো পিছনে, কখনো আগে এই সব মিশনারীরা এসেছেন

ধর্মপ্রচারের নাম করে দেশের মধ্যে ভবিষ্যতের বিষবৃক্ষ রোপণ করার জন্য। স্পেন ফিলিপাইনের অধিকাংশ মানুষকেই ক্রিশ্চান করেছে, যার ফলে আজ ফিলিপাইন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে থেকেও য়ুরোপ আমেরিকার মৈত্রী খুঁজছে। এই সব নব দীক্ষিত ক্রিশ্চানরা দেশে দেশে শাসকরাষ্ট্রের শাসন অবতারণের প্রথম দিকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে আর বিনিময়ে পেয়েছে অকল্পিত সুবিধা ও রাষ্ট্রশক্তি। বর্মাতে এই সব ক্যারেণদের মধ্যেই ক্রিশ্চানের সংখ্যা অনেক। এদের মধ্যে শিক্ষাও প্রচুর। এরা মনিব রাষ্ট্রের সমধর্মী হিসেবে বৃটিশের আশ্রয়ে স্বাধীনতাহীন নিশ্চিন্ত দিন যাপনের গ্লানি মাথায় নিতে কসুর করেনি'। ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকালেও ক্যারেণ নেতারা বিবৃতি দিয়েছিল যে, বৃটিশ কমনওয়েলথের সংগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা থাকতে চায় না। স্বাধীনতাকামী মানুষদের মধ্যে বাস করে এই সব ভ্রান্ত নেতারা আজও দেশের মুক্তি আন্দোলনকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করছে। তার কঠিনতম প্রতিঘাতও তারা পাবে। শানরা বাস করে শান পর্বতের মালভূমিতে। থাইদের সংগে এদের ঘনিষ্ঠতা। বত্রিশটি সামন্ত নৃপতির আওতায় বাস করে এরা। এরা ছাড়া উত্তর বর্মা ও উত্তর-পশ্চিম বর্মার পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে কাচিন্ন ও চীন সম্প্রদায়। শান রাষ্ট্রের মত এদের বাস এলাকাও মূল বর্মাভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ইংরেজ। অদূর ভবিষ্যতে জনমতের চাপে পড়ে যদি বৃটিশকে বর্মা ত্যাগ করতেই হয় তবে এই সব পার্বত্য অঞ্চল বৃটিশের করতল চ্যুত হ'বে না। স্বাধীন ভারতের পূর্ব সীমান্তে বৃটিশ যে রক্ষণাধীন এলাকার চেষ্টা করেছে তার সংগে যুক্ত হয়ে বর্মার এই সব রক্ষণাধীন এলাকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীন ভারত, বর্মা ও চীনের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের পক্ষে ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা হয়ে থাকবে। এশিয়া থেকে বৃটিশ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করতে না পারলে এশিয়ার জীবনে শান্তি আসবে না।

১৯৪১ সালের হিসেব মত ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা

ন্যূনপক্ষে ১০ লক্ষ। এদের মধ্যে অধিকাংশই দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা। রেংগুনের পাঁচ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২ লক্ষ সাতাশ হাজারই ভারতীয়। এদের মধ্যে পুরুষের হার স্ত্রীলোকের চেয়ে চার পাঁচ গুণ।

বর্মার জমির মালিকানা প্রাক্‌যুদ্ধকালে বর্মী চাষীর ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় এবং কমক্ষেত্রে বর্মী মহাজনরাই ছিল এই সব ফসল জমির মালিক। শ্রমিকদের মধ্যেও ভারতীয়দেরই সংখ্যাধিক্য। চীনারা বর্মায় একমাত্র খনি এলাকাতেই শ্রমিকের কাজ করে—তাদের সংখ্যা খুবই কম। বর্মার ঘরোয়া জীবনে ভারতীয়দের হাতে প্রচুর অর্থ ও রাষ্ট্রশক্তি ছিল। তার ফলে ১৯৩১ সালের আন্তর্জাতিক ব্যবসার মন্দার দুর্দিনে বর্মীদের মধ্যে ভারতবিদ্বেষী বোধ প্রখর হয়ে ওঠে। এই সময় বর্মায় ভারতীয় ও চীনাদের সংগে যে দাংগা বেধেছিল ভারত-বর্মা মৈত্রী ইতিহাসে তা' কলংকিত অধ্যায় হয়ে আছে। ১৯৩৭ সালের শাসন সংস্কারের ফলে বর্মা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু ভারতীয়দের জনসংখ্যা অথবা অর্থ নৈতিক বজ্রমুষ্টি একটুও শিথিল হয়নি'।

বর্মীদের মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব সমগ্রভাবে থাকার ফলে বর্মীদের জীবনের সংগে এই ধর্মের অনুশাসন গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব। এই সব সন্ন্যাসী সমাজের শ্রদ্ধায় ও সেবায় ধর্মাচরণ করে জীবন কাটায়। যদিও আজকের দিনের বর্মায় কোন সুগঠিত বৌদ্ধবিহার নেই—তবু ছোট ছোট বিহারে এই সব সন্ন্যাসীরা স্থানীয় অধিবাসীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দান করে ও ধর্মবোধ জাগায়। ভ্রাম্যমান ফুংগীরা আহার বাসস্থানের বিনিময়ে যে কোন গ্রামে বাস করবে ও গ্রামের শিক্ষার ভার নিতে সম্মত হয়। ১৯৩১ সালের হিসেবে জানা গেছে যে গৃহস্থ বর্মীদের সেবায় বর্মার ১ লক্ষ ২৩ হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী দেশের নানা এলাকায় এই মহান সাধনায় ব্রতী হয়ে রয়েছে। বর্মীরা অত্যন্ত ধর্মপরায়ন ও ভদ্র জাতি—তাই

তাদের সামাজিক জীবনে এই সব ফুংগীদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। পার্বত্য অঞ্চলবাসী বর্মীদের এক বিরাট দুর্নাম ছিল অপরাধী হিসেবে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে দুর্নাম কাটিয়ে উঠছে তারা।

সাধারণতঃ বর্মীরা জীবনকে সহজ আনন্দে গ্রহণ করতে পারে। ব্রহ্মের মাটি মমতাময়ী মা—তাই বর্মার কৃষিকার্য মানুষ খাদ্যাভাবে কোনদিন অস্থির হয়নি'। বর্মার কৃষি জীবন এমন যে, বর্ষা অবসানের সংগে সংগেই কঠোর শ্রম প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তারপর জমির ফসল বিক্রী হয়ে গেলেই আবার বর্ষাগম অবধি চাষীর কিছুই করবার থাকে না। এই প্রাকৃতিক পরিস্থিতি বর্মীকে আলস্যপ্রিয় করে তুলেছে। কিন্তু বর্মীরা যে কষ্টসহিষ্ণু ও শ্রমী তার প্রমাণ করেছে অধুনাতন বর্মা। আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দীতার সম্মুখীন হয়ে তারাও নানাভাবে নিজেদের প্রস্তুত করেছে এবং করছে।

ব্রহ্মের সামাজিক জীবনে মেয়েদের স্থান উপরে। আইন ও দেশের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মেয়েরা পুরুষের সংগে সমানভাবে পরিশ্রম করে এবং সম অধিকার ভোগ করে। বর্মী মেয়েরা পর্দাপ্রথা অনুসরণ করেনি বা অন্তঃপুরিকা হয়ে থাকেনি কোনদিন। ছোট ছোট ব্যবসা মেয়েদের নিয়ন্ত্রণাধীনে। পরিবারের আয়ের অংকে মেয়েদের অংশ উপেক্ষার নয়। বর্মী ভাই বোন সম্পত্তির সমান অংশীদার, স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির ভাগ পায়। এখানে পারস্পারিক সম্মতিই বিবাহের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারে এবং বিবাহ চুক্তিও বাতিল হয় সহজে।

ব্রহ্মের প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত। ব্রহ্মকে বলা হয় এশিয়ার ধানের গোলা। বৎসরে উৎপন্ন চালের পরিমাণ তিন থেকে সাড়ে তিন কোটী টন। বিদেশে চাল রপ্তানী করে ব্রহ্ম মোটা টাকা ঘরে তোলে। ব্রহ্মের বনজ সম্পদ অতুলনীয়। সমগ্র আয়তনের শতকরা ৫৭ ভাগই বনভূভাগ। ব্রহ্মই পৃথিবীর প্রধান টীক উৎপাদক। প্রতি বছর আট লক্ষ টন কাঠ আহরিত হয় এবং এর অর্ধেকই প্রায় টীক। টীক বাইরে রপ্তানী হয় এবং বাকী

কাঠের অনেকাংশ দেশে জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মের বনভূভাগের বেশীর ভাগই ইংরেজ কোম্পানীর নিকট লীজ দেওয়া এবং তারা এর থেকে বেশ মোটা টাকা আয় করে। ব্রহ্মে রবার ক্ষেত্রের পরিমাণ কম পক্ষে ১০০,০০০ একার এবং বাৎসরিক উৎপাদন ৮[illegible]০ হাজার টন। এসব ছাড়াও জোয়ার, তিল, চীনাবাদাম ও তুলা উৎপাদিত হয় ব্রহ্মে।

বছরে একমাত্র বড়উইন থেকেই ৭০-৮০ হাজার টন সীসা পাওয়া যায়। পৃথিবীর সীসা উৎপাদক হিসেবে ব্রহ্মের স্থান ষষ্ঠ আর পৃথিবীর টিনের আট ভাগই আসে ব্রহ্ম থেকে (৫—৭০০০ হাজার টন)। রৌপ্য, টাংষ্টেনও ব্রহ্মের প্রধান খনিজ সম্ভারের অন্যতম। পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম উৎপাদক হিসেবে ব্রহ্মের স্থান নগণ্য হলেও ভারতীয় বাজারের জন্য পেট্রোলিয়াম ব্রহ্মের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। উত্তর ব্রহ্মে চুনী প্রভৃতি মূল্যবান মণিরত্নের খনিও আছে।

খনিজ ও মৃত্তিকা সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হয়েও ব্রহ্ম প্রধানতঃ কৃষি প্রধান দেশ। কয়েকটি চাল এবং তেল ও খনিজদ্রব্য আহরণের কল ছাড়া বড় রকমের কোন শ্রমশিল্প নেই ব্রহ্মে। ফ্যাকট্রিতে কাজ করে শ্রমিকের সংখ্যা গত কয়েক বছর ৮০,০০০'র কোঠায় এসে পৌঁছেছে এবং এর অর্ধেকই কাজ করে চালের কলে। তারপরই আসে তেল আহরণ ও শোধণের কাজ। নামটু ও মায়টি'র ধাতু গলান'র কাজ, প্রোমের উত্তরে কংক্রিটের কারখানা, মৌলমেনে করাতের কারখানারও নাম করা চলে। শুষ্কাঞ্চলে উদ্ভিজ্য তেলের কল, তুলা ধোনার কল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর আবার বড় দুটিরই মালিক ছিল জাপানীরা। এছাড়া মাত্র দুটো কাপড়ের কল আছে ব্রহ্মে। রেংগুণে রেলওয়ে ইয়ার্ড, মেরামতী কারখানা, ছোট ছোট ডক, ফাউণ্ড্রি বা দু'একটা শ্রম প্রতিষ্ঠান থাকলেও বৃহত্তর শিল্প প্রতিষ্ঠান একটিও নেই ব্রহ্মে।

কিন্তু ছোট ছোট কুটীর শিল্প সারা ব্রহ্মে প্রায় ছেয়ে আছে

বলা চলে। রেংগুণের বাজারগুলিতে ঘুরলে দেখা যাবে কী পরিমাণ হাতের কাজের খুচরা ব্যবসা চলে এখানে। ১৯৩১'র হিসেবে প্রকাশ—প্রায় ৪২,০০০ শ্রমিক সূচিশিল্প ও বয়ন শিল্পে নিয়োজিত। চুরুট তৈরী করে যারা তাদের সংখ্যাও ২৩,০০০ হাজার। এরা ঘরে বা বাজারে ছোট ছোট দোকানে কাজ করে। এদের বেশীর ভাগই মেয়ে। এছাড়া নৌকা তৈরী, জেমকাটিং, ছাতা তৈরী, রেশম শিল্প ও দারু শিল্প, পটারী ও অন্যান্য ছোটখাট হাতের কাজ করে কিছু লোক জীবিকা অর্জন করে। কিন্তু তাহলেও বর্মী শ্রমিকদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

ব্রহ্মের ইতিহাস প্রাচীন। ব্রহ্মের সংগে ভারতবর্ষ ও চীনের আত্মিক ও অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের ইতিহাসও বহুদিনের। একদা বর্মার ভূমিতে সমৃদ্ধিশালী রাজশক্তি গড়ে উঠেছিল। অগণ্য বৌদ্ধ বিহারে খচিত হয়েছিল ব্রহ্মের সমতলে ভগবান বুদ্ধের নাম। আজকের দিনের পরশাসিত ও উৎপীড়িত ব্রহ্মের তরুণের মনে সেইসব দিনের ইতিহাস নূতন জাতীয়তার জোয়ার আনে। সেইসব স্বর্ণযুগের নিদর্শন আজও বিচলিত মানুষের মনে আপোষহীন সংগ্রামের বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি জোগায়।

বর্মার ইতিহাস রক্তাক্ত। নানা সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষে অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি বর্মার মাটি রক্তে ভিজেছে—বর্মার আকাশ রণধ্বনিতে মাতাল হয়েছে।

ব্রহ্মের মাটিতে প্রথম যে য়ুরোপীয়ান পদার্পণ করেছে তার নাম নিকানো ডিকনটি। ইনি ভেনিসের একজন ব্যবসায়ী। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি বর্মায় আসেন। আরো দু'একজন ইতালীয়ও এসেছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতেই প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপীয়ানরা দলে দলে বর্মায় প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। পর্তুগীজ সরকার বর্মায় কোন সাম্রাজ্য স্থাপন করেনি' অবশ্য, কিন্তু বিরোধী বর্মী সামন্ত রাজাদের অধীনে তারা বহুবার গৃহবিপ্লবে যোগদান করেছে। এরপর ১৭ ও ১৮ দশ শতাব্দীতে ফরাসী, ইংরেজ ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীগুলি বর্মায় বাণিজ্যিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু দেশের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া ও বর্মীদের বলিষ্ঠ জাতীয়তা-বোধের প্রতিবন্ধকতায় জমি দখল করতে পারেনি'।

বর্মার শেষ স্বাধীন রাজবংশ হোল আলাউং পায়া রাজবংশ। ১৭৫২ সাল হতে ১৮৮৫ অবধি বর্মায় তারা স্বাধীন রাজত্ব করেছেন। এই বংশের নরপতিরা চীনা আক্রমণ হটিয়েছেন, আসাম ও মনিপুরে হামলা করে রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তার করার চেষ্টা করেছেন। আরাকান অবধি এদের সাম্রাজ্যের গণ্ডী বিস্তৃত হওয়ার ফলেই বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংগে এদের যোগাযোগ ঘটে অশুভ মুহূর্তে। সীমান্ত নিয়েই প্রথম বর্মাযুদ্ধ বাধে ১৮২৪ সালে। এই যুদ্ধে বর্মাসম্রাট আরাকান ও টেনাসেরিম এলাকা কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং ১০ লক্ষ পাউণ্ড দিতে হয় যুদ্ধের খেসারত। যুদ্ধের কিছুকাল পরে বর্মার রাজধানীতে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট বাস করতে থাকেন। নানা অপচেষ্টার ফলে ১৮৫২ সালে দ্বিতীয় বর্মাযুদ্ধ ঘনিয়ে ওঠে। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বর্মাসম্রাট সমগ্র নিম্নব্রহ্ম বৃটিশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। ১৮৬২ সালে আরাকান, টেনাসেরিম ও পেগু একটি প্রদেশে একত্রিত করে বৃটিশ বর্মার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। এখানকার সর্বময় কর্তা চীফ কমিশনার—একমাত্র ভারতের বড়লাটের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য তিনি। এইভাবে বর্মার তীরভূমি ও ধান্য উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি হারিয়ে ফেলে বর্মার রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। এই সময় থিব ছিলেন বর্মার সম্রাট। বৃটিশ ব্যবসায়ী ও বৃটিশ রাষ্ট্রকর্ণধারদের কূট চক্রান্তের ফলে তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ ধূমায়িত হয়ে ওঠে ১৮৮৫ সালে। এযুদ্ধ স্থায়ী হয় মাত্র ১৫ দিন কিন্তু এর জের চলেছিল অনেক দিন। আরো পাঁচ বছর নানাভাবে মুক্তির চেষ্টা করে অবশেষে বর্মার মুক্ত আত্মা শৃংখলে বাঁধা পড়ে।

এইসব যুদ্ধে কোম্পানীর পক্ষ সমর্থন করে লড়েছিল ভাড়াটিয়া ভারতীয় সেনা। বর্মা দখলের পর বিজয়ী সেনাবাহিনীর দেশের

মানুষ দলে দলে বর্মায় ছুটে গিয়েছে। পরাজিত জাতির সর্বস্ব লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। একদিকে বৃটিশ লুণ্ঠন করেছে—অপরদিকে ভারতীয়েরা অর্থনৈতিক জীবনের চাবীকাঠি দখল করবার চেষ্টা করেছে। তার ফলে বর্মার মানুষ ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে।

আজকের দিনে ভারতীয়দের যে অর্থনৈতিক অধিকার তার বিরুদ্ধে বর্মীদের অভিযোগ আছে। শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ভারতীয়দের উপর তাদের আক্রোশ যা কিছু, তার মূল কারণ ভারতীয় মহাজন ও ধনিক সম্প্রদায়ের নির্লজ্জ লোভের ফলেই। ভারত-বর্মা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই সঞ্চিত বিক্ষোভ অমংগলের। ভারত-বর্মার মধ্যে নূতন মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলতেই হ'বে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধারদের।

বর্মা দখলের পর থেকে ১৯৩৭ সাল অবধি ভারতের অংশ হিসেবে বর্মার অবস্থান ছিল। এই সময় শুল্ক হারের নিয়ন্ত্রণ করে যন্ত্র ও লৌহ শিল্পকে প্রসারণ করার যে নীতি গ্রহণ করা হয় তার ফলে ভারতীয় পুঁজিবাদীরাই লাভবান হয়েছিল। বর্মার শিল্পপতিদের বাঁচান'র কোন অর্থই হয়নি, কারণ বর্মী শিল্পপতির কোন অস্তিত্বই ছিল না। এর ফলে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য কেনার জন্য বাহির পৃথিবীর বাজারের চেয়ে শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বেশী দাম দিতে হয়েছে বর্মার খরিদ্দারকে। বর্মার উন্নত জীবন মানের জন্য এবং বর্মার আয়করের নির্ধারণ ভারতের অনুপাতে উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকার জন্য বর্মীরা নানাভাবে বৈষাম্যমূলক অসুবিধা ভোগ করেছে। ভারতের সংগে তাদের অবিভাজ্যতায় বর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিছুটা। তাছাড়া ভারতীয় অনুপ্রবেশের ফলে বর্মীদের জীবনে প্রখর প্রতিদ্বন্দ্বীতাও এসেছে।

বর্মীরা সেই কারণে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছিল অনেকদিন ধরে। অবশ্য বর্মীদের এদাবীর যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বর্মা চিরদিনই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।

ভারতীয় ও বর্মী দু'টি বিভিন্ন জাতি। বর্মার সার্বভৌমত্বের উপর ভারতীয় দাবী ছিল না কোনদিনই। যদিও কখনো কখনো রাজ্য-বিস্তারের লুব্ধতায় দুই রাষ্ট্রের শাসক সম্প্রদায় সীমান্ত নিয়ে হানা-হানি করেছেন কিন্তু ভারত-বর্মা কোনদিনই সংগ্রামশীল জাতি নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই এশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক সূর্য মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে। এশিয়ার জীবনে য়ুরোপ রাহুর মত এসে পড়ল। ধীরে ধীরে এশিয়ার স্বাধীনতা সূর্য সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল। প্রথম কিছুদিন মনে হয়েছিল হয়ত এই অন্ধকার চিরস্থায়ী। হয়ত এশিয়ার নবজাগরণ অবাস্তব স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু মানুষ স্বাধীনতার আনন্দ ভুলতে পারে না। নিজের স্বাধীন দেশে মানুষ ভিক্ষুকের মতও বাঁচতে ভালবাসে। তাই দেশের ভাবগংগায় আবার স্বাধীনতার আকাংখা জোয়ারের মত দুকুল ছাপিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জাপান যেদিন য়ুরোপীয় শক্তি রাশিয়াকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করল সেদিন সমগ্র এশিয়ার জীবনে নূতন প্রাণশক্তি জাগ্রত হোল। ১৯০৮ সালে জনহিতকর কার্য এবং বৌদ্ধ ধর্ম রক্ষণ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে ইয়ং মেনস বুদ্ধিষ্ট এ্যাসোসিয়েশান স্থাপিত হয়। বর্মায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব গভীর—তাই এই সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনার সড়ক দিয়েই এই প্রতিষ্ঠান দেশের জনমতকে বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রবুদ্ধ করে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের সময় এই প্রতিষ্ঠানে দুই বিরোধী দল মাথা তুলল। প্রাচীনেরা শাসক রাষ্ট্রের সংগে সহযোগীতায় সম্মত হলেন কিন্তু দেশের তারুণ্য ব্যাপকতর শাসন সংস্কারের দাবী জানিয়ে আন্দোলন সুরু করে দিল।

তরুণ যে দল ওয়াই. এম. বি. এ থেকে বেরিয়ে এল তারা জেনা-রেল কাউন্সিল অফ্ বর্মীজ এ্যাসোসিয়েশান গঠন করল। ধীরে ধীরে এদের মধ্যেও ফাটল ধরল। পিপল্স পার্টি শাসন সংস্কারে যোগ দিল কিন্তু জি. সি. বি. এ. নতুন পরিষদ বর্জন নীতি অনুসরণ করতে লাগল।

এর অনেক আগে থেকেই দেশের একদল বর্মাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য দাবী তুলেছিলেন। কিন্তু ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারের সময় অবধি তার আওয়াজ জোরে ওঠেনি। এই সময়ে যদিও শাসন সংস্কার পরিষদে একদল এই দাবী পুনরুত্থিত করে কিন্তু বৃটিশ সরকার পাছে বর্মাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে অধম ক্রাউন কলোনীতে পর্যবসিত করে এই ভয়ে বিপক্ষদল প্রবল বাধা দেয়। এর ফলে এই ব্যবচ্ছেদ কার্যকরি হয়নি তখন।

১৯৩০ সাল থেকেই বর্মার জাতীয়তাবাদ বহির্মুখী গতি নিয়েছে। এই সময় থেকেই দেশের শিক্ষিত যুবকদল দেশের সম্বন্ধে গভীরভাবে সচেতন হয়ে ওঠে এবং বর্মায় কিভাবে বর্মীরা অর্থ নৈতিক জীবনে দিনে দিনে কোণঠাসা হচ্ছে সে সম্বন্ধে তারা চিন্তা করতে সুরু করে। একদিকে বৃটিশ সরকারের শাসন ও শোষণ এবং অপরদিকে ভারতীয়দের আর্থিক কর্তৃত্ব—এই দুই কারণে গ্রামে গ্রামে চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে। এর ফলে ১৯৩১ সালের আবরাড়ি বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।

এই সময়ই বর্মার থাকিন আন্দোলন সুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে থাকিন পার্টি যদিও বিপুল জনমত গঠন করতে পারেনি কিন্তু কিঁষাণ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের কাজ হয়েছিল প্রচুর। থাকিনরা সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী।

১৯৩০ সালের মে জুন মাসে রেঙ্গুনে যে বর্মী-ভারতীয় দাঙ্গা বেধেছিল তার মূলে ছিল ভারতীয় বিদ্বেষ এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী। রেঙ্গুন বন্দরের জাহাজে মাল বোঝাই, খালাস প্রভৃতি কাজের জন্য ষ্টিভেডোর ছিলেন সবই ভারতীয়। তাদের মধ্যে বর্মীদের নেওয়ার আপত্তির ফলেই এই দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। এর ফলে ভারতীয়দের মধ্যেই প্রাণ ও সম্পত্তি হানি হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। ১৯৩২ সালে আবার দাঙ্গা বাধে চীনা বর্মীদের মধ্যে। এই দাঙ্গা এবং এর পরের দাঙ্গা ও ধর্মঘটের পিছনে বর্মার জাগ্রত জাতীয়তাবোধের কথাই ব্যক্ত হয়ে পড়েছে—বৈদেশিক অর্থ নৈতিক

নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বর্মীরা যে সুস্থভাবে দেশে বাঁচতে পারবে সেই দাবী যে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে এসব তারই প্রমাণ।

এই সময় ডাঃ বা ম' রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯৩১ বিদ্রোহের পর বিদ্রোহীদলের সায়াসান ও অন্যান্য কয়েকজন বিদ্রোহীর পক্ষ সমর্থন করায় তিনি দেশের শ্রদ্ধা লাভ করেন। তিনি সে সময় ভারত ব্যবচ্ছেদ নীতি সমর্থন না করলেও ১৯৩৭ সালের নূতন শাসন পরিষদে তিনি প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৩৫'র গভর্ণমেন্ট অফ বর্মা আইন অনুযায়ী শাসন সংস্কারের ফলে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন বর্মায় ভারতের মতই নূতন শাসন সংস্কার চালু হয়। বর্মার অবস্থা হয় ত্রিশংকুর মত—না ডোমিনিয়ান, না কলোনী। যদিও ভারত সচিবই বর্মা সচিব রইলেন তবুও ভারত সরকারের অধীন দপ্তরগুলি বর্মা সরকারের এলাকাভুক্ত হোল।

১৯৩৯ সালের জঘন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা ও ছাত্র ধর্মঘটের ফলে বা ম' মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। এই মন্ত্রীত্ব পতনের পর অবিরত মন্ত্রীত্ব গঠন ও পতন চলতে থাকে। তার কারণ কোন বিশেষ আদর্শের উপর ভিত্তি করে কোন দলই তখন বর্মা রাজনীতিতে প্রবল হতে পারেনি। ছোট ছোট দলের মধ্যে যখন যেভাবে মিতালী হয়েছে, সেইভাবে মন্ত্রীত্ব উঠেছে পড়েছে। বর্মার রাজনীতির তরুণ নেতারা দেশের এই বিচ্ছুরিত রাজনৈতিক চেতনাকে সংহত করে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হ'তে লাগল এই সময় থেকেই।

বা ম' মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়ে ১৯৩৯ সালে ইউ পু সরকারী দল গঠন করেন। ইউ পু তার মন্ত্রীসভায় উ স' নামে একজন দলনেতাকে গ্রহণ করেন। ১৯৩০—৩১ সালের বিপ্লবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উ স' প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন ইতিমধ্যেই।

১৯৪০ সালে উ স' তার নিজের দল গঠন করেন। এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী নেতা বা ম'কে জাপ সহযোগিতার অপরাধে

কারাগারে নিক্ষেপ করেন। বা ম' অবশ্য পরে মোভাক জেল থেকে শান রাজ্যে পালিয়ে যান এবং মান্দালয় জাপ দখলে যাবার পর আবার রেঙ্গুনে ফিরে আসেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপ আক্রমণ সুরু হবার কিছু পূর্বেই উ স' বৃটিশ জনগণের কাছে বর্মীদের শুভেচ্ছা বহন করে ইংলণ্ডে যান। যুদ্ধ শেষে বৃটিশ সরকার যাতে বর্মাকে স্বায়ত্বশাসনের মর্যাদা দেয় তার প্রতিশ্রুতি আদায় করবার জন্যেই তিনি গিয়েছিলেন। কিন্তু বিফল মনোরথ হয়ে তাকে শূন্যহাতে ফিরে আসতে হয়। ইংলণ্ড থেকে পরে তিনি আমেরিকায় চলে যান। কিন্তু সেখান থেকে মাতৃভূমিতে ফেরবার সময় তিনি বৃটিশ সরকার কর্তৃক ধৃত হন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল জাপ সহযোগিতার। বৃটিশ সরকার তাকে সারা যুদ্ধবৎসরগুলি উগাণ্ডায় বন্দী করে রাখেন। পরে তিনি মুক্তি পেয়ে বর্মায় ফিরেছেন।

উ স'র জীবন উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর। বর্মার ডাকাত সর্দারের ছেলে উ স' হাই স্কুলের পাঠ শেষ করে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়তে আসেন। কিন্তু এক বছর পরে আবার তাকে ফিরে যেতে হয়—কেননা কলেজের উপযোগী ইংরাজী বিদ্যা তিনি অর্জন করতে পারেননি'। উ স' নিজের অধ্যয়ণের ভার নিজেই গ্রহণ করেছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তিনি বর্মায় একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা হয়ে উঠেন। ইংরাজী জ্ঞানও নাকি তার প্রচুর। কলেজী পাঠের পর উ স' কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছিলেন। উ স'র রাজনৈতিক মতবাদ কঠিন ধাতুতে তৈরী। বৃটিশ সরকার তাকে ভয় করেন বলেই দেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে বন্দীজীবনে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু উ স'র বিরুদ্ধে বৃটিশের অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে।

উ স'র স্থানে নরমপন্থী দলের নেতা স্যার পাতুন প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি এর আগের প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রীমণ্ডলেরই সদস্য ছিলেন।

এই সময় বর্মার থাকিন পার্টির নেতারাও অনেকেই কারাগারে ছিলেন। এদের নেতা থাকিন সু। বাঙালী নেতা ছিলেন কমরেড ঘোষাল। বৃটিশ সরকার এইসব থাকিন নেতাদের গ্রেপ্তার করে রাখলেও যখন জাপানী অভিযানের আশংকায় বর্মার সামরিক শক্তি ভেঙে পড়ার যোগাড় হচ্ছে তখনও কারাপ্রাচীরের অন্তরাল থেকে এইসব নেতারা জাপদের বিরুদ্ধে দেশের জনমতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বৃটিশ সরকার কোনদিনই দেশের জনমতকে শ্রদ্ধা করেনি—সুতরাং দুর্যোগের দিনে তারা দেশের মানুষ ও ঐতিহ্যকে দস্যুদের কবলে ফেলে পালিয়ে আসতেও লজ্জাবোধ করেনি। জাপ দখলের কিছুদিন পরেই মান্দালয় জেলের ফটক ভেঙে থাকিন সু ও তার সহকর্মীরা বেরিয়ে আসেন। জপানীদের বিমান হানায় কাঁথ জেলের অবরোধ প্রাচীর গুঁড়িয়ে গেলে কমরেড ঘোষালও বাইরে আসেন। এরাই পরে আউং সানের নেতৃত্বে বর্মার গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলেন।

১৯৪০ সালে আউং সান ও ত্রিশজন তরুণ বর্মী জাপানে পালিয়ে যান। সেইখানে তারা আজাদী বর্মী ফৌজের কেন্দ্র শক্তি গঠন করেন। এরা জাপানের অগ্রগামী সৈন্যদের সংগেই আসে। কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে জাপানের সৈন্যবাহিনীর সংগে এলেও এরা নিজেদের মাতৃভূমিকে জাপানের অধীন করতে আসেনি। বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির চাপে আর এক বিদেশী শাসনকে চিরদিনের মত দেশ থেকে হঠিয়ে দেবার আশাতেই তারা এসেছিলেন। এবং জাপানী জংগী শাসনের আমলে এই আজাদী বর্মী ফৌজই দেশের সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দলকে ফ্যাসীবিরোধী লীগে সংহত করে আন্দোলন চালাতে সুরু করে। ১৯৪২ সালে জাপানীরা যখন মৌলমেন দখল করে তখন থাকিন আউং সান ব্রহ্ম স্বাধীনতা বাহিনীর কম্যাণ্ডার ছিলেন। তখন তার বয়স মাত্র ত্রিশ বছর। ১৯৩৮ সালে আউং সান রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হন। ঐ বছরই তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ও পরে থাকিন পার্টির

সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে বৃটিশের আইনে ধরা পড়বার ভয়েই তিনি ও তার সহকর্মী কয়েকজন জাপানে পালিয়ে যান। জাপানের প্রতিশ্রুতিতে এরা প্রথমে বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু তাদের ভুল ভাঙতে একটুও দেরী হয়নি। মৌলমেন ও টেনাসেরিম অধিকারের পরই আউং সান এইসব এলাকায় জাপানী প্রভাবমুক্ত শাসন কর্তৃত্ব দাবী করেন। কিন্তু জাপান তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় যে রেঙ্গুন দখলের পর তাদের দাবী তারা বিবেচনা করবে। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ জাপানীরা রেঙ্গুন অধিকার করে। তখন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে সমগ্র বর্মা দখলের পর সে প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ জাপানী জংগীবাদের সংগে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী ধাপ্পাবাজী যে একই শ্রেণীর তা' বুঝতে দেরী হয় না আউং সানের। সুতরাং সর্বদলকে একত্রীভূত করে দেশের শাসন ব্যবস্থা হস্তগত করবার চেষ্টা করলেন তিনি। সর্বদলের মিলিত চাপে জাপানী জেনারেল আইডার সভাপতিত্বে বর্মা সরকার গঠিত হয়। জাপানীরা নির্দেশ দিয়েছিল যে একবছর এই তাঁবেদারী সরকার কার্যকরী থাকবে—তারপর সমগ্র শাসন ক্ষমতা বর্মী জনসাধারণের হাতেই চলে আসবে।

এই অন্তবর্তী তাঁবেদারী সরকার গঠনে থাকিন দল সন্তুষ্ট হল' না কারণ জাপানী অনুগৃহীত বা ম'ই এই সরকারে একনায়কত্ব চালাতে লাগলেন।

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসেই জাপানী সরকার বা ম' ও তার সহকারী থিয়েন মিং, থাকিন দলের নেতা আউং সান ও মিয়াকে টোকিওতে নিয়ে যায়। বর্মার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জাপানের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই এই চাল দেয় জাপানের জংগী রাজতন্ত্র।

এইভাবে টানাপোড়েন চালিয়ে অবশেষে ১৯৪৩ সালের ১লা আগষ্ট জাপানীরা বর্মার স্বাধীনতা স্বীকার করল। এই তথাকথিত স্বাধীনতার মূল্য হিসেবে বর্মা সরকার মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

বা ম'র জাপানী সহযোগীতার নীতি এবং দেশের ক্রমবর্ধমান দুঃস্থতা এই দুই পরিস্থিতিতে ফ্যাসীবিরোধী লীগ অস্থির হয়ে উঠল। আউং সান বা ম'র পতনের জন্য দেশের জনমত গঠন করতে লাগলেন। ১৯৪৩ সালের নূতন গঠিত সরকারে আউং সান যুদ্ধমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন।

এই সময় থেকেই জাপ গোয়েন্দা বিভাগ আউং সানের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা সুরু করেছিল। তার উৎসাহে বর্মার গেরিলা বাহিনী সুনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়ে ওঠে এবং মিত্রপক্ষের রসদ ও অস্ত্র সরবরাহের ফলে জাপানের জংগীনীতি পদে পদে ব্যাহত ও বিব্রত হতে থাকে।

এইভাবে একদিকে মিত্রশক্তির ক্রমাগত বিমান হানা এবং অগ্রগতি, অপরদিকে বর্মার গেরিলা বাহিনীর তৎপরতা—এই দু'য়ের ফলে বর্মায় জাপ অধিকারের দিন শেষ হয়ে এল।

১৯৪৫ সালের ৪ঠা মে মিত্রবাহিনী যখন রেঙ্গুনে প্রবেশ করল তার দুদিন আগেই গেরিলারা রেঙ্গুন দখল করে ফেলেছে। ১৯৪৪ সালে আউং সান ফ্যাসী বিরোধী দলে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ সালে তার নেতৃত্বে এই ফ্যাসী বিরোধী দল অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ দল হ'য়ে ওঠে।

অন্যসব অধিকৃত অঞ্চলের মত বর্মাতেও জাপানীরা জঘন্য অত্যাচার ও কুশাসন চালিয়েছে। 'এশিয়া এশিয়াবাসীর' ধূয়ায় যেটুকু আবেদন জেগেছিল তার মধ্যে জাপপ্রীতির অংশ বেশী নয়। অন্ততঃ বর্মা যে জাপানী কর্তৃত্ব চায়নি' এ প্রমাণ হয়ে গেছে। বৃটিশ সরকার যেভাবে বর্মায় শাসন চালিয়েছে এবং জাপানী আক্রমণের চাপে যেভাবে বর্মা ত্যাগ করেছে তার অভিজ্ঞতায় বৃটিশ শক্তিমত্তার উপরই কেবল ব্রহ্মবাসীরা শ্রদ্ধা হারিয়েছিল তা নয় য়ুরোপীয় শ্বেত শক্তির মনুষ্যত্বহীনতা ও দায়িত্বহীনতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল চরমভাবে। জাপানীদের প্রতিশ্রুতিতে তারা প্রথমে বিশ্বাস করেছিল বটে কিন্তু অস্পষ্টতা কমে যেতে

কয়েকদিনের জাপশাসনই যথেষ্ট হয়েছিল। বর্মা জাতীয় বাহিনী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ দুইই জাপানীদের অস্ত্রের উপর নির্ভর করেছিল বটে কিন্তু দুটি বাহিনীই বর্মা ও ভারতের স্বাধীনতা লাভের উদ্দীপনায় সকল বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবকেই গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন ইতিহাস এবং কার্যক্রম যতদূর জানা গিয়েছে তার মধ্যে থেকে এই তীব্র দেশাত্মবোধই জাগ্রত হয়ে উঠেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও জেনারেল আউংসানের মধ্যে কর্মপদ্ধতির যে সমতা আছে তা' বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। বৃটিশ সরকার এদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা না জানালে এই দুই প্রতি-বেশী দেশের জনমত আরো কুশ্রীভাবে বিষিয়ে উঠবে, যার দূরপ্রসারী ফল হ'বে অত্যন্ত অশুভ।

জাপানী জংগীনীতি বর্মায় নারী পুরুষ ও দেশপ্রেমিকদের উপর জঘন্য পাশবিকতা চালিয়েছে। লুণ্ঠন ও হত্যালীলা চালিয়েছে অবাধে। কুশাসনের ফলে বর্মাকে দুঃস্থতার পংকিল খাদে নামিয়ে দিয়েছে।

অবশ্য বৃটিশ সরকারের দায়িত্ব কম নয়। যেভাবে বৃটিশ বর্মা ত্যাগ করে এসেছে তার ফলে বর্মীরা ছাড়াও ব্রহ্মপ্রবাসী হাজার হাজার ভারতীয়ের যে শোচনীয় দুরবস্থা হয়েছিল তার সত্য ইতিহাস একদিন লেখা হবেই। যেভাবে ভারতীয়রা বিপদের মুখে, অনশনের মধ্যে দেশের আশ্রয়ে ফিরে এসেছে এবং পথে যেভাবে লুণ্ঠিত ও মৃত্যু কবলিত হয়েছে তার কাহিনী আমরা অনেক জেনেছি এবং শুনেছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কলংকিত অধ্যায়ের সে একটি।

ইংরাজ বর্মাকে শাসন করেছে, শোষণ করে সপ্তসমুদ্র পারের তহবিলে মোটা মোটা লভ্যাংশ চালান দিয়েছে কিন্তু তাকে বিপদের দিনে রক্ষা করতে পারেনি'। এ অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ বর্মা-ইংরেজ সম্পর্ক কটু করে তুলবে। আগন্তুক দুর্যোগের মুখে বর্মার প্রধান মন্ত্রী সহযোগীতা প্রত্যাশী উ স'কে যেভাবে দেশে

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তুপের মধ্যে অবিক্ষত একটী মূর্ত্তি, ভগবান বুদ্ধের। ব্রহ্মের ভামো সহরে।

["Courtesy: A MILLION DIED by Alfred & Valerie Wagg, Published by Thacker & Co., Ltd. and Public Relations Directorate, U. S. A. Army."]

ফেরার পথে গ্রেপ্তার করে ভিনদেশের নির্বাসিত জীবন যাপনে বাধ্য করেছিল তাও ভবিষ্যতের ইতিহাসে বিষাক্ত ছায়া ফেলবে।

বর্মার গেরিলা বাহিনীকে ইংরেজ সামরিক শক্তি বিশ্বাস করেনি' প্রথম দিকে। কিন্তু বর্মার গেরিলা বাহিনীই দেশের মানুষ ও দেশের সম্পত্তিকে জাপানীদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও। অবশ্য পরে বৃটিশ সামরিক কর্তারা নিজেদের ভ্রান্তি বুঝে তাদের সাহায্য করেছিল। তারই ফলে বর্মা দখল অত সহজ ও দ্রুত হয়েছে মিত্রশক্তির পক্ষে। জাপানীরা তাদের প্রতিশ্রুতি রাখেনি ; বৃটিশও বর্মা দখল করেছে তাকে স্বায়ত্ব শাসন দেবার জন্য নয়, পুনর্গঠিত ও ধাপে ধাপে দায়িত্বশীল করে তোলবার ধাপ্পাবাজীতে আরো অনেকদিন শাসন যন্ত্র সচল রাখবার জন্যই। সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি সব দেশেই সমান।

যুদ্ধের ফলে বর্মার অর্থনৈতিক কাঠামো নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে আভ্যন্তরীন যানবাহনের ক্ষতিই হয়েছে চরম। ভারতবর্ষের নিকটতম শত্রু এলাকা হিসেবে বিমান হানা সহ্য করেছে বর্মাই সব থেকে অধিক। তার ফলে যানবাহন রেল, সেতু এবং শিল্প এলাকা বিধ্বস্ত হয়ে বর্মা ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে। এর ফলে এশিয়ার ধানের গোলা বর্মায় নানা এলাকায় ধানের অনটন হয়েছিল।

জাপানীরা বর্মায় তুলার চাষে উৎসাহ দিয়েছিল। শান্তির সময় বর্মার উৎপাদন বর্মার প্রয়োজনের মাত্র অর্ধেক ছিল। কিন্তু বর্মা তুলা উৎপাদন করে সফল হতে পারেনি তার প্রমাণ, আজকের দিনে বর্মায় বস্ত্র দুর্ভিক্ষই কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, মালয় দেশেও সেই একই প্রশ্ন আতংক সৃষ্টি করছে।

বর্মায় বৈদেশিক লগ্নী অর্থের পরিমাণ ছিল যুদ্ধের আগে প্রায় ১৫ কোটী পাউণ্ড। বৈদেশিক লগ্নী, ভারতীয় চেট্টিয়ারদের পাওনা এবং ভারত গবর্ণমেন্টের পাওনা ও বর্মা রেলওয়ে নির্মাণ বাবদ অর্থ নিয়েই এই পরিমাণ।

বর্মায় বৈদেশিক লগ্নী খাটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রপ্তানী কারবারের জন্য। চাল, পেট্রোল, খনিজ পদার্থ এবং কাঠ রপ্তানীতে বিদেশীদের অধিকার একচেটিয়া। এই কারণে বর্মায় বর্মীরা ব্যবসা ক্ষেত্রে কোণঠাসা জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং বর্মার রাজনীতি সেই কারণেই বৈদেশিক পুঁজিবাদী নীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে। বর্মা অয়েল কোম্পানী, ইরাবতী ফ্লোটিলা, মেসার্স ষ্টীল ব্রাদার্স এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশান কোম্পানীগুলিই— বর্মার চাল কাঠ, পেট্রোল, তুলা, সিমেণ্ট, কাপড়ের কল এবং নদী-পথের যানবাহনের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে বসে আছে। আধুনিক কালে এইসব কোম্পানীতে একজন দু'জন বর্মী ডিরেক্টার নেওয়া হচ্ছিল এই উদ্দেশ্যে যে, সম্পূর্ণ বর্মা পরিচালিত ছোট ছোট কোম্পানী যাতে এইসব বিদেশীদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সামর্থ্য লাভ করতে না পারে।

দক্ষিণ ভারতের চেট্টিয়ার সম্প্রদায় বর্মায় ৭৫ কোটী টাকা খাটায়। এর দুই তৃতীয়াংশ খাটে জমির বন্ধকে। ১৯৩৬ সালের হিসেব মত দক্ষিণ বর্মার সুফলা মৃত্তিকার ১ কোটী একরের মধ্যে এইসব ভারতীয়দের হাতেই ২৫ লক্ষ একর জমি। এবং আরো অনেক একর জমি তাদের কাছে বন্ধক। যুদ্ধের বৎসরগুলিতে এইসব চেট্টিয়ারদের প্রতিনিধিরা চাষীদের কাছ থেকে খাজনা ও সুদ আদায় করত। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সময়ে নেতাজীর আহ্বানে তারা তাদের সম্পত্তির মোটা অংশ আজাদ হিন্দ ফৌজের তহবিলে দান করে। যুদ্ধের বৎসরগুলিতে চাষীরা অনেকেই খাজনা দেয়নি'। কিন্তু চেট্টিয়ারদের প্রতিনিধি ১৯৪৪ সালের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি বন্ধকী কাগজ ও অন্যান্য নথিপত্র ভারত সরকারের রক্ষণা-ধীনে পেশ করতে পেরেছিলেন। শোনা যায় যে এই প্রতিনিধি যখন নয়া দিল্লী যান তার কাগজপত্র নিয়ে গিয়েছিল ৩৬ জন বেয়ারা।

ভারতীয় চেট্টিয়ার সম্প্রদায় বর্মায় শোষণ ও উৎপীড়ন চালিয়েছে জঘন্য ভাবে। শতকরা ১৫ থেকে ৩৬ হারে সুদ দিয়ে বর্মার চাষী

হয় জমিহীন হয়ে পড়ে দুঃস্থ জীবনে বাধ্য হয়েছে আর নয়ত উচ্চ সুদের হার কাঁধে নিয়ে সে তার চাষের জন্তুর চেয়ে অসহায় জীবন যাপন করছে। এইসব চেট্টিয়াররা গত চার বৎসর সুদ ও খাজনা পাননি'—এখন তারা তা' দাবী করছেন। ভারতীয় বাণিজ্য সংসদগুলি তাদের দাবী সমর্থন করে ভারত সরকারের কাছে জানিয়েছে। সুতরাং জাপ কবলমুক্ত বর্মী চাষীদের কাছে এই ভারতীয় সুদখোর সম্প্রদায় মৃত্যু দূতের মত গিয়ে দাঁড়াবে। এরা ভিন্ন শ্রমিক আমদানী করার ব্যবসাও ভারতীয়দের হাতে। বর্মী শ্রমিকদের চেয়েও কম মজুরীতে খাটাবার জন্য এরা ভারত থেকে কুলী চালান দিয়ে অজস্র পয়সা লুটে নেয়। এরাও বর্মার জীবনকে দুঃসহ করে তুলবে। জাপানী দখলের সময় বর্মার গৃহপালিত জন্তুর শতকরা ৩০ ভাগ মানুষের উদরসাৎ হওয়ার জন্য বর্মী চাষী আর এক মহৎ সর্বনাশের মধ্যে পড়েছে।

বর্মায় ভারতীয়দের দখলে ছোট ছোট ব্যবসা আছে প্রচুর। বর্মী রেলের তিন-চতুর্থাংশ কর্মীই ভারতীয়। বর্মার বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ৬০ ভাগই ভারতের সংগে।

সুতরাং বর্মার জাতীয় জীবনে ভারতের প্রশ্ন গুরুতর। বর্মার জাতীয়তাবাদী নেতারা বহুদিন ধরেই ভারতীয়দের শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ এবং সে-বিক্ষোভ ১৯৩০-৩১ এবং তারও পরবর্তী কালে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্মায় ১০ লক্ষ ভারতীয়দের মধ্যে ছোট ছোট ব্যবসাদার, কুলী অথবা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় জাপানী আমলে বর্মীদের সংগে সমান দুঃখ পেয়েছে ও নির্যাতন সয়েছে। বর্মী স্বাধীনতা বাহিনীর মতই তারাও নেতাজী গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগে নিজেদের ভাগ্য জড়িত করে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের পথ ধরেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য এবং নেতাজীর বলিষ্ঠ স্বাদেশিকতার জন্যই এইসব প্রবাসী ভারতীয়রা নূতন রাজনৈতিক বোধে জাগ্রত হ'তে পেরেছিল।

বর্মার জাতীয়তাবাদী ভংগী এইসব মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক ভারতীয়

ভাইদের বিরুদ্ধে কোনদিনই শত্রুতা পোষণ করবে না এ সত্য, কিন্তু সুদখোর ভারতীয় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ অযৌক্তিক নয়।

বৃটিশ সরকারের প্রতি তাদের যে জেহাদ, এইসব ভারতীয় পুঁজি-বাদের বিরুদ্ধেও সেই জেহাদ তারা ঘোষণা করবে। বর্মা ও ভারতকে আগামী দিনের ইতিহাস রচনা করতে হবে পাশাপাশি থেকে। ভারত ও বর্মা কাঁচামালের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

বর্মার চাল ভারতের না-মেটা ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করে। বর্মার সমৃদ্ধি ভারতের সহযোগীতা প্রত্যাশী। বর্মার গ্রামীন অর্থনীতি ও শিল্পপ্রসারকে উন্নততর মানে পৌঁছাতে হলে ভারতের অর্থ ও সামর্থ তার প্রয়োজন হবেই। স্বাধীন ভারত ও বর্মা পারস্পরিক মৈত্রীর উপর নির্ভর করলেই তবে দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারবে। সেই হিসেবে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে এই ধরণের নিকৃষ্ট ব্যবসা চালানো আর যুক্তি সংগত নয়। অন্ততঃপক্ষে জাপানী দখলের বৎসরগুলিতে রিক্ত হয়ে যাওয়া বর্মী চাষীকে আবার করভারে পীড়ন করা মানবতার বিরোধীই হবে ভারতীয় পুঁজিবাদীদের। নিজেদের স্বার্থের দিকে চেয়ে এবং ভারতের জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এইসব পুঁজিবাদীদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে নিতেই হবে।

বর্মা সম্বন্ধে বৃটিশের সদিচ্ছা স্পষ্ট নয়। যথাশীঘ্র সম্ভব স্বায়ত্ত-শাসন দান ও পূর্ণ সংস্থাপনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঘোষণা করে বৃটিশ সরকার যেভাবে বর্মায় শাসনক্ষমতা চিরস্থায়ী করবার ফন্দী করেছে তার বিরুদ্ধে দেশের জনমত প্রকাশ্য আপত্তি জানিয়েছে।

ইতিমধ্যে বর্মা গভর্ণর সমরকর্তাদের হাত থেকে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। ৩৪ জন সদস্য নিয়ে একটি মন্ত্রণা পরিষদও গঠিত হয়েছে। এই মন্ত্রণা পরিষদে সহযোগীতায় বিশ্বাসী নরমপন্থী নেতারা ভিন্ন ৩ জন ইংরেজ, ৩ জন ভারতীয় ও ৩ জন চীনা প্রতিনিধি আছেন। ফ্যাসী বিরোধী লীগের পক্ষ থেকে ৪ জন

প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাম পন্থীদের একমাত্র দাবী আশু পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা।

উ স' বর্মায় ফিরে এসেছেন। তিনিও বৃটিশের সংগে সহ-যোগীতায় প্রত্যাশী। কিন্তু পূর্ণদখলের পর এতগুলি মাস কেটে গেলেও বৃটিশের দিক থেকে কোন প্রতিশ্রুতি বা সদিচ্ছার নিদর্শন না পেয়ে তাঁর মত মানুষও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই এপ্রিল ১৯৪৬ সালে তিনি নিজের সেই গভীর অসন্তোষকেই প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'চার বৎসর নির্বাসনের পর আমি যখন বর্মায় ফিরলাম তখন দেখলাম যে আমার মিওচিট পার্টির ৩ জন সদস্য বর্মা সরকারের সহযোগীতা করছেন। আমি বর্মা গভর্ণরের কাছে নানা ভাবে সহযোগীতার হস্ত প্রসারিত করেছি এবং বর্মা সচিবের কাছে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু আমার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার অবধি করা হয়নি। এখানে বিশেষ করে ফ্যাসী বিরোধী গণ স্বাধীনতা দলের সমন্বয় সম্পর্কে আমি গভীর ভাবে চিন্তা করছি'।

প্রতিশ্রুতিদানে তৎপর এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অনিচ্ছুক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির উপর অধিকদিন প্রত্যয় রাখা কোন মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। তাই আজ বর্মায় সর্বদল এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যগ্র হয়েছে।

ভারতের প্রশ্ন ও বর্মার প্রশ্ন একসূত্রে গাঁথা। সুতরাং ভারত-বর্মার ক্ষুব্ধ জনমত নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যদি ছিনিমিনি খেলতে চায়, তার অনিবার্য শাস্তিও সে পাবে। 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি ইতিমধ্যেই ফসিল হয়ে গিয়েছে। জাগ্রত জনমত নিজের পথ নিজেই নির্মাণ করবে—পূর্ব দিগন্তে সাম্রাজ্যবাদী রাত্রির অবসান আসন্ন!

মালয়

জাপানের আত্মসমর্পণের পর সাংবাদিকরা মালয়ে গিয়ে দেখলেন, সেখানে শোচনীয় খাদ্যাভাব। মালয়ের অর্থনৈতিক কাঠামো চূর্ণমান। দেশে বেকার সমস্যা। টিনখনিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রায় নিষ্ক্রিয় হবার যোগাড় হয়েছে। স্থানীয় সুলতানদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও রবার আবাদ এলাকাগুলি বনবাদাড়ে ভরে উঠেছে। জাপানীরা দক্ষিণ সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিল বটে কিন্তু মালয়ের বাণিজ্য বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। তার ফলে কাজের অভাবে শ্রমিক ও চাষীদের একটা বিরাট অংশ অনুপায়ে মৃত্যুপথ-যাত্রী হয়েছে।

মালয় সিংগাপুরের পঞ্চান্ন লক্ষ মানুষের জন্য অনশন এবং জঘন্য জাতিবিদ্বেষ নৃশংস অপমৃত্যুর ওৎ পেতে বসে আছে।

মালয় সিংগাপুর থেকে বৃটিশের পলায়ন সেখানকার মানুষ দেখেছে। বৃটিশের শোষণশক্তির আমলে তারা অসন্তুষ্ট ছিল—জাপানী জংগীবাদের অভিজ্ঞতায় তাদের মধ্যে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাংখা দুর্দম হয়ে উঠেছে। শক্তির দ্বারা সিংগাপুর ও মালয় পুনর্দখল করতে মালয়বাসীরা সেদিন দেখেনি বৃটিশ আমেরিকাকে। এই পুরাতন প্রভুর দাম্ভিক শক্তিমত্তায় তারা বিশ্বাস হারিয়েছে।

মালয়ের চীনা এবং মালয়ীরা পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বীতায় হানাহানি করতে চায়। তা ছাড়া চীনাদের মধ্যে কুয়োমিনটাং এবং সাম্যবাদীদের হানাহানি আরো গুরুতর আকার ধারণ করেছে। তার উপর সাম্রাজ্যবাদীর ভক্ত চীয়াং কাইশেক ঘোষণা করেছেন যে, এশিয়ার যে সব এলাকায় চীনারা প্রধান সেখানে চীনাদের ভূমি অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যতার অধিকার দিতে হবে। মালয়ের চীনা অধিবাসীরা চীনা-মালয় সৃষ্টির দাবীতে আমেরিকানদের মুখ চেয়ে আছে। অথচ মালয়ীরা তাদের দেশকে বিভক্ত করতে দেবে না জীবন থাকতে।

বৃটিশের নির্বুদ্ধিতায় মালয়ীরা আজ জঘন্য অপমৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। মালয়ের মধ্যে যত বিভেদই থাকুক না কেন সেখানে গণদেবতা আজ জেগে উঠেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে তিনি তার রুদ্রশক্তি প্রয়োগ করবেনই। বৃটিশ মালয় ত্যাগ করুক এ দাবীতে মালয়ের কোন দলই ভিন্ন মত নয়।

বৃটিশের কু-অভিসন্ধি ও নূতন ধাপ্পাবাজীতে পরাধীন মালয়ের জাতীয় চেতনা আর বুদ্ধিভ্রান্ত হবে না। স্বাধীনতার সংকল্পে সে হীন সাম্রাজ্যবাদের চরম মৃত্যুকেই দ্রুততর করে আনবে অতি নিকট ভবিষ্যতেই।

মালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তার রাষ্ট্রগঠনের পরিচয় নিলে আলোচনার সুবিধা হবে।

বৃটিশ ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতবর্ষে ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত তখন ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রীতিমত কর্তৃত্ব নিয়ে বসেছে। ইচ্ছা থাকলেও ইংরেজের পক্ষে ডাচদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা সুবিধা হয়ে ওঠেনি, যদিও বৃটিশের শ্যেনদৃষ্টি এই রত্নদ্বীপটির উপর থেকে সরেনি। নেপোলিয়ানের বিজয় অভিযানের পথে হলাণ্ড যখন দলিত হোল, এশিয়ায় ডাচ কলোনী বাঁচাবার দায়িত্ব এসে পড়ল বৃটেনের উপর। বৃটিশ প্রতিনিধি র‍্যাফেলস ইন্দোনেশিয়ায় গভর্ণর হয়ে বসলেন। র‍্যাফেলসের চার বৎসর কর্তৃত্বে

ইন্দোনেশিয়ার যেটুকু এলাকা তখনও ডাচ শাসন না মেনে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল, সেটুকুও অধিকৃত এলাকায় পরিণত হোল। চার বৎসর পর বৃটিশের হাত থেকে ডাচেরা সম্পূর্ণ ইন্দোনেশিয়ার দায়িত্ব নিল। এর জন্য অবশ্য একটা ধন্যবাদ পেয়েছিলেন বৃটিশ গভর্ণর।

ইন্দোনেশিয়ায় মুখ শুকিয়ে ফিরে এসে র‍্যাফেলস স্থির করলেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তারও ঘাঁটি থাকা প্রয়োজন। ১৮১৯ সালে মালয় উপদ্বীপের শীর্ষবিন্দুতে ছোট একটি দ্বীপ তিনি কিনলেন জোহোরের সুলতানের কাছ থেকে। কেদা'র সুলতানের কাছে পেনাং কিনেছিলেন ফ্রান্সিস লাইট ১৭৮৬ সালেই। চারিপাশে গভীর জল সুতরাং ভারী ভারী জাহাজ চলাচল ও অবস্থানের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক ভেবে এবং দ্বীপটীর ভৌগলিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে র‍্যাফেলস বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এবং বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনিচ্ছাসত্বেও ঐ দ্বীপটির উন্নয়নের দিকে মন দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে র‍্যাফলসের বিচক্ষণতা প্রমাণিত হোল। ১৮২৪ সালের চুক্তি অনুসারে সুমাত্রায় একটা বাণিজ্যিক ঘাঁটির বিনিময়ে বৃটিশ মালাক্কা হস্তগত করল ডাচদের কাছ থেকে।

সিংগাপুর এবং মালাক্কার পর বৃটিশ উত্তরমুখী অভিযান চালিয়ে পেনাং পড়শী দ্বীপগুলি অধিকার করে বসল। মালয় উপদ্বীপের এই অধিকৃত অঞ্চলকেই বলা হয় ষ্ট্রেটস সেটেলমেণ্ট।

এই সময় অবশিষ্ট মালয়ে অনেকগুলি সুলতান তাদের ছোট ছোট রাজ্য শাসন করতেন। নিকটবর্তী এলাকায় বৃটিশ নিজেদের ঘাঁটি দৃঢ় করে নির্মাণ করছে দেখে তারা সচেতন হলেন বটে, কিন্তু শক্তিশালী এবং কৌশলী শত্রুর কবল থেকে তারা নিস্তার পেলেন না।

এই সময় মালয়ের উপসাগরে জলদস্যুদের রাহাজানি চরমে উঠেছিল। কোন কোন সুলতান এইসব দস্যুদের নিরাপদ আশ্রয় দিচ্ছেন এই অজুহাতে বৃটিশ তাদের উপর হুমকী দিতে সুরু করল।

মালয়ের টিনখনিগুলিতে এর পূর্ব থেকে চীনারা একাধিপত্য চালিয়ে আসছিল। চীনা শ্রমিকদের সংগে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংঘর্ষ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে টিনখনি নিয়ে পেরাক রাজ্যে চীনাদের সংগে যে যুদ্ধ বাধল তার ফলে খনিগুলির গুরুতর ক্ষতি হওয়া সুরু হোল। সুতরাং মমতাময় বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপও হলো অনিবার্য।

অস্ত্রের জোরে এবং অন্যান্য কূট কৌশলে একের পর এক সুলতান ইংরেজের সংগে চুক্তি করতে বাধ্য হোলেন। ভারতবর্ষে যে চাল দিয়ে ইংরেজ রাজ্যপাট বসিয়েছে সেই একই চালে মালয়ের দুর্বল সুলতানেরা আপোষে বাধ্য হলেন। প্রত্যেক রাজ্যে বৃটিশ পরামর্শ দাতা বসল। দেশের গুরুতর সমস্যায় এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বৃটিশ পরামর্শদাতার মতই যখন চূড়ান্ত তখন রাষ্ট্রের ক্ষমতাও ইংরেজের। এই ভাবে অন্যায় কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে ইংরেজ সেইসব সুলতানদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে। স্থানীয় চালু ধর্মমত অথবা প্রথায় ইংরেজ হাত দেবে না তারও অংগীকার দেওয়া হোল। বৃটিশের কলোনী বাড়তে লাগল।

১৮৯৬ সালের মধ্যে কুয়ালা লামপুরে রাজধানী হোল যুক্ত মালয় রাষ্ট্রের। এর মধ্যে পেরাক, সেলাংগার, নেগ্রি, সেজিলান এবং পাহাং রাজ্য। এই কটি রাজ্যের ভূভাগই সমগ্র মালয়ের অর্ধেকের বেশী। প্রতিটি রাষ্ট্রেই স্থানীয় রাজা, বৃটিশ রেসিডেন্ট এবং পরিষদ রইল। এই সব রাষ্ট্রিক প্রতিনিধিরা সময় সময় সমবেত হতেন সমগ্র ষ্ট্রেটস সেটেলমেন্টের গভর্ণরের সভাপতিত্বের সভায়। সব কটি রাষ্ট্রের উপর একজন রেসিডেন্ট জেনারেল থাকতেন—তিনি সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ। সব থেকে মজার ব্যাপার হোল নাগরিকত্বের অধিকার নিয়ে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের রাষ্ট্রের প্রজা হোল—সর্বমালয়ী অধিকার পেলে না কেউ। কেবলমাত্র বৃটিশ রাজদণ্ডের সার্বভৌম অধিকার যেখানে সেখানকার বাসিন্দারাই বৃটিশ প্রজা হোল। এর ফলে রাষ্ট্রগুলির আপাতঃ স্বাতন্ত্র্য বজায় রইল বটে কিন্তু

বৃটিশরাজ সেইসব রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের একমুখী আনুগত্য পেলেন না।

সুলতানরা শুধু ভড়ং নিয়েই বেঁচে রইলেন। আসলে ক্ষমতার দিক দিয়ে তাদের বৃহন্নলা হয়ে থাকতে হোল। এইসব ক্ষমতাহীন ঠুঁটো জগন্নাথদের প্রজারা কিন্তু রাজসিংহাসনের প্রতিই অনুগত হয়ে রইল—বৃটিশ কর্তৃত্ব মেনেও বৃটিশ মুকুটের দিকে চেয়ে দেখলে না। বৃটিশের তৈরী পাথরের ঘরের এই ছিদ্র পথ দিয়েই প্রবেশ করে জাপান মালয়ে বৃটিশকে অমন কঠিন শাস্তি দিতে পেরেছিল।

এই ভাবেই মালয় শাসন চলে এসেছে। সাম্প্রতিক যুগে কিছু কিছু ক্ষমতা ফিরে পেয়েছিল এক একটি রাষ্ট্র। কিন্তু সে কিছুই নয়।

বহুকাল ধরেই মালয় উপদ্বীপে শ্যামের অধিকৃত এলাকার উপর বৃটিশের নজর ছিল। সুতরাং ছলেরও অভাব হোল না। ১৯০৯ সালে সেই সব এলাকাতেও বৃটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোল। রাষ্ট্রগুলি আশ্রিত রাজ্য হয়ে রইল। এই রাষ্ট্রগুলিই মালয়ের অযুক্ত রাষ্ট্র মণ্ডলী।

সিংগাপুর ও পেনাংয়ের বিখ্যাত বন্দর সহর দুটি ধরে সমগ্র মালয় উপদ্বীপ চারিটি ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগে ষ্ট্রেটস সেটেলমেন্ট। সিংগাপুর, পেনাং, ওয়েলেসলি, ডিনডিং রাষ্ট্র এবং মালাক্কা এই নিয়ে গড়ে উঠেছে বৃটিশ কলোনী।

দ্বিতীয় ভাগে সম্মিলিত রাষ্ট্র মণ্ডল। তার মধ্যে সুলতান শাসিত পেরাক, পাহাং, সেলেংগাব এবং নেগ্রি সেম্বিলোন নামে অখ্যাত আরো নটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র।

তৃতীয় ভাগের অযুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পোর্লায়, কেদা, কোলানটান এবং ট্রেংগানু। এ ভিন্ন বৃটিশ প্রভাবযুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র জোহোর।

এইসব এলাকার মালয়ী বাসিন্দারা অত্যন্ত অল্পে সুখী। তাদের ধান জমি, তাদের সামান্য রবার চাষ এবং কিছু নারিকেল গাছ

নিয়েই তারা সুখে দিন যাপন করে। বিদেশাগত চীনা ভারতীয় শ্রমিক ও ধনিক এবং য়ুরোপীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও ব্যস্ততাকে তারা গুরুত্ব দিতে চায়নি।

বৃটিশ কর্তৃত্ব এ দেশে আবাদী জমির পরিমাণ বাড়িয়েছে। মালয়ের তীরভূমি ঘেঁসে রবার, মসলা এবং নারিকেলের ফলন এবং উৎপাদন বাড়ানোর ফলে হাজার হাজার একর পতিত জমি শ্রীমন্ত হয়ে উঠেছে। দেশের সমৃদ্ধি বেড়েছে। কিন্তু দেশের সমৃদ্ধি বলতে যদি অধিবাসীদের সমৃদ্ধি হয় তবে তাতে কোন ইতর বিশেষ হয়নি।

কেননা মালয়ীরা এইসব আবাদে খাটতে চায়নি। বৃটিশ সরকার এইসব অনিচ্ছুক অজ্ঞ মালয়বাসীদের নিজেদের কল্যাণের কথা বুঝিয়ে না দিয়ে চীন ও ভারত থেকে শ্রমিক আমদানী করেছে মালয়ে। এই আমদানীর ফলে আজ সিংগাপুর ও অন্যান্য সহরের চীনা বাসিন্দার সংখ্যা শতকরা পঁচাত্তর। সমগ্র মালয়ের জন সংখ্যার শতকরা চল্লিশ ভাগ চীনা। য়ুরোপীয় স্বার্থ বাদ দিলে চীনারাই এখানকার অর্থনীতিতে ও রাজনীতিতে প্রধান হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতির দাক্ষিণ্য মালয়ে কৃপণ নয়। মালয়ের টিন পৃথিবীর শতকরা চল্লিশ ভাগেরও বেশী। রবার শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও অধিক। অথচ মালয়ের দুই তৃতীয়াংশ আজো অনুন্নতই রয়ে গেছে।

মালয়ের বহির্বাণিজ্যের অন্যতম খরিদ্দার হোল যুক্তরাজ্য। ১৯৩৮ সালে মালয়ের শতকরা ৪০·৭ ভাগ রবার এবং ৫৫ ভাগ টিন আমেরিকা নিয়েছিল। গ্রেট বৃটেন নিয়েছে শতকরা ১৮·৭ এবং ৬·৮ ভাগ। এরা ছাড়াও ইতালী, হল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইন্দোনেশিয়াও মালয়ের খরিদ্দার। ১৯৩৮ সালে মালয়ের বাণিজ্যিক পরিমাণ ছিল একশ' সাড়ে একুশ মিলিয়ন পাউণ্ড। এই পরিমাণ সারা ভারতের বাণিজ্যিক পরিমাণের অর্ধেক।

খনিজ টিনকে ধাতুতে রূপান্তরিত করার কারখানা ছাড়া মালয়ে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান আর নেই। অবশ্য টিনে ভর্তি করা ফল,

রবারের জুতা, টায়ার এবং খেলনা প্রস্তুতের কারখানা সেখানে চলে। বলাবাহুল্য এইসব ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কর্তৃত্বই চীনাদের।

মালয়ে রবার চাষ এবং তার কাহিনীও রোমাঞ্চকর।

বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এই উপদ্বীপটি দখল করে ভেবেছিলেন যে ইন্দোনেশিয়ায় কর্তৃত্ব হারাণোর দুঃখ তার ঘুচবে এখানে। মসলা, লবঙ্গ প্রভৃতি এই উপদ্বীপে ফলিয়ে নিয়ে সে ডাচদের কাছে নির্ভরশীলতা বাতিল করতে পারবে। কিন্তু বৃটিশের সে চেষ্টা মালয়ের জমি ব্যাহত করে দিল। সর্বপ্রকারের কুশলতা সত্বেও এখানকার মাটীতে মসলার চাষ সফল হোল না। ১৮৭৭ সালে সিংগাপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্যে রবারের চারা এল কিউ থেকে। এই ছোট চারাটিই মালয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা বহন করে নিয়ে এল।

মালয়ে রবার চাষের সাফল্যের এক সময়েই মোটর শিল্পের প্রসার সুরু হোল য়ুরোপে। ১৯০৯ সালে মালয়ী রবারের শীর্ষবছর এল। এই নূতন আবাদের অভাবিত সাফল্যের ফলে মালয়ীরা ধান জমিতে অবাধ রবার চাষ সুরু করল অথচ ১৮৯৭ সালে রবার চাষ হোত ৩৪৫ একর জমিতে। এই আবাদী এলাকার মধ্যে ২০ লক্ষ একর কোম্পানী অধিকারে আর বাকী জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই ২০ লক্ষ একর জমির মালিকানা শতকরা ৭৫ ভাগ বৃটিশ, ফরাসী, বেলজিয়ান এবং ড্যানিশ কোম্পানীদের। মাত্র ১৬ ভাগ চীনাদের অধিকারে এবং ৪ ভাগে ভারতীয় কর্তৃত্ব। আর বাকী ৫ ভাগ অন্যান্য এশিয়াবাসীর। জমিতে এশিয়াবাসীদের নিয়ন্ত্রণ সমগ্র মালয়ের রবার চাষের শতকরা ৪০ ভাগ। ১৯৩৭ সালে এই আবাদ ও সংশ্লিষ্ট শিল্প থেকে জীবিকা অর্জন করত সাড়ে তিন লক্ষ এশিয়াবাসী শ্রমিক। নানা সময়ে নানা কারণে মূল্য হ্রাস বৃদ্ধির সংগে মালয়ের অর্থনীতি উঠেছে পড়েছে। কিন্তু সম্প্রতি, কৃত্রিম রবার প্রস্তুতের ফলে মালয়ী রবারের একচেটিয়া বাজার ক্ষুণ্ণ হতে বসেছে। এর

ফলে কেবল যে পুঁজিবাদীদের ক্ষতি হ'বে তা নয়—বহু লক্ষ শ্রমিকের ঘোরতর দুর্দশার দিন আসবে।

রবার ছাড়া অয়েল পামেতেও (Oil Palm) ১৯৩৭ সালে মালয়ের ৭০ হাজার একর জমি চাষ হোত। মালয় সুমাত্রার ফসল সারা পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৩০ ভাগ মিটিয়েছিল ১৯১২ সালে। অধুনা এই ফসলটির দাম মাতালের মত চলছে।

এ ভিন্ন চাল ও নারিকেলের চাষও হয় মালয়ে কিন্তু মালয়ী চাষী বছরে একটির বেশী ফসল করে না আজো। মালয়ের খাদ্য প্রয়োজনের দুই তৃতীয়াংশই আমদানী করতে হয় একথা আগেই বলা হয়েছে। মালয়ের কৃষিকে উন্নত করবার কোন চেষ্টাই করেনি ইংরেজ।

মালয়ের টিনখনির কথা বহুকাল ধরেই পরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন লিখেছিলেন যে এক পেরাক যত টিন উৎপন্ন করে বৃহত্তর ভারতের আর কোন অংশই তত করে না। তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অবধি এ উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ২৫০ টন মাত্র। লারুটে টিন খনি আবিষ্কারের সংগে সংগে পেরাকের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বৃটিশ। তখন থেকেই ধীরে ধীরে বৃটিশ মালয়ের টিনখনিতে চীনাদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বীতা সুরু করে।

আন্তর্জাতিক চাহিদা হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে মালয়ের এই খনিজ সম্পদটির মূল্যও কমতে বাড়তে থাকে। এইভাবে কিছুদিন চলবার পর বাফার চুক্তির দ্বারা আন্তর্জাতিক টিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত সুরু হয়। কিন্তু মালয় এ চুক্তিতে লাভবান হয়নি। মালয় বৎসরে উৎপাদন করতে পারে এক লক্ষ টন। কিন্তু ১৯৩৭ সালের নূতন চুক্তির ফলে মালয়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে প্রায় ৭২ হাজার টন। এর ফলে মালয়ের জাতীয় আয় মার খেয়েছে।

মালয়ের খনিজ টিন শোধণের কারখানাগুলি প্রায় সবই ষ্ট্রেটস সেটেলমেণ্টে। এখানকার কারখানাগুলিতে মালয়ের টিন ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, বর্মা, ইন্দোচীন, জাপান এবং অষ্ট্রেলিয়া,

আফ্রিকারও খনিজ টিন পরিশুদ্ধ করা হয়। এই শোধণ কারখানাগুলিই মালয়ের যান্ত্রিক শিল্পের একমাত্র বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান।

সম্প্রতি জোহোর, কেলেন্টান ও ট্রেংগানু এলাকায় জাপানীরা লৌহখনি আবিষ্কার করেছে। সে খনিগুলির কর্তৃত্ব জাপানীদের এবং সমস্ত উৎপাদনই জাপান নিজের দেশে রপ্তানী করে। ১৯৩৯ সালে এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ টন।

এ ভিন্ন কয়লা, সোনা, টাংষ্টেনও মালয়ের খনিজ সম্পদের অন্যতম। আরো আধুনিককালে জোহোরে জাপানীরা অ্যালুমিনিয়ম খনিজ বকসাইট আবিষ্কার করেছে। ১৯৩৯ সালে এর পরিমাণ পৌঁছেছিল ৮৪ হাজার টনে।

রবার এবং খনিজ সম্পদেই মালয়ের জাতীয় আয়। কিন্তু তার সবই প্রায় বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণে। মালয়ীদের হাতে যা' আছে তার শতকরা হার নিম্নতম। মালয়ের অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণও তাই। আন্তর্জাতিক চাহিদার উপর মালয়ের অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্ভর করে।

মালয়ের জন সংখ্যা প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ।

মালয় উপদ্বীপের উত্তর-দক্ষিণে ঘন অরণ্যসংকুল পর্বতশ্রেণী। তীরভূমি ঘেঁসে *এবং নদীগুলির দু'পাশে গ্রীষ্মমণ্ডলের বিশিষ্ট অরণ্যভাগ। এইসব পর্বত ও অরণ্যে বাস করে মালয়ের প্রাচীন বামণ ও সাকাই জাতি। অন্য সব এলাকায় মালয়ীরা তাদের পুরাণো জীর্ণ জীবনযাত্রা চালিয়ে যায়। কিন্তু খনি ও আবাদী এলাকায় ভিড় করে য়ুরোপীয়ানরা, চীনারা এবং ভারতীয়েরা। বিদেশের সমৃদ্ধি ঘরে তোলবার জন্য যারা অপরের দেশে হানাহানি করে তারা।

শিক্ষার দিক থেকে বৃটিশ মালয়ীদের কিছু দিতে পারেনি। স্কুলগুলি ভরে রাখে বৃটিশ-মালয় অথবা অন্যান্য সংকর শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা। ভারতীয় ও চীনারাও এখানে শিক্ষার সকল সুবিধা নেয়। আজ অবধি কোন মালয়ী আন্তর্জাতিক সম্মানের অধিকারী হ'তে পারেনি। তাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই দেশের

বাইরে যাবার সুবিধা পেয়েছে। সাংস্কৃতিক কোন নূতন জোয়ারও আসেনি মালয়ীদের মনে। তেমনি য়ুরোপীয়, চীনা অথবা ভারতীয় সভ্যতাও তাদের মনে কোন আসন পায়নি'। বৃটিশ শাসনে মালয়ীদের অস্তিত্বকে ধীরে ধীরে নিশ্চিত সর্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মালয়ের বেশীর ভাগ কর্মচারীই ব্রিটিশ—অবশ্য কিছু কিছু ইউরেশিয়ানও আছে। গভর্ণমেন্টের অর্ধেক ডাক্তারই চীনা, ইউ-রেশিয়ান ও ভারতীয়। মালয়ীদেয় সংখ্যা হাতে গোণা যায়। অষ্ট্রেলিয়া থেকে অনেক সার্ভেয়ার এসেছে এখানে। মালয়ের ডেপুটি ফরেষ্ট কনজার্ভেটারের পদে বহুকাল আমেরিকার বিশেষজ্ঞ বহাল ছিলেন। ১৯৩৮ সালের হিসেবে দেখা যায় ইংরেজী স্কুলগুলিতে য়ুরোপীয়ান ছাত্রের সংখ্যা ২৩২, আমেরিকানদের সংখ্যা ৩৫, ইউরেশিয়ানদের ৩৩০ আর অন্যান্য এশিয়াবাসীর সংখ্যা ৯৪৮। আর দেশীয় বিদ্যায়তনে চীনাদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার অথচ মালয়ীদের সংখ্যা তিন হাজারের বেশী হ'বে না। অর্থাৎ সবদিক থেকে মালয় অতি পিছিয়ে পড়া দেশ।

দেশের অর্থনীতির সংগে যোগসূত্র হারিয়ে ক্রমশঃই মালয়ীরা পিছু হটে আসছে। তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠতে পারেনি। সাধারণ মালয়ী দরিদ্র চাষা অথবা জেলে। মালয়ের সামন্ততান্ত্রিক সুলতানেরা বৃটিশের সাজান' পুতুল। য়ুরোপীয় কায়েমী স্বার্থ তাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত বসে আছে। ছোট রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তারা সর্বমালয়ী অধিকারে মাথা তুলতে পারছে না। বৃটিশ শাসনের মমতায় তারা নেমে যাওয়ার সিঁড়ি দেখেছে কিন্তু মাথা তোলবার শিক্ষা পায়নি।

চীনারা মালয়ের অর্থনীতিতে প্রধান। তারা শিক্ষায় অগ্রসর। মাতৃভূমি মহাচীনের দিকে তাকিয়ে তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সংহতি প্রবলতর হয়ে উঠেছে। অধিকন্তু চীনা মূলধন এখানে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। সে

হিসেবেও তাদের স্বার্থ বুঝে চলতে হয়। সুতরাং মালয়ের জাতীয় জাগরণে চীনারাই প্রধান অংশ গ্রহণ করবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে ?

মালয়ের রাজনৈতিক পটভূমিকা বিস্তৃত করবার পূর্বে আর দুটি রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ দুটি মালয়ে না হলেও মালয় ও সিংগাপুরের ভবিষ্যতের সংগে এদের নিবিড়তর সংযোগ আছে।

বৃটিশ উত্তর বোর্ণিওতে শাসন চালায় একটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোম্পানী। তা ছাড়া বোর্ণিওতে আর একটি বিচিত্র আশ্রিত রাজ্য আছে। তার নাম সারবাক। এখানে রাজত্ব করে আসছেন বংশপরম্পরায় একটি ইংরেজ পরিবার। ১৮৪০ সালে জেমস ব্রুক নামে একজন দুঃসাহসিক ইংরেজ ব্রুণেই সুলতানকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। সুলতান খুসী হয়ে সারবাক জেলাটি তাকে উপহার দেন। বংশ পরম্পরায় তাঁরই পরিবার এই দেশ শাসন করে। তাঁর উপাধি রাজা।

সারবাক এবং বৃটিশ উত্তর বোর্ণিওর ছবি মালয় সিংগাপুরের থেকে তফাৎ নয়। এখানেও তীরভূমিতে চীনা, ভারতীয় ও য়ুরোপীয়েরা আবাদ অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। বোর্ণিওর যাযাবর অধিবাসীরা বনের গহনে তাদের প্রাচীন জীবনযাত্রার ধারা বজায় রেখেছে। বাইরের সংগে তাদের সংস্পর্শ কম।

মালয়ের রাজনৈতিক সমস্যার চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন হচ্ছে মালয়ের চীনা-মালয় জন সংখ্যা নিয়ে। প্রাকযুদ্ধকালে দেশের যা' কিছু আন্দোলন হয়েছে তা' এই জাতিবিদ্বেষকে কেন্দ্র করেই। জাপানী অধিকারের পর সে সমস্যা আজ আরো জটিল হয়েছে।

মালয়ীরা জনসংখ্যার শতকরা মাত্র চুয়াল্লিশ ভাগ। তা ভিন্ন নিজের দেশের মালিকানা রাখার বলিষ্ঠতা তাদের কম নানা কারণেই। বৃটিশ শাসনের অব্যবস্থায় মালয় ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন। প্রতি রাষ্ট্রের প্রজার নাগরিক অধিকার শুধু সেই রাষ্ট্রেই।

গোটা মালয়ের নাগরিক অধিকার তার নেই। সুতরাং এইসব বিচ্ছিন্ন মালয়বাসীরা মাতৃভূমি মালয়কে নিয়ে এক পার্টি, এক শ্লোগান, এক লড়াই করতে শেখেনি।

অধিকন্তু জাপানীরা চীনাদের নিয়ে এখানে রাজনৈতিক জুয়া খেলে গেছে। একশ বছর আগে মালয়ে চীনাদের সংখ্যা ছিল অত্যল্প। কিন্তু একশ বছরে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে চব্বিশ লক্ষে। অথচ মালয়ীরা মাত্র ২৩ লক্ষ,—ভারতীয়দের সংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষ। এরা ছাড়া বহু য়ুরোপীয় পরিবার মালয়কে তাদের বাস-ভূমি করে নিয়েছেন নানা কারণে। তাদের সংখ্যা একত্রিশ হাজার।

চীনাদের এই সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণ বৃটিশের নির্বুদ্ধিতা। মালয়ের রবার আবাদ এবং টিন খনির উৎপাদন যখন বাড়তে লাগল, এবং নূতন পরিকল্পনা সুরু হোল, মালয়ীরা দলে দলে শ্রমিক ও কৃষক হতে আসেনি। সস্তায় শ্রম কেনবার জন্য বৃটিশ সরকার চীনা এবং দক্ষিণ ভারতীয় শ্রমিক দলে দলে আমদানী করেছে। শুধু তাই নয়, এই সব চীনাদের মালয়ের সম্পূর্ণ নাগরিক অধিকার অর্পণ করেছে বৃটিশ সরকার, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের চীনা নাগরিকত্ব বরবাদ করে দেয়নি। সুতরাং এই চীনারা মালয়ের নাগরিক হয়েও মালয়কে মাতৃভূমি বলে মনে করেনি কোনদিন। নিজেদের দ্বৈত নাগরিকত্বের সুযোগ নিয়ে তারা দল ভারী করেছে এবং ধীরে ধীরে মালয়ের অর্থনৈতিক বলগা কবলিত করেছে।

মালয়ের চীনাদের অধিকাংশই চীনের দক্ষিণ প্রদেশ থেকে এসেছে। দরিদ্র চীনা ও চীনা পরিবার মালয়ে এসে নিজেদের অধ্যবসায়ের জোরে বিত্তশালী হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে মালয়ের জাতীয় জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সব পেশাগুলিই দখল করে নিয়েছে। শ্রমিকানার সবই আজ চীনাদের দখলে।

কেবলমাত্র ষ্ট্রেটস সেটেলমেণ্টেই নয় চীনারা সুলতান শাসিত রাষ্ট্রগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছে। সেই সব রাষ্ট্রের মধ্যবিত্ত জীবনেও

তারা প্রধান হয়ে উঠেছে। মালয়ের দূরতম ক্ষুদ্রতম পল্লীতেও চীনা দোকানদার, চীনা মহাজনের সাক্ষাৎ মিলবে।

আর চীনা বিত্তশালীরা, য়ুরোপীয় ও ইউরেশিয়ানদের সঙ্গে এক সাথে মালয়ের শোষণ চালিয়ে এসেছে।

চীনাদের বিরুদ্ধে সব থেকে বড় অভিযোগ হোল যে মালয়কে তারা তাদের মাতৃভূমি বলে মনে করে না। মালয় থেকে তারা সোনা নিয়ে চীনের কোষাগার পূর্ণ করে আসছে। মালয়ে মালয়ীর নাগরিক অধিকার নেই কিন্তু চীনাদের আছে। মালয়ীরা নিজ বাসভূমে পরবাসীর মত বাস করতে বাধ্য হয়েছে।

আজকের দিনে মালয়ীদের মধ্যেও জাগরণ সুরু হয়েছে বটে কিন্তু চীনারা তাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর। নানা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে চীনারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। চীনের জাতীয় সরকারের নেতৃত্ব চীয়াংয়ের উপর ন্যস্ত হবার পর থেকেই চীননেতা এই সব প্রবাসী চীনাদের অর্থের উপর নির্ভর করেছেন—তাদের ভিতর দিয়ে চীনের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য গঠনের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছেন।

চীনের কুয়োমিনটাংয়ের খরচ বহন করে দক্ষিণ সমুদ্রের সোনা। মালয়ের কুয়োমিনটাংয়ের গুপ্ত পার্টি বহুদিন ধরে রাজনৈতিক কারসাজী চালিয়ে এসেছে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য মালয়ী চীনাদের হাতে মালয়ের রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেওয়ার চক্রান্ত। কিন্তু মালয়ে কুয়োমিনটাংয়ের চরম শত্রু হোল চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি। তারাও সিংগাপুরের কোটীপতিদের অর্থে শক্তিশালী। সুতরাং চীনের গৃহ বিবাদ মালয়েও এসে পড়েছে।

জাপান মালয়ে এসে মালয়বাসীদের কোন রাজনৈতিক সুবিধা বা স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়নি প্রথম দিকে। কেবলমাত্র সামরিক কর্তৃত্বই হাতে নিয়েছিল সে। রাষ্ট্র শাসন ব্যাপারে পুরাণো শাসনতন্ত্রই সে অব্যাহত রাখতে দিয়েছিল।

কেবল সিংগাপুর ও পেনাংয়ের শাসন কর্তৃত্ব জাপান নিজের

হাতেই রেখেছিল। সুলতানরাই নিজেদের রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসনের কর্তা ছিলেন।

জাপানী অধিকারের আগেই ১৯১৮ সালে মালয়ের কমিউনিষ্ট পার্টি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বৃটিশ শাসনের রোষে সে পার্টি ছিল বে-আইনী। ঐ বছর সিংগাপুরে ফ্যাসিস্ত বিরোধী বিরাট সভায় বৃটিশ সৈন্য ও মারণাস্ত্র উৎপীড়নের সাহায্যে সে সংহতিকে চূর্ণ করবার চেষ্টা করে। কমিউনিষ্ট দমনের কৌশলে নানা প্রকার দমন-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল বৃটিশ শক্তি সারা মালয়ে।

জাপান যখন মালয় অধিকার করে তখনও কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী। জাপানীরা জানত মালয়ের উপর তাদের জংগীবাদ শাসন শান্তিতে কাজ করতে পারবে যদি মালয়ের চীনা বাসিন্দাদের তারা দমন করতে পারে। সুতরাং শ্রমিক ও ধনিক দুই প্রকার চীনার উপরই জুলুম চাপালো জাপান। হাজার হাজার চীনাকে পীড়ন করে তারা সন্ত্রাসবাদী শাসন চালাতে লাগল, শ্রমিক ও রবার চাষীদের সংগঠক কর্মীদের অনেককেই ফাঁসীর কাঠে ঝুলিয়ে দিল তারা। বাধ্যতামূলক ঋণ দেবার জন্য জুলুম হোল। সে সব এলাকায় কোন চীনা সন্দেহজনক ও জাপানী বিরোধী কাজ করলে—তার জন্য সমগ্র চীনা বাসিন্দারা দায়ী হবে এমনও হুকুম জারী হোল।

কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদে মালয়ের জনমত ভয় পেল না। তারা দেখেছিল মালয় অধিকার করে কিভাবে জাপান অবাধ লুটতরাজ চালিয়েছে। মেয়েদের উপর কিভাবে নিগ্রহ করে আসছে। জাপানী জংগীবাদ যে বর্বর সভ্যতারই রূপ তা বুঝতে তাদের দেরী হয়নি।

মালয়ে এই সময় গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে। এরা মালয়ের নানা এলাকায় জাপানী ঘাঁটি আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে থাকে। মালয়ে জনবাহিনী দশহাজারের চেয়েও বেশী সংখ্যায় পৌঁছে যায়। ১৯৪৪ সালের মে মাসের পর থেকে বৃটিশরা বিমান মারফৎ কিছু কিছু অস্ত্র এই সব গেরিলা বাহিনীকে সরবরাহ করেছিল।

জাপানী জংগীবাদের নীচে মালয়ের সর্বদল মিলিত হয়ে ওঠে। দেশের জনমত আক্রোশে তীক্ষ্ণতা পায়।

কিছুকাল দমনমূলক কর্তৃত্ব চালাবার পর জাপানীরা মালয়ী ও চীনাদের সংগে বন্ধুত্বের দাবী পেশ করলে। বিশেষ করে চীনাদের প্রীতি অর্জন করাই হোল জাপানী নীতি।

সিংগাপুর ও পেনাংয়ের খাস শাসনের মন্ত্রনা পরিষদে চীনা প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ল মালয়ীদের চেয়েও। আরো পরে সমগ্র মালয়ে ব্যাপকভাবে চীনা ও মালয়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে জাপান দেশের জনমতকে জাপানীদের শুভেচ্ছায় আস্থা স্থাপন করাতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু জাপানীদের এই চীনাতোষন নীতি মালয়ীদের মনে অসন্তোষের আগুনকে বাড়িয়ে দিলে। তারা মনে মনে বুঝলে যে তাদের মাতৃভূমিকে বিদেশীদের হাতে বিকিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে জাপান। বৃটিশের সর্বনাশী নীতিই গ্রহণ করছে জাপান। উত্তর মালয়ের চারটি রাষ্ট্রকে এই সময় জাপান শ্যামের হাতে প্রত্যর্পণ করাতে সে আগুণ লেলিহান হয়ে উঠতে লাগল। মালয়ের জন-বাহিনী দ্রুতগতিতে সজীব হয়ে উঠল এবং এশিয়ার এই শয়তানী শক্তিকে প্রতিরোধ করবার জন্য তারা জীবন পণ করল।

লুঠতরাজ, নারীধর্ষণ এবং চরম অনাচারের যে সব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। জানা গেছে যে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী অবধি তুতিং এলাকাতেই লোক নিহত হয়েছে এক লক্ষ একত্রিশ হাজার। আহতদের সংখ্যা পৌঁছেচে আটত্রিশ হাজারে। নিখোঁজের সংখ্যা একাশি হাজার। নারী ধর্ষণ করেছে জাপানীরা ব্যাপকভাবে। জাতি হিসেবে পাশবিকতায় তারা যে অদ্বিতীয় এক মালয়ের জাপানীরাই তা প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছে। পঁয়ত্রিশ হাজার মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে যার ফলে প্রায় চার হাজার মেয়ে মারা গেছে। ঘরবাড়ী ও শস্যের গোলায় আগুণ লাগিয়ে জাপানীরা মালয়ের প্রতিরোধ শক্তিকে গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু মালয়ীরা এবং চীনারা জাপানীদের কোন প্রতিশ্রুতিকেই বিশ্বাস করেনি। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিশ্রুতি যে ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয় এ বোঝার জন্য বহুদিন ধরেই তারা জীবন দিয়ে আসছে—উৎপীড়ণ মাথা পেতে নিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কঠিন পাথরে মাথা ঠুকে আসছে।

কিন্তু মালয়ীদের চরম ক্ষতি হয়েছে অন্যভাবে। এর পূর্বে মালয়ের জমিতে চাষ করার অধিকার চীনাদের ছিল না। কিন্তু চীনা তোষণনীতি অনুসরণ করতে করতে জাপানীরা সব সীমারেখা ডিঙিয়ে চলে যায়। মালয়ীরা জাতি হিসেবে উচ্ছন্ন গেলেও জাপানীদের ক্ষতি নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য শোষণ। সুতরাং সব আইন বরবাদ করে চীনাদেরও জমি চাষের সুবিধা দিল জাপান। মালয়ে চীনারা চাষী হোল। মালয়ের অর্থনীতিতে চীনাদের যে বজ্রমুষ্টি তাতে আরো শক্তি যোগান দিল জাপান। সে বজ্রমুষ্টি মালয়ীদের শ্বাসনালী টিপে হৃৎপিণ্ডের বাতাস নেওয়া বন্ধ করে দিতে চাইলে। মালয়ে চীনাদের প্রভুত্ব যতটুকু ক্ষুণ্ণ ছিল জাপানীদের চক্রান্তে তা পূর্ণ হোল।

মালয়ে ভারতীয়েরা কোনদিনই মালয়কে মাতৃভূমি বলে জানেনি। তাদের মধ্যে অধিকাংশই রবার এলাকার কুলিমজুর। এ ছাড়া ভারতীয় বণিকশ্রেণীও গড়ে উঠেছে সেখানে। এই বণিক ও শ্রমিক ভারতীয়দের মধ্যে মহাজন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু ভারতীয়ও মালয়ে বাস করে। এইসব ভারতীয়েরা সব সময়েই নিজেদের নিরাপত্তা ও সুবিধা অসুবিধার জন্য ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকে। মালয় জাপান অধিকারে যাবার পর তাদের দিক থেকে কোন সাড়া পায়নি জাপান। সেখানকার ভারতীয়দের নারীপুরুষদের উপর অত্যাচার চালাতে না পারে এর জন্য তারা যথাসাধ্য করেছিল ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের পক্ষে থেকে। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের পর থেকে ভারতের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব প্রবাসী ভারতীয়রাই সশস্ত্র ভাবে চেষ্টা করেছে এশিয়া থেকে য়ুরোপীয় এবং

এশিয়াজাত সাম্রাজ্যবাদকে দূর করবার জন্য। তার কাহিনী আজ যতটুকু জানা গিয়েছে তাইতেই সমগ্র ভারতের মানুষ গর্ববোধ করেছে। এইসব পরদেশী ভারতীয়দের জীবন ও সম্মান এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য তারা সর্বপ্রকার চেষ্টার কসুর করেনি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জ্বলন্ত ব্যক্তিত্ব এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেকটি সেনার বিরামহীন চেষ্টার ফলেই জাপানীদের আমলে কেবল মালয়েই নয় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৩৫ লক্ষ ভারতীয়ের জীবন ও সম্পত্তি নিগ্রহ ও রাহাজানির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

মালয়ের জীবনীশক্তি তার বহির্বাণিজ্য। টিন ও রবার রপ্তানী করে সে বাইরের সোনা ঘরে এনে তুলত। আবার নিজেদের খাদ্য দ্রব্যের শতকরা ৬৪ ভাগের জন্য বাইরে হাত পাতত। জাপানী অধিকারের সংগে সংগে জাপানের অধিকাংশ রপ্তানীর আয় বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের আগে একা জাপান যত রবার নিত মালয়ের কাছ থেকে বাইরের খরিদ্দার হিসেবে, তখন শাসনকর্তা হয়ে এবং দক্ষিণ সমুদ্রে একচেটিয়া অধিকার পেয়ে তার চেয়েও কম মাল সে রপ্তানী করতে পারলে। আন্তর্জাতিক কারণে এবং জাহাজী চলাচলের অসুবিধার জন্যই এই বাণিজ্যিক হার এত নিচে নেমে এল। তারপর আমদানীর অভাবে মালয়ের খাদ্যাভাবও চূড়ান্ত সীমায় এসে পৌছল।

একদিকে কাজের ন্যূনতার জন্য শ্রমিক ও আবাদীদের মধ্যে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অপর দিকে খাদ্যাভাব এই দুই কারণে মালয়ে জাপানীরা অন্তর্বিদ্রোহকে রোধ করতে পারলে না। জাপানী সরকার এই সময় মালয়ের কৃষি জমির পরিমাণ বাড়িয়ে বেকার শ্রমিকদের চাল ও অন্যান্য ফসল ফলনের কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু জাপানের সে চেষ্টা মাত্র আংশিক সফল হয়েছিল।

মালয়ীদের ধর্মমতকে নিজেদের সামরিক শাসনের অনুকূলে আনবার জন্য জাপানীরা মালয়ের ইসলাম ধর্মের রক্ষক সেজে হজযাত্রার পুনঃ প্রতিষ্ঠায়ও আশ্বাস দিতে ভোলেনি।

জাপানের আত্মসমর্পণের পর সাংবাদিকরা গিয়ে প্রথম মালয়কে দেখলেন ক্ষুধার্ত চেহারায়। সেখানে গণদেবতা ভুখা ভগবান। একদিন চরম সর্বনাশের মুখে যাকে ফেলে রেখে পালিয়েছিল ইংরেজ—আজ সেই দেশকে দখল করবার জন্য তাদের উৎসাহে যেন জোয়ার লাগল। বৃটিশ শাসনে মালয় রক্তের ক্রম অপচয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল—জাপানী শাসনের কটি বৎসরের পর সেই মালয়কে রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরে পেল বৃটিশ। কিন্তু মালয়ের দুঃস্থতাকে নিরসন করবার কোন চেষ্টা না করেই তারা উৎপীড়ন চালাতে সুরু করলে।

জাপানী শৃংখল মুক্ত হয়েই সমগ্র মালয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি, ফ্যাসীবিরোধী মিলিত পার্টি এবং সকল গণতান্ত্রিক দল সম্মিলিত হয়ে মালয়ের বিশ্বাসঘাতকদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবী তুলল। কিন্তু দখলকারী বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ সে-দাবী মানলেন না। অপরপক্ষে যে সব বিশ্বাসহন্তাদের এরা গ্রেপ্তার করে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিল বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের আশু মুক্তির ব্যবস্থা করলেন। যারা প্রতিরোধ আন্দোলন দমনে জাপানীদের সংগে কাজ করেছিল তারাই আবার বহাল হোল চাকুরীতে।

জনসাধারণের সম্মিলিত দাবীকে এইভাবে প্রথমেই উপেক্ষা করে তারপর কর্তৃপক্ষ এইসব পার্টির মাথায় মুগুর মারা সুরু করলেন। মালয়ের জনসেনাকে নিরস্ত্র করে ভেঙে দেবার চেষ্টা চলতে লাগল।

এদিকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ চরম খেয়ালীর মত জাপানী মুদ্রা অচল বলে ঘোষণা করলেন। মালয়ীদের হাতে তখন জাপানী মুদ্রাই একমাত্র ছিল। সে সব বাজেয়াপ্ত করা হোল। অর্থাৎ মালয়ের শ্রমিক ধনিক এবং চাষীরা জাপানের দস্যুতার পর আবার একবার গণতান্ত্রিক সভ্য সরকারের আইনের সঙীনমুখে রিক্ত হয়ে পড়ল। জাপানী গভর্ণমেন্ট মালয়ে এসেই বৃটিশ মুদ্রা ও সোনা মালয়ীদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। এখন বৃটিশ সরকার জাপানী আত্ম-

সমর্পণকারী সরকারের কাছে জুলুম করে সেগুলি হস্তগত করল। এইভাবে বৃটিশ ফিরে পেল দশকোটী ডলার। কিন্তু বাজেয়াপ্ত জাপানী মুদ্রার বিনিময়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সেই প্রমাণ ইংরেজী মুদ্রা মালয়ীদের হাতে প্রত্যর্পণ করলে না।

মালয়ের মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক চাষী সম্প্রদায় মরতে বসল। ধনীদের ক্ষতি হোল বটে কিন্তু বৃটিশের কাছ থেকে দেনা নিয়ে তারা আবার ব্যবসা চালু করলেন। চরম দুর্গতির মধ্যে ফেলে সামান্যতম মজুরীতে এইসব শ্রমিক ও আবাদীদের আবার কাজে নেওয়া হোল। মজুর ও কিষাণদের মানুষের মত খেয়েপড়ে আর বাঁচবার উপায় রইল না।

একদিকে খাদ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত চড়া দাম আর একদিকে অত্যন্ত কম মজুরীর মধ্যে পড়ে লক্ষ লক্ষ লোক মরতে বসল। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নৃশংস দস্যুতার পর আবার সেবার ছদ্মবেশ নিয়ে বসল। সিংগাপুরে প্রতি পরিবারের জন্য যৎ সামান্য সাহায্যের ব্যবস্থা হোল। একটা সমগ্র জাতিকে ভিখারী বানিয়ে কর্তৃপক্ষ ন্যুনতম সাহায্যের দ্বারা দুনিয়ায় বাহবা নিবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই ভিন্ন বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ সেই পুরাতন চীনা মালয়ী ভেদ নীতিকে আবার জাগিয়ে তুললেন। দুর্যোগের রাত্রিতে শত্রুর বিরুদ্ধে তারা এক আদর্শের নীচে সমবেত হয়েছিল সমগ্রতার পটভূমিকায়, সকল মালয়ী জাতিধর্ম নির্বিশেষে স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের পণ করে মিলিত হয়েছিল, মনে হয়েছিল যে ভেদবুদ্ধির আগুণ চিরদিনের মত নিভে গিয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তা' হতে দেয় না। মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে তাদের অন্যায় শাসন ও শোষণ যে দাঁড়াতে পারবে না এ তারা বোঝে। সুতরাং সেই নির্বাপিত প্রায় আগুণকে তারা হাওয়া দিয়ে, ইন্ধন দিয়ে জাগিয়ে তুলল। চীনা মালয়ী এবং ভারতীয়দের মধ্যে যাতে সদ্ভাব গড়ে না ওঠে তার জন্য বৈষম্যমূলক সরকারী ব্যবস্থা চালু হোল।

মালয়ের খাদ্যাভাবের শোচনীয় পরিস্থিতি নিয়ে একটা সম্ভাব্য পরিকল্পনা রচিত হোল বটে কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রব্যাপী দুর্ভিক্ষের মুখে

দাঁড়িয়ে সে পরিকল্পনা সর্বোত্তম ভাবে কার্যকরী হতে পারছে না।

মালয়কে বৃটিশ এতদিন মানুষের বাসভূমি বলে মনে করেনি। তার বেনিয়া নীতির শোষণযন্ত্র সে এখানকার মানুষদের পাঁজরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেউ কেউ মালয়ীদের পছন্দ করেন, কেউ কেউ করেন চীনাদের। অবশ্য প্রবাসী ভারতীয়দের অধিকাংশই কুলী শ্রেণীর। তাদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃস্থ। তাদের পিছনে কোন স্বাধীন শক্তিশালী মাতৃভূমির রাষ্ট্রশক্তি নেই। তাই কেবল মালয়েই নয় পৃথিবীর সর্বত্র ভারতীয়েরা কোণঠাসা আইনের কবলে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে অনবরত।

মালয়ে অনুসৃত নীতি যে কত জঘন্য তা বুঝতে বৃটিশের অনেক দেরী হোল। গত শতাব্দী এবং এ শতাব্দীর চারটি স্তবক ধরে যে শাসন প্রণালী চালু রেখেছিল ইংরেজ তার বিরুদ্ধে কেবল মালয়েই নয় সর্বত্র কটু সমালোচনা হয়েছে। সমগ্র মালয়কে একরাষ্ট্র করে গড়ে তুলে মালয়ীদের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করার নীতিই অনুসরণ করা উচিত ছিল বৃটিশের। উচিত ছিল চীনা ও অন্যান্য পরজাতির মানুষদের আগমন নিয়ন্ত্রণ করা। উচিত ছিল মালয়ের খাদ্য ফসলের জমিকে আরো বাড়িয়ে অন্ততঃ খাদ্যের ব্যাপারে মালয়কে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার। উচিত ছিল মালয়ের যে দুই তৃতীয়াংশ জমি আজো অনুন্নত পতিত তাকে বৈজ্ঞানিক মতে আবাদী ক্ষেত্রে পরিণত করা। তার ফলে মালয়ের খনিজ সম্পদের ভবিষ্যৎ হোত আরো উজ্জ্বল—মালয়ের টিন, রবার এবং অন্যান্য অনাবিষ্কৃত মৃত্তিকা সম্পদ মালয়ের জাতীয় সমৃদ্ধিকে শীর্ষমুখী করতে পারত। কিন্তু ইংরেজ সে সবের কোন পরোয়া করেনি এতদিন। নিজের অনুসৃত নীতিতে সে দেশের মানুষকে পিছনের দিকে ঠেলে ঠেলে দিয়েছে—বিদেশীকে ডেকে এনে বিভেদসৃষ্টিকারী সর্বনাশাকে কায়েমী করেছে মালয়ের মাটিতে চিরদিনের মত।

১৯৪৬ সালের ২২শে জানুয়ারী এক হোয়াইট পেপারে মালয়ের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাকে ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে ষ্ট্রেটস সেটেলমেণ্ট এবং মালয় রাষ্ট্রমণ্ডলকে নূতন করে গঠন করা হ'বে। সিংগাপুর উপনিবেশ এবং সমগ্র মালয় ইউনিয়নের উপনিবেশ। মালয় ইউনিয়ন নটি মালয় রাষ্ট্র—পেনাং এবং মালাক্কা নিয়ে গঠিত হ'বে।

সিংগাপুর এবং মালয় ইউনিয়নের স্বতন্ত্র কার্যকরী এবং রাষ্ট্রসভা থাকবে। দুজন গভর্ণর থাকবেন দুটি বিভাগের জন্য।

মালয়ের সুলতানদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে বহুকাল ধরে তাঁরা মালয়ী প্রজাদের ধর্মগুরু হয়ে আছেন, সুতরাং মালয় ইউনিয়নের মন্ত্রণা পরিষদে তাঁরা সদস্য পদ পাবেন। এই পরিষদ মালয়ের ইসলাম ধর্ম ঘটিত ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারবে।

নাগরিকত্বের প্রশ্নে ঘোষণা করা হয়েছে যে মালয়ী ভিন্ন যারা মালয়ে জন্মগ্রহণ করেছে অথবা এই ঘোষণা কার্যকরী হবার আগের পনের বৎসরের মধ্যে দশ বৎসর যারা মালয়ে বাস করেছে বলে প্রমাণিত হবে তারাও মালয় ইউনিয়নের পূর্ণ নাগরিক অধিকার পাবে।

মালয়ে পাঁচ বৎসর বাস করলেও এই নাগরিক অধিকার বর্তাবে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল নরনারী যারাই মালয়কে মাতৃভূমি বলে জ্ঞান করে মালয় ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য প্রমাণ করবে তারাই এই নাগরিক অধিকারের বলে মালয়ের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুযোগের অংশীদার হ'তে পারবে।

হোয়াইট পেপারে ঘোষণা করা হয়েছে যে মালয়কে অদূর ভবিষ্যতে স্বায়ত্বশাসন দানের পরিকল্পনা নিয়ে এবং মালয়বাসীকে এই অধিকার লাভের যোগ্যতা অর্জন করবার জন্য সম্ভাব্য সুবিধা দানের উদ্দেশ্যেই এই নূতন রাষ্ট্র বণ্টন এবং পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ধীরে ধীরে স্বায়ত্ব শাসন দানের ধাপ্পা সাম্রাজ্যবাদের বহু

পুরাতন চাল। আজকের দিনে এই ধাপ্পায় কোন শোষিত জাতি সন্তুষ্ট হতে পারে না।

এই রাষ্ট্র বন্টনে মালয়ীদের গভীর আশংকার কারণ আছে। চীনারা মালয়ে জনসংখ্যায় গরিষ্ঠ হয়েছে ইতিমধ্যে এবং মালয়ের অর্থনীতিতে তাদের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী। এই পরিকল্পনার ফলে আরো অধিক সংখ্যায় চীনা এখানে অনুপ্রবেশ করবে যার ফলে মালয়ীদের একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়বার সম্ভাবনা।

সুতরাং চীনাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার দানের ব্যবস্থায় মালয়ীরা খুশী হতে পারে না। তাদের জন্য রক্ষামূলক কোন আইন না থাকলে তারা সর্বক্ষেত্রেই হেরে যেতে বাধ্য। নিকট ভবিষ্যতেই এই মালয়ীরা জাতি হিসেবে অন্য অনেক দেশের আদিম অধিবাসীদের মত শোচনীয় অপমৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পাবে না।

হয়ত ভবিষ্যতে চীনা অনুপ্রবেশ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'বে। কিন্তু সে কতখানি কার্যকরী হ'বে তা সন্দেহজনক। স্বাধীন শক্তিশালী চীনা রাষ্ট্র তার নিকট প্রতিবেশী দেশে এই শ্রেণীর আইন বরদাস্ত করবে না।

বৃটিশ সমালোচক মহল ভাবেন যে তারা মালয়ীদের চীনাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যত প্রকার রক্ষামূলক ব্যবস্থা করা সম্ভব অতীতে তা করে এসেছেন। এখন মালয়ীদের চীনাদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বাঁচার চেষ্টা করতেই হবে। কিন্তু এ প্রচার অর্ধসত্য। সুতরাং পরিকল্পিত পথে চীনা-মালয় সমস্যা মিটবে না। বরং এর ফলে অসন্তোষ ও হানাহানি বাড়বে।

সাড়ে সাত লক্ষ ভারতীয়দের নিয়েও আজ প্রশ্ন গুরুত্ব ধারণ করেছে। জাপানী আমলের বহু পূর্ব থেকেই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী সেখানে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করেছে এবং আজও করছে। মালয়ের ভারতীয়রা এতদিন যে দুঃখ পেয়েছে তার শেষ হতেই হবে। ভারতবর্ষের জনমত এ অন্যায়কে আর সহ্য করতে প্রস্তুত নয় কোনমতেই।

মালয়ের রাষ্ট্রনীতির সমস্যাও হোয়াইট পেপারে মিটবে না। মালয়ের কমিউনিষ্ট পার্টি মালয়ের বামপন্থী সর্বদলের অগ্রগামী দল। তাদের নেতা লিন থা লিয়াংকে সম্প্রতি সিংগাপুর আদালতে হাজির করা হয়েছিল আপত্তিজনক ক্রিয়াকলাপের জন্য। মালয়ের জাগ্রত জনমতের এইসব নেতারা এই ধরণের সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার ও ধাপ্পাবাজীতে আর ভুলতে চাইছেন না। তারা চান চরম স্বাধিকার। স্বাধীনতা লাভের জন্য তারাও শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। মালয়ে বৃটিশ এতকাল যে দুঃশাসন অনুসরণ করে এসেছে তার চেয়েও দুর্নীতি চালু করবার জন্য তারা আজ চেষ্টা করছে। মালয়ের যতটুকু উন্নতি তারা করেছে তার অনেকগুণ লভ্যাংশ তারা দেশে নিয়ে গেছে।

কিন্তু জাতি যখন জেগে ওঠে, নিজের শৃংখল সম্বন্ধে সচেতন হয়, যখন জনমত শৃংখল মোচনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়—তখন পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

মালয় আজ সেই অন্তশ্চেতনায় প্রাজ্ঞ। ইতিহাসের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা বৃটিশকে বলছে—স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।

রাজ্যে। এই জন সংখ্যার মধ্যে ২৫ লক্ষ চীনা। শ্যামে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব। প্রাচীন আর্য সভ্যতার নিদর্শনও এখানে প্রচুর। ১৯৩৭ সালে শ্যামে উপায়ী জনসংখ্যার শতকরা ৮৪ ভাগই ছিল কৃষিজীবী। এখানে চালই প্রধান ফসল। সারা দেশের অভাব মিটিয়েও প্রতি বৎসর শ্যাম ১৫ লক্ষ টন চাল বিদেশে রপ্তানী করে। জমির মালিকানা চাষীর হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জমিগুলি বাঁধা পড়ত মহাজনের কাছেই। সাম্প্রতিক কালে শ্যামে সমবায় আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠার দরুণ চাষীরা ঋণ শোধ করে অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছিল। চালই শ্যামের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে খাড়া রেখেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যই শ্যামের চালের প্রায় একচেটিয়া খরিদ্দার।

দক্ষিণ শ্যামে রবার চাষ হয়। প্রতি বৎসর শ্যাম রবার রপ্তানী করে ৩৫ হাজার টন। তামাক ও ইক্ষু যা' উৎপন্ন হয় তাতে শ্যামের ঘরোয়া চাহিদা মিটে যায়। এ ভিন্ন তুলা, সয়াবীন এবং বাদামও হয় শ্যামের মাটীতে।

শ্যামের শিল্প প্রসার টিন খনিজে।

১৯১৮ সালে শ্যাম বাকার চুক্তি বদ্ধ হয়ে বৎসরে প্রায় ১৯ হাজার টন টিন উৎপাদন করে। সারা দুনিয়ার উৎপাদনের শতকরা ৮ ভাগই শ্যামের টিন। মালয়ের শোধনাগারে এই খনিজ টিন পরিশুদ্ধ ধাতুতে রূপান্তরিত হয়।

১৯৩২ সালের পূর্ব অবধি শ্যামের অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্তৃত্ব ছিল অকটোপাশের মত কঠিন। বৃটিশ, আমেরিকান, জার্মাণ জাপানী এবং চীনারা এখানে মুঠি মুঠি অর্থ উপায় করে দেশে পাঠিয়েছে। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে ঋদ্ধিশালিনী শ্যাম নিজের ভূমি সম্পদের দ্বারা জাতীয় উন্নতির কোন সুযোগ পায়নি।

শ্যামকে নিজের দেশের প্রয়োজন মেটাবার জন্য খাদ্যদ্রব্যের কিছু কিছু আমদানী করতে হয় আজো। কিন্তু সে গুরুতর কিছুই নয়।

১৯৩২ সালে বিনা রক্তপাতে শ্যামে এক বিপ্লব ঘটে যায় যার ফলে শ্যামের সমগ্র কাঠামোকেই বদলে ফেলা হয়। এই বিপ্লবের

উদ্যোক্তাদের কথা জানা প্রয়োজন। সেনাবাহিনীর তিনজন অধ্যক্ষ প্রথমেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করেন সম্রাটের কাছ থেকে। মনে রাখতে হবে যে, ১৯১২ সালের আগে শ্যামে সম্রাটের এক নায়কত্ব চলত। রাজপুত্রদের এবং সম্রাট পোষিত উপরের দশজন সমগ্র জনসাধারণের ইচ্ছাকে অবহেলা করেই রাজ্য শাসন করতেন বিদেশী পরামর্শ দাতার সাহায্যে। শ্যামের অর্থনীতির পরামর্শ দাতা বহুদিন ধরেই বৃটিশ এবং রাজনৈতিক পরামর্শ দাতা আমেরিকান। কিন্তু ১৯৩২ সালে ত্রয়ী কর্ণেল প্রথম উপরের দশ জনের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিলেন। কিন্তু শ্যামের সত্যকার নেতা হিসেবে যারা শাসন সংস্কার করলেন তাঁদের মধ্যে বিপুল সংগ্রাম ও প্রাদিত্ত মন্নধরমের নামই উল্লেখযোগ্য।

প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় প্রাদিতের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় বিপুল সংগ্রামের। বিপুল সংগ্রাম তখন ফরাসী অফিসারদের কাছে সামরিক শিক্ষা নিচ্ছিলেন। বামপন্থী চিন্তাধারার জন্য দুজনেই পরস্পরের কাছে সরে এলেন। এই সময় প্রাদিতের সংগে যে সব বামপন্থী ছেলেদের ঘনিষ্ঠতা হয় তারাই আজ ইন্দোনেশিয়া, ইন্দো-চীন, বর্মা ও মালয় এবং ভারতে স্বাধীনতার জনপ্রিয় নেতা।

১৯৩২ সালের মধ্যে প্রাদিত্ত ও বিপুল সংগ্রাম দেশের বামপন্থী জনমতের নেতা হয়ে পড়েছেন। ত্রয়ী কর্ণেলের দ্বারা ক্ষমতা আহরণের সংগে সংগেই প্রাদিতের উপর নূতন জনপ্রিয় মন্ত্রী পরিষদের সভাপতিত্বের দায়িত্ব এসে পড়ল। তিনি এবং বিপুল সংগ্রাম যৌথচেষ্টায় শ্যামকে নূতন করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯৩৩ সালে প্রিন্স বোড়রাদেজ যে বিদ্রোহ করলেন বিপুল সংগ্রাম তা কঠোর হস্তে দমন করলেন।

সম্রাটের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরেই দেশের জনমত বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। যদিও বিপ্লবের সময় দেশের জনমত আত্মপ্রকাশ করেনি কিন্তু বহুদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তারা সার্বভৌম সম্রাটত্বের অবসানই চাইছিল। একদিকে উপরিওয়ালা রাজকর্মচারীদের

স্বেচ্ছাচারিতা এবং লোভ অপরদিকে জাতীয় ব্যবস্থা ও শিল্পে বিদেশীদের শোষণ, এই দুয়ে মিলে শ্যামের গণচেতনা খুঁজছিল একটা সুযোগ্য পরিস্থিতির জন্য। প্রাদিত ও বিপুলসংগ্রামের নেতৃত্বে জনসমাজের হাতে ক্ষমতা অনেকখানি হস্তান্তরিত হোল।

নূতন যে শাসনতন্ত্র রচিত হোল তাতে সম্রাটের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠতা বজায় রইল। ব্যবস্থা পরিষদ এবং মন্ত্রণাপরিষদের নির্দেশে তিনি রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। ব্যবস্থা পরিষদে অর্ধেক সদস্য সম্রাটের মনোনীত এবং বাকী অর্ধেক গণভোটে নির্বাচিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্যামে কুড়ি বছরের অধিক বয়সের নরনারীর ভোটাধিকার আছে। প্রতিনিধি নির্বাচন হোত প্রতি চার বছর অন্তর। শাসন সংস্কারের খসড়া অনুযায়ী এই মনোনীত ও নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভা ১৯৪২ অবধি কার্যকরী থাকবে—তারপর সবকটি আসনই নির্বাচনের দ্বারা পূর্ণ হবে। অর্থাৎ যথার্থ জনপ্রতিনিধিরাই শাসনব্যবস্থায় পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করবে। কিন্তু ১৯৪১ সালের বিপর্যয়ে সব খসড়া ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল।

শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েই প্রাদিত-বিপুল সহযোগিতা দেশের ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে যথার্থ স্থায়ী জাতীয় অর্থনীতিতে দৃঢ় করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। নানাপ্রকারে বৈদেশিক একচেটিয়া অধিকার চূর্ণ করে আইনের অকটোপাশে তাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে আনবার জন্য চরম আইন পাশ করা হোল।

কাঠের ব্যবসা শ্যামের জাতীয় অর্থাগমের বিপুল ক্ষেত্র। বিশেষ করে শ্যামের টীক উডের চহিদা খুব। অথচ এ ব্যবসা বৃটিশের করতলগত। সুতরাং যেসব ক্ষেত্রে শ্যামের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে একমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে লীজ নতুন করে দেওয়া হোল। সরকার নিজেই করাত কল বসালেন। চালের ব্যবসা চীনাদের প্রায় একচেটিয়া। সুতরাং আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তাদের হাতেই এই ব্যবসার ভার দেওয়া হোল। যে দু'টি বিদেশী কোম্পানী

অপরিশুদ্ধ তেলের কারবার করত তাদের উপর সরকারী নির্দেশ গেল শ্যাম জনসাধারণকে শেয়ার বিক্রী করে কোম্পানীর কর্তৃত্বে তাদেরও ভাগ দিতে। সুরসুর করে কোম্পানী দুটি জাল গুটিয়ে সরে পড়লেন। সরকার নিজেই দপ্তর খুলে এই ব্যবস্থা হাতে নিলেন। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত জাহাজী কোম্পানী খুলে জাতীয় বাণিজ্য বহর সৃষ্টি করা হোল। অর্থাৎ শ্যাম তার অর্থনীতি নিজের হাতেই নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বিশেষ করে শ্যামের হাতে টিন, লোহা, কয়লা, টাংষ্টেন এবং ম্যাংগানীজ থাকার জন্য শিল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা কষ্টকর হোল না শ্যাম সরকারের। কৃষি অর্থ-নীতির সংগে তাল রেখে শিল্প প্রসারের ফলে জাতীয় সমৃদ্ধি বাড়তে লাগল এবং শ্যামের অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠিত হ'তে লাগল দিনে দিনে।

রাজনৈতিক দিক থেকেও এই একই প্রকার জাতীয়করণ নীতি অনুসৃত হ'তে লাগল। ধীরে ধীরে ধৈর্যশীল আলাপ আলোচনার শেষে চুক্তির পর চুক্তি করে রাজনৈতিক বৈষম্যের বিলোপ সাধন করা হোল। বৃহত্তর শক্তিবর্গ ভৌগলিক অধিকার পরিহার করতে বাধ্য হোল। প্রত্যেক বিদেশীকেই শ্যাম সরকারের আইনবদ্ধ করা হোল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্যাম সরকার রাষ্ট্র পরিষদে ঘোষণা করল যে সে স্বাধীন ও প্রভাবমুক্ত জাতি।

ধীরে ধীরে শ্যাম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হ'তে লাগল।

এখানে চীনাদের সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসংগিক হ'বে না।

চীনের সংগে শ্যামের সম্পর্ক সম্প্রীতির নয়। শ্যাম কোনদিনই চীনের সংগে রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেনি। বিপ্লবের পূর্বে সার্বভৌম চীনা সরকার একবার শ্যামের উপর কর্তৃত্বের দাবী পেশ করেছিল। কিন্তু থাই সরকার সে-দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য করে দেয়। এরপর চীন সরকার আরো বহুবার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে কিন্তু শ্যামের তরফ থেকে অধীন জায়গীরদার হয়ে বেঁচে থাকা ভয়াবহ। এছাড়াও ব্যাংককে চীনা প্রতিনিধি নিয়োগে সম্মতি

দিলে আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের সূচনা হবেই চীনা বাসিন্দাদের নিয়ে। কারণ শ্যামে চীনা বসতির সংখ্যা প্রচুর। চীনাদের মতে শ্যামের জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশই চীনা। অবশ্য শ্যাম তা স্বীকার করে না। তাদের মতে চীনারা পাঁচ লক্ষ। এই বিপুল পার্থক্যের প্রধান কারণ শ্যামদেশে যে সমস্ত চীনা জন্মেছে তাদের চীনা বলতে শ্যাম সরকার সম্পূর্ণ গররাজী। তা ভিন্ন চীনা পিতা এবং থাই মায়ের গর্ভজাত সন্তানদের চীনারা 'চীনা' বলে দাবী করে আর থাই সরকার তাদের শ্যামীজ ছাড়া আর কিছু ভাবতে রাজী নয়। কিন্তু শ্যাম সরকারের সমস্ত দাবী সত্বেও বিদেশী চীনারা এবং তাদের থাই পুত্রকন্যারা নিজেদের একজাত বলে মনে করে।

এইসব চীনারা সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক পরামর্শের জন্য চীনের দিকে তাকিয়ে থাকে। চীনাদের এই বিভেদকারী মতবাদের জন্য শ্যামের রাষ্ট্রীয় সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নানাভাবে। চীনারা কিছুতেই থাইদের সংগে নিজেদের মিলিত করতে পারেনি। আলাদা স্কুল, আলাদা সামাজিক জীবন, আলাদা ভাষা, এবং আলাদা মতবাদের দ্বারা শ্যামের জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী হয়ে আছে। কাজেই চীনের সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন আগেও যেমন সম্ভব হয়নি আজো তা' হচ্ছে না। বরং সমস্যা আরো ঘোরালো হয়ে উঠছে। হয়ত ভবিষ্যতে শক্তিশালী চীন তাদের স্বজাতির স্বার্থ সংরক্ষণে অগ্রসর হয়ে স্বাধীন শ্যামের উপর অনধিকার কর্তৃত্ব করতেও আসতে পারে।

এছাড়া শ্যামের ঘরোয়া অর্থ নীতির বেশীর ভাগই চীনা সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত। বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ এবং অন্তর্বাণিজ্যের অনেকখানিই চীনাদের হাতে। মাছের ব্যবসা চীনাদের। টিন ও রবারে চীনারা প্রবল। মহাজনী কারবার চীনাদের একচেটিয়া। পাইকারী ও খুচরা লেনদেনের শতকরা ৯০ ভাগ কর্তৃত্ব চীনাদের। একমাত্র ব্যাংককেই চীনাদের ১১ খানি সংবাদপত্র। চীনাদের জন্যই শ্যামের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভালভাবে গড়ে উঠতে পারেনি।

যতদিন চীন থেকে পুরুষেরা এসেছে এদেশে শ্যাম সরকার আপত্তি করেনি। কিন্তু পরে চীনা মেয়েরা এখানে এসে স্কুল খোলা সুরু করতেই শ্যাম সরকারের চেতনা হয়। সেই ভয় এবং আপত্তির ফলেই নূতন রাষ্ট্র পরিষদ বিদেশীদের জন্য যে সব আইন প্রণয়ন করেন তার মধ্যে চীনাবিরোধী আইনগুলিই বিশেষ করে রচনা করার চেষ্টা হয়েছে। চীনাদের শ্যামরাজ্যে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি এলাকায় চীনাদের স্বার্থ সংকুচিত করে থাইদের জন্য সুবিধা সংরক্ষিত করা হয়েছে।

শ্যাম সরকার ১৯৩৭ সালের চুক্তির ফলে সকল জাতির সংগেই মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হয়েছিল। কেবলমাত্র চীনা সরকারের সংগে নয়। তার অর্থ শ্যাম নিজেকে গড়ে তোলবার সময় কারুর সংগে অযথা সম্পর্ক কটু করে তুলতে চায়নি। সে তার স্বার্থবিরুদ্ধ হয়ে উঠতে পারত। তবু শ্যাম সরকার সমস্ত বৈদেশিক মন্ত্রণা দাতাদের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

শাসন সংস্কার ও অর্থনৈতিক জাতীয়করণ ছাড়াও বিপুল সংগ্রামের নেতৃত্বে শ্যামের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে থাকে। নানাদিক থেকে জাতীয় জীবনে একটা নবজাগৃতির জোয়ারের রুদ্ধ মুখ খুলে যায়।

চীনা ছাড়া আর একটি সরকারের বিরুদ্ধে শ্যামের অভিযোগ —সে প্রতিবেশী ফরাসী সরকার। শ্যামের কম্বোজ ও লাওস এলাকা ইন্দোচীনের অন্তর্ভুক্ত করার সময় শ্যাম অসহায় ছিল। এখন শ্যাম সরকার তার দেশের সীমানা আন্নামাইট পর্বতমালা অবধি ঘোষণা করল। শ্যামের পাঠ্য পুস্তকে শ্যামের সীমানা এ অবধি লেখা হতে লাগল।

১৯৩৯ সালে য়ুরোপীয় দিগন্তে যখন যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠল এবং সরবরাহ সংকুচিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল তখন শ্যাম সরকার দেশরক্ষা সচিবের পরামর্শ অনুযায়ী একটি সুচিন্তিত জাতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করেছিলেন। তাতে ফলও খুব ভাল হয়েছিল।

প্রাচ্যে জাপানের প্রাধান্যের সংগে সংগে স্বাধীন শ্যামেরও আন্তর্জাতিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল। দুই পাশের সাম্রাজ্যবাদী দংষ্ট্রার মধ্যে পড়ে শ্যাম নিরংকুশভাবে জাতীয় করণের পরিকল্পনা চালিয়ে যেতে লাগল এবং সেই সংগে নিজের সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি করতে লাগল। অনেক কিছু চিন্তা করেই শ্যামের বৈদেশিক স্বার্থ খণ্ডনের পরিকল্পনাকে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ মেনে নিয়েছিল। তবু জাপানীদের সংগে কোন কূটনৈতিক চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েনি শ্যাম সে সময়। একমাত্র চীন ছাড়া আর সব রাষ্ট্রের সংগেই সে সৌহার্দ্য বজায় রেখেছিল যদিও লীগ অফ্ নেশনের সভায় মাঞ্চুরিয়ার প্রশ্নে সে জাপানের বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি। জাপান বরং শ্যামের সংগে চুক্তি বদ্ধ হবার নানা চেষ্টা করেছে কিন্তু ১৯৪০ সালের আগে জাপানের কোন চেষ্টাই ফলবতী হয়নি। ব্যাংকক থেকে সামান্যই সাড়া পেয়েছিল জাপান।

বর্মা, ভারত, মালয়, চীন, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণ মানুষ য়ুরোপীয় ও আমেরিকার লোভ ও পররাজ্য লোলুপতাকে ঘৃণা করে ও তাদের সম্বন্ধে একটা কটু মনোভাব বহুদিন ধরে পোষণ করে আসছে। কেবলমাত্র শ্যামেরই এই প্রকার বিজাতীয় আক্রোশের পরিচয় পাওয়া যায়নি। এমন কি জাপানের উস্কানীতেও শ্যাম নিজের মতবাদকে পরিবর্তন করেনি। যতটুকু বিদেশী বিতাড়ন সে করেছে তা সম্পূর্ণই আত্মরক্ষামূলক। হয়ত অন্যান্য কলোনী গুলিতেও এত দিনের পর যদি য়ুরোপীয় সন্ত্রাসবাদী শাসনতন্ত্র শান্তিপূর্ণ ভাবে বিদায় নেয় তাহলে স্বাধীন এশিয়াটিক রাষ্ট্রগুলির মনেও বিজাতীয়ের প্রতি আক্রোশ হ্রাস পাবে। কিন্তু তেমন শুভেচ্ছা ১৯৪৬ সালেও দৃষ্টি গোচর হয়নি।

এখানে শ্যামবাসীদের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

শ্যামের শ্রেষ্ঠব্যক্তি ও পরিবার হিসেবে সম্রাট ও তাঁর পরিবার। রাজরক্ত যাদের ধমনীতে বইছে তারাই সমাজের অভিজাত শ্রেষ্ঠ। রাজা এবং তাঁর বৃহত্তর পরিবারের হাত থেকে ক্ষমতার বলগা ১৯৩২

সালের পর জনসাধারণ ছিনিয়ে নিয়েছে। এঁদের পরেই আসে রাজপুরুষ ও জনপ্রতিনিধিরা। তারপরই উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সব দেশের মতই এরা ব্যবসা করে, দোকান চালায়, মহাজনী করে এবং অন্যান্য নানাভাবে রাষ্ট্রের সংগে জড়িয়ে থাকে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে চীনা—চীন-শ্যাম এবং ভারতীয়েরাই প্রধান। সর্বশেষে আসে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী। এখানে রাষ্ট্র কর্ণধারকে কৃষক যখন সম্মান করে তখন সে তার বুদ্ধিমত্তা ও কর্মক্ষমতাকেই শ্রদ্ধা জানায়, তার সোনালী আভিজাত্যকে নয়। শ্যামের ভদ্রতা একটা প্রচলিত কথায় দাঁড়িয়ে গেছে। এদের মধ্যে রসবোধ সার্বজনীন।

পিতৃপিতামহ যেভাবে জমি থেকে ফসল ফলিয়েছিলেন আজকের দিনে শ্যামের কৃষক একই প্রকারে জমিতে সবুজ সোনার ঢেউ খেলায়। নিজের জমিতে তারা পরিশ্রম করে প্রচুর যদিও শ্যামের সামান্য দুর্নাম আছে অপরিশ্রমী জাতি হিসেবে। এদের মধ্যে লেখাপড়ার চলন কম। তবু বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী এরা জানে এবং তাদের তাৎপর্য বোঝে। যেমন ভারতের নিরক্ষর চাষী রামায়ণ মহাভারতের আধ্যাত্মিকতা মনের ভিতর অনুভব করতে জানে। কুসংস্কার নিয়ে তারা ঘর করে—নানা অপদেবতাতেও বিশ্বাসী।

শ্যাম রঙের দেশ। মেয়েদের পরিধেয়ে সে রঙের সমন্বয় ঘটে অজস্রতায়। তারা পুরুষের চেয়েও শ্রমশীলা। যৌবনে তাদের দেহযষ্ঠী সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতেব। সৌন্দর্য তাদের স্বাভাবিক। শ্যাম দেশের মেয়েরা প্রীতিময়ী—তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাও প্রখর। জাপানীরা যখন এখানে নারীবাহিনী গঠন করবার চেষ্টা করেছিল শ্যামের নারী:মহল তাতে সাড়া দেয়নি।

উন্নত মননশীলতা সত্ত্বেও আজো শ্যামের রাজনৈতিক জীবনে মেয়েদের হাতে ক্ষমতা নেই—হয়ত তাদের ক্ষমতা লোলুপতাই কম। সিংহাসনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম চিরদিনই। সেটুকু তাদের আজো বজায় আছে।

শ্যাম রাজ্যের শেষ দক্ষিণ এলাকায় কিছু মালয়ী বাস করে, তারা মুসলমান হলেও থাইদের সংগে তাদের প্রীতি অবিসম্বাদী। শ্যামের উত্তর এলাকায় বাস করে লাও জাতি। শ্যামের কর্তৃত্বে আসার জন্যে লাও বৃদ্ধরা আজো আক্ষেপ করেন। কিন্তু তরুণ লাওরা থাই বলেই নিজেদের মনে করে। অদূর ভবিষ্যতেই লাওরা থাইদের সংগে সম্পূর্ণ মিলে যাবে। এ ছাড়া উত্তর এলাকার অরণ্যভূমিতে আরো কতকগুলি জাতি বাস করে যাদের জীবিকা চলে আফিম তৈরী করে। বনের কাঠ কেটে এবং বিক্রি করে তারা জীবন চালায়। এদেরই 'গরিষ্ঠ থাই' বলা হয়।

জাপানের এশিয়া এশিয়াবাসীর ধুয়ায় প্রেরণা লাভ করে থাই সরকারের একটি অংশ বিশ্বাস সুরু করে যে শ্যাম এই সব থাইদের নিয়ে বৃহত্তর থাইল্যাণ্ড রচনার দায়িত্ব নিতে পারবে। এই বৃহত্তর থাইল্যাণ্ডের মধ্যে ইন্দোচীন ও মালয়ের অনেকখানি অংশ, দক্ষিণ বর্মার অংশ, সমগ্র সান রাজ্য ও য়ুনান রাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রদেশগুলি এসে সম্মিলিত হবে। শ্যামকে এ স্বপ্ন বাস্তব করতে হলে বৃটিশ ফ্রান্স ও চীনকে ঐসব এলাকা সমর্পণ করতে বাধ্য করাতে হবে। বিশেষ করে আমেরিকান যুদ্ধ সরঞ্জামে প্রস্তুত য়ুনান গভর্ণর তার এলাকার সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়তে রাজী হবে না সহজে।

হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক দু' মাস আগে শ্যাম সরকার একদিন ঘোষণা করেছিলেন যে তাদের রাষ্ট্রের পুরাণো নাম বাতিল করে নূতন নামকরণ করা হোল থাইল্যাণ্ড। এ সংবাদ পাবার সংগে সংগেই বিশ্বের কুটনৈতিক মহল স্থির বুঝেছিলেন যে য়ুরোপের রাষ্ট্র বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে শ্যাম সরকার হয়ত এশিয়ায় তার রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করবে। এই নূতন নামকরণ তারই চরম ইংগিত।

এই সময় প্রাক্‌যুদ্ধ বৎসরগুলিতে শ্যামের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসংগে আবার ফিরে তাকান প্রয়োজন।

গড়ে ওঠার প্রথম বৎসরগুলিতে বিপুল-প্রাদিত সহযোগিতা

দেশের সর্বাংগীন মংগল করতে পেরেছিল। শাসন সংস্কার ও অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার দিকে প্রধান মন্ত্রী প্রাদিতের বিচক্ষণতা এবং বিপুলের নেতৃত্বে সামরিক শক্তি গঠনের ফলে শ্যাম দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। দেশের সামরিক শক্তি যত বৃদ্ধি পেতে লাগল সেনাধ্যক্ষ হিসেবে বিপুল সংগ্রামের ব্যক্তিগত ক্ষমতাও বাড়তে লাগল রাষ্ট্রের মধ্যে। ১৯৩৮ সালে বিপুল সংগ্রাম প্রধান মন্ত্রীর এবং দেশ রক্ষা মন্ত্রীর যুগ্ম দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। দেশের জংগী শক্তির একছত্র নায়ক হিসেবে তিনি শাসন তান্ত্রিক বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করতে চাইলেন।

এক নায়কত্বের লোভের মধ্যেও বিপুল সংগ্রাম পুরাণো বন্ধু ও কর্মী প্রাদিতের সহযোগিতা হারাতে চাইলেন না। যদিও এই সময় বিপ্লবের অন্যসব সহকর্মীদের বাদ দিয়ে তিনি নতুন করে মন্ত্রীমণ্ডল রচনা করেছিলেন। রাজস্ব কর ও অর্থনীতি সম্বন্ধে প্রাদিতের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার সহায়তা হারাণো শ্যাম রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং মত-ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠতে থাকলেও বিপুল প্রাদিতকে ছাড়তে রাজী হলেন না। তাছাড়া প্রাদিতকে দেশের লোক শ্রদ্ধা করত।

এমনি ভাবে এগিয়ে এল ১৯৪০ সাল।

য়ুরোপে ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয় ঘটল। ফরাসী ইন্দোচীনে ভিসি সরকার এ্যাডমিরাল ডেক্যুকে গভর্ণর করে পাঠালেন। গভর্ণর হয়েই ডেক্যু জাপান-তোষণ নীতি অবলম্বন করলেন। জাপানের হুমকী মেনে নিয়ে চীনের পথে ইন্দোচীনের রেলওয়ের মাল আনাগোনার উপর নজর রাখার জন্য কিছু জাপানী সৈন্য মোতায়নে সম্মত হলেন অর্থাৎ দক্ষিণ পথে বহির্জগতের সংগে চীনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে দিলেন। কলোনী সরকার আবার জায় পেতে জাপানের নির্দেশ নিলে যখন টনকিংয়ে তিনটি জাপানী বিমান ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হল। ৬ হাজার জাপানী সৈন্য ঐ এলাকায় থাকবে এই চুক্তির ফলে প্রায় ৫০ হাজার সৈন্যকে জমায়েত হ'তে দেখেও

আপত্তি করলে না। অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূমিভাগে জাপানী জংগীবাদকে এনে বসালে ভিসি সরকার।

এই সুযোগ শ্যামের বিপুল সরকার ছাড়লে না। বহুকাল ধরেই দক্ষিণ এশিয়ার এই স্বাধীন রাষ্ট্রটির সংগে জাপান আপোষ করবার চেষ্টা করেছিল। সুতরাং জাপানের কাছ থেকে আপোষের ঘুষ হিসেবে শ্যাম ইন্দোচীনের অন্তর্গত তার সাম্রাজ্যের অংশ কম্বোজ দাবী করে বসল। শ্যাম রাষ্ট্রের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে একদা সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী সরকার শ্যামের অংগহানি করেছিল পশুশক্তির জোরে। তারই প্রতিশোধকল্পে শ্যাম বাহুবলে এ্যাডমিরাল ডেক্যুর হাত থেকে কম্বোজ ছিনিয়ে নিলে। প্রথম দিকে ডেক্যু কিছু বাধা দিলেন কিন্তু জাপানীদের মধ্যস্থতায় আপোষ হোল। কিছু নগদ দাম নিয়ে ভিসি সরকার এই এলাকার হস্তান্তরের নথিপত্রে সই দিলেন।

এই সাফল্যে শ্যামে বিপুলের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে গেল। এই সুযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য জাপান শ্যামের কাছে তার জংগী দাবী পেশ করল। কিন্তু বিপুল তা' প্রত্যাখ্যান করলেন। শ্যাম কোনমতেই অক্ষশক্তির সংগে যোগ দিতে রাজী হোল না। স্বাধীন শ্যামের পক্ষে আন্তর্জাতিক সামরিক রাজনীতিতে নিরপেক্ষ থাকাই শ্রেয়ঃ ছিল। কারণ বিপ্লবোত্তর বৎসরগুলিতে শ্যাম পৃথিবীর সর্ব রাষ্ট্রের সংগেই সম্প্রীতি রেখে আসছিল। ফরাসীদের বিরুদ্ধে তাদের যে অভিযোগ তা সার্থকতার সঙ্গেই নিষ্পত্তি হোল। চীন তখন নিজের ঘরে শত্রু নিয়ে বাস করছে। সুতরাং সে দিক দিয়েও তার ভয়ের কারণ ছিল না। অবশ্য মূল শ্যামে চীনাদের নিয়ে যে সমস্যা তার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা করেছিলেন শ্যাম সরকার।

অবশেষে ১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাপান শ্যাম দেশ আক্রমণ করে বসল। সকল প্রকার হুমকী এবং স্তোকবাক্যের শেষে শ্যামের উপর সামরিক কর্তৃত্ব করতে এল জাপান। এই জংগীবাদের জন্য

এশিয়ার দরজা খুলে দিয়েছিল ইন্দোচীনের বিশ্বাসঘাতক ভিসি সরকার।

সুতরাং শ্যামের উপর গুরুতর নির্বাচন এসে পড়ল। হয় জাপানকে তার পথ ছেড়ে দিতে হবে শ্যামের রাজ্যের ভিতর দিয়ে আর নয়ত সামরিক প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে।

প্রতিরোধের আদেশ দিয়ে প্রধান মন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল বিপুল সংগ্রাম ব্যাংককে মন্ত্রীসভা আহ্বান করলেন।

জাপানীদের অস্ত্রবলে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না একথা সকলেই বিশ্বাস করতেন। নাম মাত্র প্রতিরোধের পর সম্মানজনক চুক্তিতে সম্মত হ'তে বাধ্য হলেন শ্যাম সরকার। আপোষে স্থির হোল যে শ্যামে জাপান তার সৈন্য চলাচল করতে পারবে কিন্তু শ্যামের রাষ্ট্রিক জীবনের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা চলবে না। এই চুক্তিই মেনে নিল জাপান।

এরই অব্যবহিত পরে শ্যাম বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই যুদ্ধ ঘোষণার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিপুল সংগ্রামের নিজের। মন্ত্রীপরিষদ সেই ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেনি। জাপানের আত্মসমর্পণের পর প্রাদিত্ত সেই ঘোষণাপত্রকে বাজে কাগজ বলে ঘোষণা করেছেন।

১৯৪২ সালে বিপুলের রাজনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে দেশের জনমত প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে। প্রাদিত্ত এই সময় মন্ত্রী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে প্রবাসী শ্যাম সম্রাট আনন্দ মহীদলের রিজেণ্ট হিসেবে কাজ করতে লাগলেন। সম্রাট আনন্দ মহীদল তখন সুইটজারল্যাণ্ডে ছাত্র। তিনি বিপুলের মত ও কর্মপদ্ধতি কোনটিরই অনুমোদন করেননি।

শ্যামের এই যুদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও আমেরিকান সরকার শ্যামকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে সামরিক নীতি গ্রহণে পরাঙ্মুখ ছিলেন। তার কারণ ওয়াশিংটনে তৎকালীন শ্যাম প্রতিনিধি শিল্পী সেনি প্রামোজের বিচক্ষণতা। যুদ্ধোত্তর শ্যাম রাষ্ট্রে সেনি প্রামোজই

প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। বিপুলের নির্দেশে সেনিই আমেরিকান সরকারকে যুদ্ধ ঘোষণাপত্র দেন কিন্তু সংগে সংগেই ব্যাংককের যথার্থ পরিস্থিতি প্রাদিত সেনিকে জ্ঞাপন করেন। সেনি ওয়াশিংটন থেকে বেতারে বিপুলের কর্মপদ্ধতির নিন্দা করে আমেরিকান প্রেসিডেণ্টকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে শ্যামের জনমত বিপুলের অক্ষপ্রীতিকে সুনজরে দেখে না। আমেরিকার সাহায্যেই পরে শ্যামে জাপান বিরোধী আন্দোলন প্রবলতর হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছিল।

যুদ্ধের বৎসরগুলিতে প্রাদিতের নেতৃত্বে শ্যামে জাপ বিরোধী আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। বিপুল সরকার এবং জাপবাহিনীর অলক্ষিতে প্রচুর আমেরিকান অস্ত্র ও রসদ শ্যামের জন বাহিনীর হাতে নিয়মিত আসতে সুরু করে। ব্যাংককে রিজেণ্ট হিসেবে প্রাদিত বিপুলের অক্ষপ্রীতির বিরুদ্ধে এবং জাপানী জংগীবাদের বিরুদ্ধে দেশের জনমত গড়ে তুলতে থাকেন। দেশের চাষী, শ্রমিক এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই বিপুলের মতবাদকে মেনে নিতে পারেনি। প্রাদিতই তাদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। প্রাদিতের সংগে ডেপুটি রিজেণ্ট আদুল ভেজরাসও কাজ করতে লাগলেন। জনবাহিনীর মধ্যে এদের নাম ছিল রাথ এবং বেটি। আদুল পরে সহকারী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

শ্যামের গেরিলা বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৯০ হাজার। তাদের হাতে আধুনিক সমরাস্ত্রের সব কিছুই ছিল। বহু আমেরিকানও এই গুপ্ত বাহিনীর সংগে কাজ করতেন। জাপানের আত্মসমর্পণের সংগে সংগেই গুপ্তবাহিনী শ্যাম রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দখল করে নিল। নূতন সরকার উত্তর মালয় থেকে শ্যাম সেনাবাহিনী সরিয়ে নিয়ে বৃটিশ-শ্যাম সম্প্রীতি ঘনিষ্ঠ করে তুলতে চেষ্টা করলেন। এদিকে জাপানীদের নিরস্ত্র করার কাজও সুরু হয়ে গেল ব্যাপকভাবে।

কিন্তু বৃটিশ মত সহজে শ্যামকে নিস্তার দিলে না। ১৯৪৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর লর্ড লুইস মাউণ্টব্যাটেন শ্যাম প্রতিনিধিদের

এক ভোজ সভায় আমন্ত্রণ করে একুশ দফা এক দাবী পেশ করেন।

অনেক কুটনীতিকের মতে সেই একুশ দফা দাবী গ্রহণ করলে শ্যাম চিরদিনের মত বৃটিশের দাস রাষ্ট্র হয়ে পড়বে। সেই একুশ দফায় বৃটিশের দাবী ছিল—তেল, কাঠ, চাল, রবার এবং টিনে পূর্ণ কর্তৃত্ব। শ্যামের জাহাজী কারবারে নিয়ন্ত্রণ অধিকার। বিশেষ বিশেষ ঘাঁটিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন। শ্যামে নৌ এবং বিমান ঘাঁটিতে কর্তৃত্বের অধিকার এবং ব্যাংককের সংগে সমস্ত বিমান যোগাযোগের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ অধিকারও। এ ছাড়াও শ্যামকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হবে ১,৫০০,০০০ টন চাল এবং মিত্রশক্তির সম্মতি ব্যতীত শ্যাম ক্রা যোজকে খাল কাটতে পারবে না কোনদিন।

এই দাবীর উপর বৃটিশ লর্ড আবার ফরাসী সরকারকে তার দাবী নিয়ে উপস্থিত হতে দিলেন। কম্বোজী প্রশ্নে শ্যাম আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হোল।

বৃটিশের কর্তৃত্ব শ্যামের স্কন্ধে চাপান ছাড়াও আর একটি গুরুতর দাবী ছিল। সে হচ্ছে দেশের নাম জুথাং থাই অর্থাৎ থাইল্যাণ্ড বদলে আবার শ্যাম বহাল রাখতে হবে। কারণ থাইল্যাণ্ড নামে বৃটিশের বহুদিনের আশংকা। সে আশংকার কারণ আগেই বলা হয়েছে। এশিয়ায় স্বাধীন বৃহত্তর শ্যাম রাষ্ট্র গড়ে ওঠে এ কোন সাম্রাজ্যবাদ সহ্য করতে পারে না।

বৃটিশের দাবী পরে আংশিক পরিবর্তন করে শ্যামকে মেনে নিতেই হয়েছে। পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়ে শ্যামের কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। বৈদেশিক কর্তৃত্বের সড়ক দিয়ে বৈদেশিক মূলধন এবং রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে নিয়ন্ত্রণের দুর্নীতি শ্যাম কতখানি রুখতে পারবে সে ভবিষ্যতই বলতে পারে। এশিয়া ভাল করেই জানে যে, বৃটিশ ফরাসী ডাচ ও আমেরিকান পুঁজিবাদ যে দেশে মূলধন খাটাতে পেরেছে সে দেশের মানুষের

মেদমজ্জা তারা শুষে খেয়েছে। জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র দরদ তারা দেখায়নি কোনদিন।

সুতরাং ইতিহাসের অভিজ্ঞতা শ্যাম কোন দিন ভুলবে না। বৃটিশ সামরিক কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে শ্যামকে আত্মগঠনমূলক পরিকল্পনায় ব্রতী হবার সুযোগ দিতেই হবে মিলিত জাতিপুঞ্জকে। বর্মার সীমানায় স্বাধীন প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্র নিরাপদ বলে মনে করে না বৃটিশ কিন্তু সে তার দুরভিসন্ধি ভিন্ন আর কিছুই নয়। শ্যামকে একুশ দফা অপমানকর সর্ত দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দুষ্ট ক্ষতেরই পুঁতিগন্ধ ছড়িয়েছে সুস্থ আবহাওয়ায়।

নূতন প্রধানমন্ত্রী সেনি প্রামোজ, সহপ্রধান মন্ত্রী আদুল ভেজারাস এবং সর্বজনপ্রিয় নেতা প্রাদিত মনুধরম জনমতের শ্রদ্ধেয়। দুনিয়ার সকল দেশেই এঁদের খ্যাতি ও সততার সুনাম আছে। এঁদের হাতে শ্যাম আত্মরক্ষামূলক অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারবেই।

ফরাসী ভিসি সরকারের প্রতিভূ ইন্দোচীনে যে সর্বনাশকে মেনে নিয়েছিল তারই দাম শ্যামকে দিতে হয়েছে অনেক। চার বছরে জাপান শ্যাম থেকে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিষ নিয়ে গেছে প্রায় ৬০ কোটী ডলার মূল্যের। পুরাণো রাজতন্ত্র থেকে মুক্তি নিয়ে শ্যাম যে ভাবে তার অর্থনীতির কাঠামো তৈরী করেছিল অনেক পরিশ্রমে—তা ধ্বসে পড়বার মত অবস্থা হয়েছে আজ। সে তার চরম ক্ষতি। শ্যাম বৃটিশ আমেরিকার সংগে যুদ্ধ করেনি। বৃটিশও শ্যামকে মুক্ত করেনি। নিজের জাতীয় বলিষ্ঠতায় শ্যামই নিজের দুঃস্বপ্নের রাত্রিকে প্রভাত করিয়েছে।

শ্যামের বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী ও পরিষদে জাপতোষণকারী কিছু কিছু লোক আছেন। কিন্তু মিত্রশক্তির নির্দেশ অনুযায়ী শ্যাম আবার নূতন করে নির্বাচন করতে সম্মত আছে।

অবশ্য ডাচ, বৃটিশ ফ্রান্স অথবা অন্য কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাছে কোন যুক্তিই কিছু নয়। তাদের একমাত্র যুক্তি পর রাজ্য শোষণের নিরুপদ্রব সুবিধা। ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, মালয়ে,

বর্মায় এবং ভারতবর্ষে পুঁজিবাদীদের একই সদম্ভ অভিনয়। তার মধ্যে বৃটিশের অন্যতম পার্ট। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ তার একচ্ছত্র অধিকার বিস্তৃত করতে চায়। শ্যামকে কবলিত করলে সে শোষণের পরিমাণ ফেঁপে উঠবে।

অথচ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একমাত্র শ্যামেরই পশ্চিমি বিদ্বেষ ছিল সবচেয়ে কম। আজকের দুর্দিনে শ্যাম যদি বৃটিশের কবলিত হয় তবে আরো দেড় কোটী মানুষের চরম আক্রোশের আগুন নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলবে। অবশ্য বৃটিশের দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদ যুক্তির পরোয়া করে না।

বিপুল সংগ্রামকে বৃটিশ-মার্কিনী কূটনীতি যতই দুর্নাম দিক দেশের চরম দুর্দিনে তিনি যে তার দেশকে অকারণ রক্তক্ষয় থেকে বাঁচিয়েছেন তা' অস্বীকার করা যায় না। প্রাদিত ও তার সহকর্মীদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে শ্যামকে নূতনভাবে গড়ে ওঠবার সুযোগ দেবার ছল করে মার্কিন-বৃটিশ শোষণ নীতি শ্যামের স্বাধীনতার ভিত্তিতে অপ্রত্যক্ষ ফাটল ধরাবার চেষ্টা করছে।

ইন্দোচীন

ফরাসী কলোনী ইন্দোচীনের ভৌগলিক অবস্থান এখনও গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরে চীন, পশ্চিমে বর্মা ও শ্যামের সীমান্ত। পূর্ব ও দক্ষিণের বিস্তৃত তীরভাগ চীনা সমুদ্র ও শ্যাম উপসাগরের জলধৌত।

ইন্দোচীনের ভূভাগের উচ্চতা সমুদ্র থেকে কোথাও বা দশ হাজার ফীট, কোথাও বা সমতল ও জলাভূমি সমুদ্রের সংগে সমান হয়ে এসেছে। য়ুনানের বলিষ্ঠ পর্বতমালা দক্ষিণে কামরাণ উপসাগর অবধি ইন্দোচীনের মেরুদণ্ডের মত বিস্তৃত। পূর্ব উৎরাইয়ের খাড়া পর্বতগাত্র থেকে নেমে এসেছে আনামের দুরন্ত ছোট ছোট নদীগুলি। কোথাও বা পাহাড় শ্রেণী সমুদ্রের এত কোল ঘেঁসে এসেছে যে সমতলভূমি অদৃশ্য। পশ্চিম গায়ের খাড়াই অপেক্ষাকৃত কম। এই দিকেই পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে এসেছে মেকংয়ের অধিত্যকায়। এ ভিন্ন বিচ্ছিন্ন পর্বতশ্রেণী ইন্দোচীনের দক্ষিণ পশ্চিম এলাকায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এদের নাম—কারডামমৗস ও এলিফ্যাণ্ট চেন্‌স।

সমগ্র ইন্দোচীনের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মেকং। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নদী। কম্বোডিয়া এবং কোচীন-চীন এই মেকং নদীর

লালিত। উত্তরে টনকিং'র ধমনীতে বইছে রেড, ব্ল্যাক ও ক্লীয়ার নদীর প্রাণস্রোত। উত্তরের ব-দ্বীপটি রচনা করেছে এই তিনটি নদী—শাখানদীর সমন্বয়ে।

এইসব পাহাড়ের উচ্চতা আর পর্বতকন্যাদের স্নেহে ইন্দোচীনের স্বাস্থ্য হয়েছে অনুপম—ভূমি হয়েছে উর্বরা।

ইন্দোচীন ইউনিয়ন পাঁচটি ভূখণ্ডের সমন্বয়। শেষ উত্তরে টনকিং। শেষ দক্ষিণে কোচীন-চীন এবং টনকিং'র মধ্যবর্ত্তী এলাকায় আনামাইট পর্বতশ্রেণীর পূর্বপ্রান্তে আনাম। এই তিনটি প্রদেশই আনামী এবং এদের শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য কৃত্রিম-ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। আনামের পশ্চিমে লাওস। পূর্বে চীন সাগর। কোচিন-চীন আনামের দক্ষিণে পেঁৗছে গেছে কম্বো-ডিয়ার পূর্ব সীমান্তে। কম্বোডিয়াকে ঘিরে উত্তরে ও পশ্চিমে স্বাধীন শ্যাম—শ্যাম উপসাগরে কম্বোডিয়ার তীরভূমি। লাওস জল অবধি পেঁৗছায় না। উত্তরে ও পশ্চিমে চীন, বর্মা ও শ্যাম। পশ্চিমে আনাম—দক্ষিণে কোচিন-চীন।

চীন ও ইন্দোচীনের মধ্যে প্রকৃতির দরজা খোলা। চীনের দক্ষিণের পর্বতশ্রেণী টনকিং এবং লাওস অবধি পাহাড় পথ খুলে রেখেছে। তা ভিন্ন লাল নদী য়ুনানের ভূমিকে সরস করে বহে গিয়েছে টনকিংয়ের পথ ধরে। ইন্দোচীনের উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পর্বতপথ খুলে রেখেছে চোরা কারবারীদের জন্য।

বর্মা ইন্দোচীন সীমান্ত মেকংয়ের জলপথে একশ' মাইল। এখানে ডিঙি দিয়ে পারাপার করা চলে।

শ্যাম ও ইন্দোচীনের সীমান্ত রেখাও মেকংয়ের জলধারা। এই সীমান্ত দিয়েও ইন্দোচীনের খনিজসম্পদ দুর্নীতির পথ পায় শ্যাম রাজ্যে। ফরাসী কর ঠকিয়ে যাওয়া চলে।

ইন্দোচীনের ভূমির উর্বরতা কম নয়। এখানে মাটি শস্যশালিনী, বন ঘন ও প্রচুর। সারা ভূমিভাগের অর্দ্ধেক ভরে আছে অরণ্য সম্পদ। এইসব বনের কাঠে তৈরী হয় জাহাজ। সাম্প্রতিক

জাপানী অধিকারের সময় এইসব প্রাচীন বনস্পতির বনেদীয়ানা এইবার খণ্ডিত হয়েছে। ইন্দোচীনের অরণ্যে জন্তু সমাবেশও প্রচুর। শান্তির সময় বিদেশী শিকারীরা ইন্দোচীনের তহবিলে কম টাকা দিয়ে যায় না।

আবহাওয়া এখানে বর্ষাপ্রবণ। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি টনকিংয়ে আসে শীতকালীন বর্ষণ। সংগে সংগে চলে উত্তরে হাওয়া। কোচিন-চীনে শেষ নভেম্বরে নামে বর্ষা। বাতাস তীরভাগের সমান্তরালে ছুটে চলে। গ্রীষ্মবর্ষণ স্বুরু হয় জুনে। টনকিংয়ের ভূভাগে বাতাস যায় দক্ষিণ-পূর্বে—কোচিন-চীনে হাওয়ার বেগ আসে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। ইন্দোচীনের আবহাওয়ার উত্তাপও অক্ষাংশ ও উচ্চতার কারণে বিভিন্ন। সারাবৎসরের বৃষ্টিফলও এলাকা অনুযায়ী বিচিত্র। তবু ইন্দোচীনে বর্ষা নামে প্রচুর। সায়গনে ৮১ ইঞ্চি অথচ টনকিংয়ে মাত্র ৭। কার্ডামমী এবং এলিফ্যাণ্ট পর্বতের বর্ষা জমায় ২১৪ ইঞ্চি জল। ইন্দোচীনের তীরে তরংগ-বাত্যা নির্দয়। জুলাই থেকে নভেম্বর এই কাল তীরপ্রান্তে সমুদ্রের আক্রোশ বয়ে আনে। আনামের তীরে এই আক্রোশ সবথেকে নির্মম। রেলপথ এবং জলপথ বিনষ্ট করে, জেলেডিঙি গুঁড়িয়ে সমুদ্রের লবণভাগ বদলে দিয়ে এই তরংগবাত্যা ফিরে আসার জন্য শান্ত হয়।

ইন্দোচীনের প্রাকৃতিক বাধা দেশের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বাসিন্দাদের মধ্যে মোটামুটি চার ভাগ। আনামাইট, কম্বোডিয়ান, লাওসিয়ান এবং আদিম অধিবাসীদের শংকর জাতি।

পর্বতশ্রেণীর উত্তর ও পূর্ব এলাকায় থাকে আনামাইটরা। সমগ্র ইন্দোচীনের ২·৩ কোটী লোকের মধ্যে আনামাইটরা ১·৬ কোটী। আনামাইটদের ইতিবৃত্ত চলতি কালের ইতিহাসে চাপা পড়ে গিয়েছে। টনকিংয়ের সড়ক দিয়ে এরা এককালে তিব্বত থেকে চলে এসেছিল। এককালে যাযাবর এরা চীনা সম্রাটের বিজয় শকটের তলায় মাথা না দিয়ে এই ব-দ্বীপের সমতলে এসে চাষী হয়। তবু খ্রীষ্ট জন্মের

দু'শতাব্দী আগে চীনা বিজয় অভিযানের কাছে আনামাইটরা মাথা নামায়। চীনা সভ্যতা মানুষগুলিকে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল। আজ যা দক্ষিণ আনাম সেইখানে সমসাময়িককালে চামদের বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। চামরা ছিল মুসলমান কিন্তু তাদের সভ্যতা, কৃষ্টি ও ধর্মের মধ্যে হিন্দুসভ্যতার প্রাচুর্য। সমগ্র সাম্রাজ্যে গড়ে তুলেছিল তারা শ্রেষ্ঠ নগর। সাম্রাজ্য ছিল সমৃদ্ধ। খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম স্তবকে চামরা আনামাইট সীমান্তের দক্ষিণ দিক দিয়ে অভিযান চালায়। কিন্তু সে অভিযান শুধু যে ব্যর্থ হয়েছিল তা নয় এর ফলে চম্পা সাম্রাজ্যই নষ্ট হয়ে যায়। নবম শতকের মধ্যেই আনামাইটরা স্বাধীন হয়ে ওঠে বিদেশী চীনা তাঁবেদার শৃংখল ভেঙে। তারপর তারাই সুরু করে দক্ষিণ অভিযান। এ অভিযান চলে পুরা এক হাজার বছর ধরে। এ অভিযান রক্তাক্ত—এর চারি পাশে জমে ওঠে ধ্বংস আর অত্যাচার। শত্রু তখন পিছু হটে হটে অবশেষে আশ্রয় নেয় পাহাড়ে, জংগলে। এইসব মানুষ আজো বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে বেঁচে আছে। শুধু দক্ষিণে নয়, আনামাইট অভিযান পশ্চিম সীমান্ত ডিঙিয়ে মেকং ব-দ্বীপের কম্বোডিয়ানদের পরাভূত করে কম্বোডিয়ার গ্র্যাণ্ডল্যাক অবধি সাম্রাজ্য বিস্তার করে। আনামাইট সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সীমানা ঐ। এই সময় ফরাসী শক্তির আবির্ভাব। কম্বোডিয়া একদিকে আনাম শক্তি অপরদিকে স্বাধীন শ্যাম রাষ্ট্র—এই দুয়ের মাধ্যমিক হয়ে ফরাসী অধীনে কিছু কিছু হৃত ভূমি ফিরে পায়। এ পরিস্থিতির আগেই টনকিংয়ে চীনা সাম্রাজ্যবাদ আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এখানে ফরাসী শক্তি প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তটুকু বিবৃত করা প্রয়োজন। দূর প্রাচ্যে ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীনভুক্ত হয় কোচিন-চীন। ১৮৬০ সালে রাজধানী সায়গন অধিকার করে ফরাসীরা। প্রবল প্রতিরোধের পর বাধ্য হয়ে আনামাইট সম্রাট ফরাসীদের সংগে চুক্তি করে ঐ ভূখণ্ড তাদের হস্তান্তর করে। কম্বোডিয়ার পতন হোল ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্বিতীয় ধাপ। শ্যাম রাষ্ট্রশক্তির অধীন কম্বোডিয়া

এই নূতন প্রতীচ্য শক্তির শোষণের জন্য রক্তদানে লোভী হল। কম্বোডিয়ার রাজা ফরাসী সরকারের সংগে আত্মসমর্পণের চুক্তি করলেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের তাঁবেদারীর চেয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত শোষক শক্তির অধীনতায় মনের মাধুরীতে রঙ ধরল। শ্যাম রাষ্ট্র বাতাংবাং এবং আংকর অধীনে রাখতে পারল। অবশ্য ১৯০৭ সালে ফরাসী শক্তির চাপে শ্যাম এ দুটি জায়গাও ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৪১ সালে আবার জাপানী শক্তির চাপে এবং শ্যাম ও ফরাসী সরকারের মধ্যে যুদ্ধের ফলে শ্যাম রাষ্ট্র বাতাংবাং প্রদেশ, সিসিফোন, শ্যামরীপ এলাকার কতকাংশ ফিরে পেয়েছে। আনাম সম্রাট ফরাসী অধীনে আসেন ১৮৭৪ সালে। টনকিংয়ে চীনা প্রভুত্ব বহুদিন অক্ষত থাকবার পর দীর্ঘ আলোচনা ও অঘোষিত যুদ্ধ অবস্থার মধ্যে ফরাসী সরকার যখন টনকিংয়ের রাজধানী হ্যানয় অধিকার করে তখন চীনা সরকার চুক্তি সম্পন্ন করতে বাধ্য হন। এই সময় লাওস কয়েকটি খণ্ড রাজ্যের সমষ্টি হিসেবে শ্যাম সরকারের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। ১৮৯৩ সালে ফরাসী সরকার সমগ্র মেকং উপত্যকায় তাদের কর্তৃত্ব দাবী পেশ করে সৈন্য প্রেরণ করলেন। ইন্দোচীনের পঞ্চম অংশটি ফরাসী অধীনতায় স্বস্তি পেল। কেবল লুয়ং এবং তার সম্রাট সাজ খুললেন না—'খেলনা সম্রাট' হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন।

ইন্দোচীনের এই পাঁচটি অংশ একভাবে শাসিত হয় না। শোষণ ব্যবস্থা এক হলেও শাসনের ধাপ্পাবাজী বিভিন্ন।

কোচিন-চীন কলোনী—সুতরাং তার সর্বকর্তৃত্ব মূল ফরাসী সরকারের। গভর্ণর আছেন, মন্ত্রণা পরিষদ আছে—একটি কলোনীয় সংসদ আছে। ফরাসী নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি একজন ফরাসী পার্লামেন্টের ডেপুটী।

কম্বোডিয়া ফরাসী আশ্রিত দেশীয় রাজ্য। এখানে থাকেন সপারিষদ চীফ রেসিডেন্ট। কম্বোডিয়ার রাজা আইন খসড়া করেন কিন্তু চীফ রেসিডেন্ট সে খসড়ায় সই না দিলে তা' চালু হতে পারে না। এমনই সার্বভৌমত্ব সম্রাটের!

আনামও আশ্রিত রাজ্য। তার শাসন ব্যবস্থাও অনুরূপ। আনাম সম্রাট স্থানীয় জনসাধারণের আত্মিক গুরু এবং ঘরোয়া ব্যবস্থার কর্তা।

টনকিং এবং লাওসের শাসন ব্যবস্থাও অনুরূপ।

ফরাসী সরকারের নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাটের কাছে এইসব গভর্ণর বা ছোট লাট এবং চীফ রেসিডেন্টদের কৈফিয়ৎ দিতে হয়। বড়লাটের অধীনে দুটি পরিষদ। এক মন্ত্রী পরিষদ আর একটি ইন্দোচীন পরিষদ।

এইসব শাসনতান্ত্রিক অসাদৃশ্য থাকলেও সমগ্র কলোনীতেই ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালু। ইন্দোচীনে কয়েকটি আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানও আছে যার সদস্যদের মধ্যে ফরাসী ছাড়াও স্থানীয় লোকেরা থাকতে পারে। এর মধ্যে গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রণা পরিষদ হিসেবে অর্থনৈতিক পরিষদ অন্যতম। এইসব পরিষদেরও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

পূর্বে ইন্দোচীনারা সরকারী চাকুরীতে উর্ধতন পদ পেতে পারত না তার ফলে নানা বিক্ষোভ মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। আক্রোশ জমে উঠছিল জনসাধারণের জাগ্রত জনমতের ভিত্তিতে। এডমিরাল ডেক্যু বড়লাট হওয়ার পর থেকে ইন্দোচীনারা যোগ্যতা অনুযায়ী পদ পাচ্ছিল। অনেকে মনে করেন যে অধুনা ইন্দোচীনারা শাসন ব্যবস্থার যে কোন বল্গা হাত বাড়িয়ে ধরতে পারে, অবশ্য কলোনীর বাসিন্দাদের প্রত্যাশার ঔদ্ধত্যের সীমা না পেরিয়ে।

১৯৩৬ সালের আদম সুমারীতে প্রকাশ যে ইন্দোচীনে সমগ্র জনসংখ্যা ২'৩ কোটী। সে সংখ্যার হিসেব নিম্নমত।

আনাম	১'৬৮০
কম্বোডিয়ান	'২৯২
লাওসিয়ান	'১০০
আদিম বাসিন্দা	'২০০
চীনা	'০৩২
য়ুরোপীয়	'০০৪

বাকী অন্যান্য এশিয়াবাসী। য়ুরোপীয় ফরাসীর সংখ্যা ৩৯,০০০ হাজার। এরমধ্যে ১৪,০০০ হাজার হয় সামরিক বিভাগে নয়ত শাসন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য দপ্তরে নিয়োজিত।

চীনা সভ্যতার আওতায় এসে আনামাইটরা সম্পূর্ণ চীনাতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। দৈনন্দিন জীবনে, ধর্মের আচরণে, বেশ ভূষায় এবং সামাজিকতায় তারা সম্পূর্ণ চীনা কেবল ভাষাটি চীনা নয়। অবশ্য তার বর্ণমালা চীনা এবং ভাষার গণ্ডীও ছোট। ফরাসী সরকার সেই চীনা বর্ণমালা বরবাদ করে নূতন রোমান লিপি চালু করেছেন। তার নাম—Quoc Ngu.

আনাম রাজাকে গুরু বলে পূজা করা হয়। তিনি মহামহিম চীনা সম্রাটদের বংশধর হিসেবে সম্মানিত এবং তাঁর আখ্যা হোল 'ড্রাগণের পুত্র।'

আনামরা মোটামুটি নাতিদীর্ঘ কিন্তু তারা শক্তিধর ও সুগঠিত। দেহ গঠনে খাঁটি মঙ্গোল শ্রেণী। বুদ্ধিমান জাতি এরা। শিক্ষার প্রতি এদের অনুরাগ প্রবল। দেশে বিপুল জন বাহুল্যের চাপে পড়ে এরা পরিশ্রমী হ'তে বাধ্য হয়েছে। 'হয় পরিশ্রমী হও নয়ত কপালে অনশন'—এই হোল ধুয়া এখানকার। আনামরা জলসেচ ব্যবস্থায় ওস্তাদ। দেশের ধান জমিতে যেভাবে জল সেচনের ব্যবস্থা করেছে তা' সমগ্র জগতের বিস্ময়।

এককালে এরা যাযাবর জাতি ছিল। কিন্তু বহুকাল সমুদ্র এলাকার সমতলে বাস করে এরা পাহাড়ের খাড়াই উৎরাইকে অপছন্দ করতে শিখেছে। পাহাড়ের গোড়ালির উপরে এদের বাস নেই বললেই চলে। ব-দ্বীপের মুখে বাস করার লোভের ফলে আনামদের মধ্যে জনতার চাপ পড়েছে। টন্‌কিংয়ে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা ১৫০। কোচিন-চীনের জন বসতিও তেমনি ঘন। আনামের সরু ফালির মত উর্বর জমির জন্য সেখানে এই ঘনত্ব ৭৬। অপর দিকে পাহাড়ী এলাকা লাওসে এই ঘনত্ব মাত্র ৮।

কম্বোডিয়ান আর লাওসিয়ানরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ হলেও তারা

ভারতীয় কৃষ্টির বাহক আজো। একদা পররাষ্ট্রলোলুপ কম্বোডিয়ানরা মেকং উপত্যকা দিয়ে তাদের বিজয় অভিযান চালিয়ে বদ্বীপ থেকে চামদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক কাল থেকে এইসব এলাকায় ভারত থেকে বারে বারে এসেছে ভারতীয়েরা। এনেছে ভারতের সংস্কৃতির আলো। আংকরের মন্দিরগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিদর্শন। অষ্টম শতকে তিব্বত ও চীন থেকে এল বৌদ্ধ প্রভাব। হিন্দু ধর্মের প্রভাব স্তিমিত হয়ে এল। কিন্তু এরও পরবর্তীকালে সিংহল থেকে শ্যামের পক্ষে বৌদ্ধধর্মের ভারতীয় সংস্করণ কম্বোডিয়ার ধর্মমতকে জাগ্রত করে তুলল। ভারতের সংস্কৃতি তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করল। ইতিহাসের স্তরে স্তরে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের এই চলস্রোত আজো তার নিদর্শণ রেখেছে। তাই আজো দেখা যায় বৌদ্ধ মন্দিরের পার্শ্বেই চতুর্মুখ মহাদেবের ধ্যানাসন।

কম্বোডিয়ানদের পূর্বপুরুষরা জ্ঞান ও শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের যে শীর্ষে আরোহণ করতে পেরেছিল সাম্প্রতিক কালে তাদের সে শ্রেষ্ঠত্ব আর নেই। শরীর গঠনে কম্বোডিয়ানরা ইন্দোনেশিয়ান। এরা আনামদের চেয়ে দীর্ঘাকৃতি। এদের গায়ের রঙ কালচে—অধিকাংশক্ষেত্রে এদের চুল তরংগায়িত। এদের সংগে আনামদের সর্বমুখী ভিন্নতা। আনামদের চীনা পরিধানের সার্বজনীনতার বৈসাদৃশ্যে এরা কাপড় কোমরে পাক খাইয়ে পিছনে টান দিয়ে গুঁজে দেয়। পুরুষেরা গায়ে দেয় আঁট জ্যাকেট। মেয়েদের গায়ে কাঁচুলি আর ওড়না। কম্বোডিয়ানদের ভাষা আনামরা বোঝে না। সে ভাষার সংগে সাদৃশ্য বর্মার মন্‌ভাষা এবং ভারতের মুণ্ডা।

কম্বোডিয়ান-আনাম সম্প্রীতি কম। দু' শ্রেণীর মধ্যে আনামরা শক্তিশালী এবং ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা অগ্রগামী। কম্বোডিয়ানদের সংগে চীনা মৈত্রী বরং ঘনিষ্ঠ।

লাওসিয়ানরা তিব্বত এবং চীনের পূর্বতন বাসিন্দা। এরা সংখ্যায় অল্প। তাই হয় কম্বোডিয়ান নয়ত আনাম শাসনে ইতিহাসের

পৃষ্ঠা উলটেছে। এদের ভাষার সাদৃশ্য শ্যামের সংগে। তাদের ধর্ম পূর্ব পুরুষ পূজা, একেশ্বরবাদ। বৌদ্ধ এবং অন্যান্য নানা শ্রেণীর সংস্কারে আবদ্ধ এদের জীবন।

কাজেই দেখা যায় ইন্দোচীনের নানা শ্রেণীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অগ্রগতির ধাপ এক নয়। তবু সমগ্র ইন্দোচীনে সংখ্যা গরিষ্ঠ আনামদের সম্মিলিত জাতীয়তাবোধ বাকী সব অনগ্রসরতাকে ম্লান করে রেখেছে। আনামরা তীক্ষ্ণ জাতি। ইতিমধ্যেই রবার চাষ এবং ধানক্ষেতের জল সেচনের ব্যাপারে তারা যেভাবে এগিয়ে চলেছে তা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়।

জাতীয়তাবাদ

রক্তাক্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়েই ইন্দোচীনের ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠা। অধীনতার সুরু থেকেই দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন চলে আসছে। ১৯৩৬ সালে 'চক্রান্ত যুগ' সুরু হয়ে প্রাকযুদ্ধ বৎসর অবধি বেগবান ছিল। প্রতি আন্দোলনেই ফরাসী সরকার আনামদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালিয়েছে। সমুদ্র তীরের অদূরে পুরাণো কোনডোরের বন্দীশালায় আনামদের জাতীয় আকাংখার প্রতীকরা নির্বাসিত হয়েছে। হ্যানয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সংগে সংগেই শিক্ষিত শ্রেণীর আনামরা সেটিকে রাজনৈতিক ঘাঁটি করে তুলেছিল। আন্দোলনের সুরুতেই ১৯০৮ সালে ফরাসী সরকার এ বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেয়। মোটামুটিভাবে এই স্বাধীনতা আন্দোলন আনামদের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন —কম্বোজীরা এ আন্দোলন সম্বন্ধে উৎসুক নয়। কেবল শাসক ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধেই নয়, সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী চীনাদের বিরুদ্ধেও এই আন্দোলনের ফণা উদ্যত হয়ে উঠেছে। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল অবধি ধর্মঘট, প্রকাশ্য বিদ্রোহ চালিয়েছে জনসাধারণ। ছাত্রদের দাবীও প্রবল হয়ে উঠেছে। ১৯২৯ সালে জাতীয়তাবাদী আনাম সংসদ তৎকালীন গভর্ণর Pasquiurকে

(লাইফ)

পথের ধুলায় নাপিতের দোকানের সামনে লুটিয়ে পড়ে আছে খণ্ডযুদ্ধে নিহত আনামীর প্রাণহীন দেহ।

জাপ সেনাপতি জেনারেল নিউমাটা সাইগণে ব্রিটিশ-বাহিনীর গুর্খাদে সদর কার্য্যালয় থেকে ফিরছেন। জার্ম্মেনী, ইটালী ও জাপানে মি অক্ষশক্তির মতো দক্ষিণ-পূর্ব্বএশিয়ায় জনসাধারণের স্বাধীনতার আন্দো দাবিয়ে রাখতে ব্রিটিশ, ফরাসী ও জাপানীদের মধ্যে এক ত্রিশ মিতালীর উদ্ভব হয়েছিল।

(লাইফ)

হত্যার ষড়যন্ত্র করে। সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় কিন্তু নিহত হন শ্রমিক সংসদের কর্তা বেজিন। ১৯৩০'র ফেব্রুয়ারীতে ইয়েন উপসাগরে প্রথম সুরু হয় বিদ্রোহ। নৌ-সেনারা ছ'জন অফিসারকে হত্যা করে। তারপর সেই বিদ্রোহ সংক্রামিত হয় সারা দেশে। ১৯৩০ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির পত্তন হয় এখানে। এবং তাদেরই পরিচালনায় দেশে ব্যাপক আন্দোলন ও কিষানদের বিক্ষোভ জেগে ওঠে। ফরাসী সরকার নৃশংস অত্যাচারের ভিতর দিয়ে ইন্দোচীনের আকাংখাকে গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। প্রতিহিংসায় দমনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ফরাসী সরকার গ্রামাঞ্চলে বিমান হানা চালিয়েছিল। শাসক শক্তির আক্রোশের ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অবশেষে দমন মূলক ব্যবস্থার নির্দয়তায় মুক্তি সঙ্ঘ প্রকাশ্য থেকে গুপ্ত হয়ে আত্মরক্ষা করে।

এদিকে ফরাসী সরকারের দমনমূলক ব্যবস্থার ভৈরবরূপে ফ্রান্সেই কঠোর সমালোচনা সুরু হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কয়েক বৎসর পূর্ব থেকেই ইন্দোচীনারা শাসন পরিষদের দিকে নজর দেয়। ইন্দোচীনের শাসন পরিষদ, মিউনিসিপ্যাল এবং অন্যান্য রাষ্ট্রিক ও প্রাদেশিক কর্মক্ষেত্রেও তারা প্রবেশ করা সুরু করে।

১৯৪০ সালে আবার মুক্তি সেনানীরা সশস্ত্র আক্রমণ চালায় ইন্দোচীন সেনাবাহিনীর উপর সায়গনে। কিন্তু ইন্দোচীন বাহিনীর হাতে তারা ধরা পড়ে। সায়গনের একশ মাইল পরিধির মধ্যে টনকিংএ এবং কোচিন-চীনে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিস্তৃত হয়। নানা ঘাঁটিতে বিদ্রোহ ও জনবিক্ষোভ মাথা জাগায়। এইসব বিদ্রোহ দমন করতে প্রতিদিন বিমান হানা চলতে থাকে। কেবল এটুকু এলাকায় এক হাজার বিপ্লবী ইন্দোচীনাকে গ্রেপ্তার করা হয়। টনকিংয়ে জাপানী কবলিত এলাকায় বিদ্রোহ রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ে। বিদ্রোহ দমনের জন্য মূল ফরাসী সৈন্য পাঠানো হয়। জাতীয়তাবাদী আনাম সংঘ জাপানী প্রতিরোধের সংকল্পধারী। তারাই

ইন্দোচীনের স্বাধীনতার উদগাতা। তারাই পরাধীন ইন্দোচীনের শহীদদের প্রতিষ্ঠান। এ সংঘের মূলঘাঁটি চীনে।

বৈদেশিক বাণিজ্য

কলোনী। ফরাসী সরকারের শাসন। সুতরাং ইন্দোচীনের অর্থ-নৈতিক কাঠামোর ভিত্তি ধারণ করে আছে ফরাসী সরকার এ কথা বলাই বাহুল্য

যুদ্ধের পূর্বে চীন জাপান ফ্রান্স ও অন্যান্য ফরাসী উপনিবেশের সংগে ইন্দোচীনের বাণিজ্যিক হার ছিল নিম্নধরণের।

	ফ্রান্স ও অন্যান্য উপনিবেশ	হংকং	জাপান
রপ্তানী	৫৩%	৯.৬%	৩.১%
আমদানী	৫৬%	৭.৪%	২.৯%

কেবলমাত্র ফরাসী নাগরিক অথবা কোম্পানীতে অধিকাংশ শেয়ার হোল্ডার ফরাসী ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া অধিকার কেউ পাবে না এমনিভাবে ফরাসী সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এ ভিন্নও নানাভাবে ফরাসী সরকার তার অর্থনৈতিক শুল্কতাকে দুর্ভেদ্য করে রেখেছিল। বহুবর্ষ ধরে ফরাসীরা এখানে রবার চাষের একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ন রেখেছে বিশেষ করে কোচিন-চীনের দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে।

১৯৩৮ সালে সমগ্র ইন্দোচীনে বৈদেশিক প্রযুক্ত ধনের শতকরা পঁচানব্বুই থেকে সাতানব্বুই ভাগই ফরাসীদের। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ সালের গড়পড়তা লভ্যাংশ এসেছিল শতকরা সাত ভাগ। তা ছাড়া ইন্দোচীনের আমদানী ও রপ্তানীর হারে ফরাসী সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব অটুট। উপনিবেশের আমদানীর শতকরা ৫৩.৩ এবং রপ্তানীর শতকরা ৪৯.৭ ভাগ ফরাসী সরকারের। এর কারণ শাসন শক্তির আত্মরক্ষা। কলোনীতে বৈদেশিক আমদানীর উপর যে শুল্ক মূল ফ্রান্সে আমদানীরও হার ঠিক তাই। তার অর্থ, ফরাসী উৎপাদক ও পরিবেশকের পক্ষে নিজ বাসভূমেও যে সব সুবিধা শাসিত

কলোনীতেও তার ব্যতিক্রম নেই। কাজেই কলোনীর বাসিন্দা বা অন্যকোন বৈদেশিক শক্তির পক্ষে উচ্চ কর হার দিয়ে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা সম্ভব নয় এখানে।

১৮৮০ সালে ইন্দোচীনে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে ফরাসী সরকারের চেষ্টা হোল দক্ষিণ চীনে প্রসার। চীনের দক্ষিণতম প্রদেশ য়ুনানের সংগে যুক্ত রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে চলতি শতাব্দীর স্নুরুতেই ফ্রান্সের সে চেষ্টা কিছুটা সফল হোল। মূল ইন্দোচীনের অন্যতম রেলওয়ের তুলনায় য়ুনান-ইন্দোচীন রেলওয়ে ফ্রান্সের আর্থিক সঙ্গতি অনেক বাড়িয়ে তুলতে লাগল। ১৯৩৭-৩৯ সালে জাপান যখন চীনের উপকূল ভাগ সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলল তখন চীনের পক্ষে বহির্জগতের সংগে যোগসড়ক শুধু খোলা রইল এই ফরাসী কলোনীর খিড়কি দিয়ে। স্নুতরাং য়ুনান রেলওয়ের খাতে ফরাসী স্বার্থ ফেঁপে উঠতে লাগল। বিশেষ স্নুবিধা হোল ফ্রান্সের পক্ষে এই কারণে যে, সাংহাইয়ের ফরাসী স্নুবিধার (Concession) সংগে দক্ষিণ চীন সমুদ্র তীরবর্তী কোয়াংচোয়ানের ইজারা মিলে চীনা সরকারের ঘরোয়া রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ফরাসী সরকার বেশ কিছুটা অধিকার পেল। য়ুনান রেলওয়ে একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠানের হলেও ইন্দোচীনের সরকার এই রেলওয়ে নির্মাণের জন্য টাকা খাটিয়েছিল। রেলওয়ের কর্তৃত্ব কিন্তু ফরাসী সরকারের অফিসারদের হাতেই অধিকাংশ ছিল।

এ যুদ্ধে ফরাসী সরকারের পতনের পর স্থানীয় ফরাসী কর্তার ইচ্ছামত ইন্দোচীন শত্রুর রসদ ও সৈন্য যুগিয়েছে। গত মহাযুদ্ধে ইন্দোচীন ফরাসী সরকারের পক্ষে অর্থ ও লোক যুগিয়েছিল। হাজার হাজার শ্রমিক ও সৈন্য য়ুরোপের রণক্ষেত্রে প্রভু শক্তিকে বাঁচান'র জন্য জীবন পণ করেছে। ইন্দোচীন দুনিয়ার বাজারে দেনা করেছে—প্রভু রাষ্ট্রকে নানা উপঢৌকন দিয়েছে। এ যুদ্ধের পরিস্থিতি আরো ঘোরালো সে পরে বলা চলবে।

ইন্দোচীনে ফরাসী কর্তৃত্ব

এ কথা নিশ্চিত সত্য যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কলোনীগুলির কোনটিই জাপানী সমর লিপ্সাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে দোষ শাসক রাষ্ট্রগুলির। একক দেশ হিসেবে শত্রুর আক্রমণ রোধ করবার জন্য দেশের যে সব প্রস্তুতি প্রয়োজন কলোনীগুলির তার কোনটিই ছিল না। অথচ আশ্চর্য এই যে সে সব দেশে জনবল কম নয়—তাদের ভৌগলিক অবস্থান দেশের সাধারণ নিরাপত্তার প্রতিকূল নয়—যথাযথভাবে পরিকল্পনার দ্বারা আমদানী এবং রপ্তানীর ব্যবস্থা করলে সে সব দেশগুলি যুদ্ধ উপকরণ ও অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থার আয়োজন করতে পারত। তা ভিন্ন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এলাকাগুলি কিছু কিছু খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য যুদ্ধের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের বড় ভাঁড়ার। এইভাবে সেদেশগুলিকে যন্ত্র শিল্পে সমৃদ্ধ করে তুললে, দেশীয় সৈন্যবাহিনীকে যান্ত্রিক ও গতিশীল করলে এবং দেশের রাজস্ব যথাসম্ভব স্বাধীন রাষ্ট্রের মত আত্মরক্ষামূলক করে তুললে শাসক রাষ্ট্রের অত্যন্ত ভয়ের কারণ। কেন না এইসব এলাকায় শাসক রাষ্ট্র কোনদিনই সুশাসন চালায়নি। নিপীড়িত মানুষ কোনদিন কোন গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে যদি স্বাধীনতার ডাক শুনতে পায় তাহলে তারা আর কোনদিনই শৃংখল ফিরে পরতে চাইবে না। য়ুরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির এশিয়া শোষণের দিন অবসান হবে। সুতরাং ইন্দোচীনের অনেক কিছু থেকেও ইন্দোচীন সুদূর ফরাসী দেশের রক্ষাব্যবস্থার মুখ চেয়ে রইল। তবু কলোনী বাঁচাবার জন্য পূর্বোক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজনের গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। ফরাসী সরকারের উপনিবেশ সচিব জর্জ ম্যাণ্ডেল ১৯৩৮-৪০ সালে এইদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। কিন্তু সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জন্মভূমি ফ্রান্সের অধুনাতন শাসকবর্গ ও ম্যাণ্ডেল তার মতাবলম্বী চিন্তাশীলদের ব্যবস্থা মেনে নিতে পারলেন না। ১৯৩৯ সালে ইন্দোচীন বাহিনী দ্বিগুণ করা হোল। খতন তার সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল মোটামুটি পঞ্চাশ হাজার।

তবু এত স্বল্প সময়ে বিরাট পরিবর্তন গড়ে তোলা সহজসাধ্য নয়। য়ুরোপের রণক্ষেত্রে যখন আদি দানব বীভৎসতায় তোলপাড় সুরু করল তখন ইন্দোচীন সর্বদিক দিয়ে অপ্রস্তুত ও পিছিয়ে পড়া দেশ। মূল জনসংখ্যার শতকরা নব্বুই জনই গরীব চাষী। ছোট ছোট জমিতে তারা চাষ করে খায়। খাজনা আর কর্জের উচ্চ সুদ দিয়ে তারা এক একজন ভুখা ভগবানের প্রতীক।

যন্ত্র শিল্পের অগ্রগমনের দিনে প্রচুর খনিজ সম্পদ নিয়েও ইন্দোচীন সমৃদ্ধ হতে পারল না। এর কারণ শুধু যে দেশের ক্রয় ক্ষমতা অথবা নিপুণ শ্রমিক অথবা বিশ্বের বাজার অন্তরায় তা নয়— এর মূলে সেই আদি ভয় শোষক রাষ্ট্রের। ফরাসী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান চিরকালই কলরব করে এসেছে আরো রক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু ইন্দোচীনে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা কারখানা গড়ে তোলার বিরুদ্ধে তাদের অন্তহীন জেহাদ।

কৃষি ও অন্যান্য সম্পদ

ইন্দোচীন কৃষি প্রধান দেশ। জাতীয় অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে জমির ফসলে আর অরণ্যের সমৃদ্ধিতে। বৎসরে উৎপাদিত চালের পরিমাণ ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ টন। এ থেকে দেড় লক্ষ টন রপ্তানী করা চলে দেশের মুখে ক্ষুধার অন্ন দিয়েও। চাল ভিন্ন ভুট্টাজাতীয় শস্যও প্রচুর হয়। দেশের ভাণ্ডার পূর্ণ করে এ শস্য রপ্তানী হয়। সমুদ্র কূলবর্তী অন্যান্য গ্রীষ্মমণ্ডলের আবাদও হয় প্রচুর। তার মধ্যে লংকা প্রধান। ফরাসী শাসন এ দেশের মাটিতে দু'টি ফসল তৈরী করিয়েছে যার ফলে ইন্দোচীন বেশ লাভবান হয়েছে। কফি ইন্দোচীনের সফল ফসল। দুনিয়ার উৎপন্নাংশের শতকরা দশভাগ রবার জন্মায় ইন্দোচীনে। ১৯৩৮ সালে এই রবার রপ্তানী হয়েছিল ৫৮ হাজার টন। এবং তারপর উৎপন্নতার হার আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাছের ব্যবসা এবং লবণ তৈরী দুই-ই ইন্দোচীনে প্রচুর হয়। আনাম এবং চীনারা এই দু'টিতে প্রতিযোগিতা করে। মাছ

ধরার জন্য সর্বপ্রকার জলবাহনই ব্যবহার হয় অত্যন্ত ব্যাপক-ভাবে। বৎসরে মোটামুটি ৩৫ হাজার টন মাছ রপ্তানী হোত ইন্দোচীন থেকে।

এ ভিন্ন ইন্দোচীনের অরণ্য সম্পদের বিস্তৃতি এবং প্রাচুর্য বিশ্ব বিখ্যাত। সমুদ্রের জল অগভীর পুকুরে সূর্যের রুদ্র স্নেহে বাষ্পিত হয়ে লবণ রেখে দিয়ে যায়। কোচিন-চীন থেকে টনকিং অবধি সমুদ্র তীর এইসব লবণ তৈরীর ছকে খচিত হয়ে আছে।

খনিজ সম্পদে ইন্দোচীন শ্রীমন্ত। তার মধ্যে টনকিংয়েই প্রকৃতির দাক্ষিণ্য ভরে উঠেছে। প্রাকৃতিক বাধা এবং যন্ত্র শিল্পের অভাবের দরুণ ইন্দোচীন শুধু শোষক ও অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রকে কাঁচামাল সরবরাহ করেই সুখী। তার নিজের দেশের মানুষের হাতে রাষ্ট্রের বল্‌গা থাকলে ইন্দোচীন অবশ্য সেগুলি কাঁচামাল হিসেবে বিক্রী করার ক্ষতিকর ব্যবস্থা থেকে নিবৃত্ত হোত কিন্তু তা যখন সম্ভবপর নয় তখন—।

কয়লা হোল সমগ্র খনি সম্পদের শতকরা ৬৩ ভাগ। এইসব খনি সমুদ্র-তীরবর্তী সুতরাং টনকিং ব-দ্বীপের ঘন বসতির শ্রমিকদের সস্তা শ্রম এখানে কাজে লাগান হয়।

টিন যা পাওয়া যায় তার সবই কাঁচামাল হিসেবে সিংগাপুরে চালান হয়। খনিজ দস্তা কোয়াংরিয়েনেতে পরিশুদ্ধ ধাতুতে রূপায়িত হয়। যতটুকু যন্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছে তার উল্লেখ খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে করা চলে না। ১৯৩৯ সাল অবধি এক সাইগন চোলোন এলাকাতেই অন্যূন কুড়িটি চালের কল চলত। দেশব্যাপী এইসব চাল কলের কর্তৃত্ব চীনাদের। এখানে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে। তা ছাড়া চাল থেকে মদ এবং ঐ জাতীয় এ্যালকোহল তৈরী করার কলও আছে সহস্রাধিক। ১৯৩৩ অবধি এইসব আবগারী এবং চোলাই কারবার ফরাসী সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্বে ছিল। অধুনা কিছু কিছু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে।

আর আছে চিনি পরিস্কারের কল। দেশের প্রয়োজন তাতে

মেটে না। দেশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তৈরী হয় সিমেন্ট, সিগারেট, দিয়াশলাই। সাবানের কারখানাতেও কাজ চলে খুব।

যুদ্ধের ঘোরালো ইতিহাস

১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের জংগীবাদ মুখোস সরিয়ে ফেললে। ইন্দোচীনে জাপান যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল তার চরম রূপ ১৯৪৫'র মার্চের আগে আত্মপ্রকাশ করেনি। এই সময় সমস্ত ফরাসী শাসন ব্যবস্থা গোরে দিয়ে জাপান এখানে সার্বভৌম শক্তি নিয়ে যথেচ্ছাচার চালাতে লাগল। সামরিক কর্তৃত্ব নেবার পর থেকে ১৯৪৫ অবধি ইন্দোচীনে জাপানীরা শোষণ চালিয়েছে এবং ইন্দোচীনের রাজনীতিকে তাদের অনুকূলে এবং সমস্ত পাশ্চাত্য জাতির বিরুদ্ধে প্রবল করে তোলবার প্রয়াস পেয়েছে। মূল ফ্রান্সে জার্মানী যেমন ঘরোয়া শাসনের ব্যাপারে ভিসির উপর দায়িত্ব ছেড়ে নিশ্চিন্ত ছিল ইন্দোচীনেও তেমনি জাপান ভিসি মনোনীত শাসক রাষ্ট্রের হাতে ঘরোয়া রাষ্ট্রনীতির দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। ইন্দোচীনের ঘরোয়া জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ও গুরুত্ব তার একদিকে যেমন কমই ছিল তেমনি মিত্র জার্মাণীর অনুসৃত নীতি অনুসরণ করাই সে বেশী বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচনা করেছিল। আবার যুদ্ধের কঠিনতম সময়ে যখন জার্মাণী এই তাঁবেদারী শাসনের পরিবর্তন ঘটিয়ে সমগ্র ফ্রান্সে নিজের পুঁজীবাদ প্রতিষ্ঠিত করল জাপানও ১৯৪৫'র মার্চে ইন্দোচীনের সর্ব কর্তৃত্ব ভার তেমনি নিজের হাতে নিয়ে নিল।

ফ্রান্সের পতনের পর ১৯৪০'র জুন মাসে ইন্দোচীনের ভিসি সরকার জাপানের জুলুম মেনে নিয়ে চীনের পথে ইন্দোচীনের রেলওয়ের মাল আনাগোনার উপর নজর রাখার জন্য কিছু জাপানী সৈন্য মোতায়নে সম্মত হতে বাধ্য হোল। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে কলোনী সরকার আবার জাপানী সরকারের কাছে হাঁটু গেড়ে

বসল। টনকিংয়ে তিনটি জাপানী বিমান ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হোল। ৬ হাজার জাপানী সৈন্য ঐসব এলাকায় থাকবে এই চুক্তির ফলে প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য জমায়েৎ হোল। হাইফংয়ের কিছু দূরে জাপানী সৈন্যরা ঘাঁটি নিয়ে বসল। এ ছাড়াও চীন সীমান্ত অতিক্রম করে জাপানী সৈন্য ইন্দোচীনে প্রবেশ করল। সামান্য সংঘর্ষের পর ইন্দোচীনের ভিসি সরকার নিবৃত্ত হোল। অপর দিকে থাই সরকার ইন্দোচীন সীমান্তে যুদ্ধ ঘোষণা করল এই দাবী পেশ করে যে ফরাসী সরকারের হামলায় থাইল্যাণ্ডের যেসব এলাকা ইন্দোচীনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে। জাপানী সরকারের মধ্যস্থতায় ইন্দোচীন তার পশ্চিম সীমান্তের অনেকখানি জায়গা থাই সরকারের হাতে প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য হোল।

১৯৪১'র জুলাই মাসে জাপান সমগ্র ইন্দোচীনের কর্তৃত্ব হাতে নিল। ভিসি সরকার আভ্যন্তরীন শাসন চালাতে লাগল জাপানের খবর্দারীতে। পার্ল হারবারের পতনের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের বিজয় অভিযান চালানোর জন্য ইন্দোচীন গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসেবে কাজ করতে লাগল। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম কাঁচা-মাল, রসদ, সৈন্য এবং অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্য সম্ভার ইন্দোচীনের ভিসি সরকার জাপানীদের ধারে দিতে বাধ্য হোল। ইন্দোচীনে অবস্থানকারী জাপানী সৈন্যদের ব্যয় বহন করতে লাগল ফরাসী কলোনী ইন্দোচীন। এত সুবিধা ও অনুকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও জাপানীরা কিন্তু ইচ্ছামত রপ্তানী চালাতে পারেনি বেশী দিন। ফরাসী তাঁবেদারী সরকারের অনিচ্ছুক সহযোগিতা, জাপানী মালবাহী জাহাজের স্বল্পতা, ইন্দোচীনের যানবাহন, খনি ও কারখানা এলাকায় মিত্রশক্তির বিমানহানা এবং ইন্দোচীন বাসিন্দাদের জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে জাপান তার জংগী শোষণের হার বাড়াতে পারেনি। বিশেষ করে সমুদ্র এলাকায় এবং উত্তর ইন্দোচীনের কয়লা ও সিমেণ্ট অঞ্চলে এই বিমান হানার ফল প্রত্যক্ষ ক্ষতিজনক হয়েছে জাপানীদের। গোপন দপ্তরের সংবাদে প্রকাশ যে ১৯৪৩

সালে ইন্দোচীনের রপ্তানী সর্বসাকুল্যে দাঁড়িয়েছিল ১৬ লক্ষ টন। অথচ ১৯৩৭'র রপ্তানী ছিল ৪৪ লক্ষ।

জাপানীরা ইন্দোচীনের অসামরিক সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এই চুক্তির বিনিময়ে, কিন্তু সরবরাহ প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখতে পারেনি। ১৯৪৩'র আমদানী মোট ৭০ হাজার টন অথচ ১৯৩৭ সালে ইন্দোচীন আমদানী করেছিল ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টন। এর ফলে যুদ্ধের বৎসরগুলিতে ইন্দোচীনের বাসিন্দারা প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কোন মালই পায়নি। বরং বিমান হানায় এবং অন্যান্য কারণে ইন্দোচীনের সমূহ ক্ষতিই হয়েছে। ইন্দোচীনকে আবার প্রাকযুদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতেই বিরাট পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে।

টনকিংয়ের জমি তার দেশের ক্ষুধা মেটাতে পারে না। ১৯৪৪ সালে যানবাহনের অসুবিধার জন্য টনকিং খাদ্যাভাবের মধ্যে পড়ে যায়। ইন্দোচীনের বাজারে রবার জমা হয়ে ওঠে প্রচুর। জাপানীরা সে সব রবার চালান দিতে পারেনি। অথচ প্রচুর রবার থাকলেও যন্ত্রপাতির অভাবে সমগ্র ইন্দোচীনে যানবাহনের গুরুতর অসুবিধা দেখা দেয়।

অন্যান্য কলোনীর মত এখানেও মুদ্রাস্ফীতি হয়েছিল। রেশনিং এবং অন্যান্য ব্যবস্থা চালু করে সে স্ফীতিকে হ্রাস করার চেষ্টা আংশিক সফল হয়েছে।

এ্যাডমিরাল ডেক্যুর কূটনীতি

১৯৪০'র গ্রীষ্মকালে ফ্রান্সের ভিসি সরকার ইন্দোচীনের গভর্ণর জেনারেল করে পাঠাল এ্যাডমিরাল ডেক্যুকে। যুদ্ধের তমিস্রার অন্তরালে এই নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষের রাজনৈতিক জীবন যাপনের ধারাবাহিক বিবৃতি সব পাওয়া যায়নি বটে কিন্তু মোটামুটি সে জীবনের নীতি এই: এ্যাডমিরাল ইন্দোচীনের সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য জাপানী রাষ্ট্রের বশ্যতা মেনে

চলেছিলেন। যুদ্ধ-লক্ষ্মী যে রাষ্ট্রের গলায় বিজয়মাল্য দেবেন তার দিকেই হেলে দাঁড়াবেন এমনি কূটনৈতিক চাল দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। অথচ ইন্দোচীনে গোঁড়া ফরাসী আধিপত্যকে জিইয়ে রাখবার অক্ষুন্ন প্রচেষ্টা তার সব সময়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পার্ল হারবারের পতনের পর প্রশান্ত মহাসাগরের ফরাসী দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের উদ্দেশ করে এ্যাডমিরাল স্বাধীন ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য বক্তৃতা দিতে কসুর করেননি। এর অর্থ জাপানী অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষভাবে অক্ষশক্তির চূড়ান্ত বিজয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। অপর দিকে যুদ্ধের শেষ সময়ে যখন মিত্রশক্তির নিশ্চিত জয়লাভে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না তখন এ্যাডমিরাল সোজাসুজি জাপানী এবং সেই সংগে সমগ্র ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে তার বিষোদ্‌গার সুরু করলেন। একদিকে জাপানীদের জুলুমের কাছে আত্মসমর্পণ, অপরদিকে ইন্দোচীনকে কলোনী হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার এই দু'মুখী রাজনীতির সংবাদ জাপানী জংগী নীতি জানত। কিন্তু ইন্দোচীনের ঘরোয়া রাজনীতি নিয়ে জাপানীদের শক্তি ব্যয় করা প্রয়োজন হয়ে পড়েনি, কেননা জাপানীরা ইন্দোচীনের কাছে তাদের দাবীর সবটুকু নিঙড়ে নেবার সহজ উপায় জানত। বিশ্বশান্তির সময় ফরাসীদের নিকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থায় ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদ যেমন ক্ষুব্ধ আক্রোশে গন গন করছিল, যুদ্ধের মধ্যে জাপানী এবং ফরাসী দুই রাষ্ট্রের শোষণে জাতীয়তাবাদীদের আগ্নেয়গিরি আরো ভয়ংকর হয়ে উঠল। এ্যাডমিরালের পক্ষে এই জাতীয়তাবাদ দমন করার জন্য তেমনি দু'মুখো নীতি গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। জাপানীরা 'এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য' এই ধূয়া তুলে ফরাসী বিদ্বেষের অগ্নিতে যোগান দিচ্ছিল ইন্ধন, অপর দিকে রুদ্ধকণ্ঠ ইন্দোচীনের সূত্রধরের ভূমিকা নিয়ে ডেকু্য ১৯৪৪'র সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করলেন— 'ফরাসী উপনিবেশ সমূহের মধ্যে ইন্দোচীন আবার অন্যতম হয়ে প্রভু রাষ্ট্রের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে দৃঢ়-সংকল্প। নিজের সমস্ত শক্তি

নিয়ে সে ফ্যাসীবাদকে চূড়ান্ত আঘাত হানবার জন্য তৈরী হয়ে আছে উপযুক্ত লগ্নের দিকে তাকিয়ে……এই যুদ্ধের শেষে ফ্রান্স আবার শ্রেষ্ঠ শক্তি হয়ে উঠবেই'। এই সময় সায়গনের বেতারে ভিসি সরকার অথবা দ্যিগলের ফ্রান্সের উল্লেখে কোন বেসুর শোনা যেত না। ১৯৪৫'র ফেব্রুয়ারী ৬ই সায়গন বেতার দ্যিগলের গভর্ণমেন্টকে 'আমাদের নেতৃবৃন্দ' বলে ঘোষণা করলেন। অর্থাৎ এ্যাডমিরাল সমসাময়িক ফরাসী সরকারের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে আবার সুবোধ সুশীল হয়ে উঠল। অথচ ১৯৪০ সালে এই এ্যাডমিরালই ইন্দোচীনে দ্যিগলবাদীদের কারারুদ্ধ করতে দ্বিধা করেনি। পেঁতা সরকারের সংগে সহযোগীতা করে বেতার মারফৎ মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিল যে তারা ইন্দোচীনের বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর বিমান হানা চালাচ্ছে।

ইন্দোচীনাদের নিয়ে রাজনৈতিক জুয়া

জাপানী অধিকারের সবকটি বৎসরই ইন্দোচীনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলেছে। জাপানী সরকার এবং ভিসি সরকার যুগপৎ চেষ্টা করেছে তাদের ব্যবহারে, শাসন ব্যবস্থায় এবং রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজীতে ইন্দোচীনের জাতীয়তাবোধকে নিজেদের স্বপক্ষে জাগ্রত করার জন্য। জাপানী জংগীবাদ 'এশিয়া এশিয়াবাসীর' এ ধূয়া তুলেছে, জাতিগত সাম্যের কথা বড় করে দেখিয়েছে, জাপানী ভাষা সংস্কৃতি এবং শিল্পপ্রসারের জন্য চেষ্টা করেছে। সেই সংগে ফরাসী বিদ্বেষ বিষ ইন্দোচীনের রুদ্ধ আক্রোশী মনের ভিতর প্রবেশ করিয়েছে। ফরাসী সরকারের কাছ থেকে ঘরোয়া যত সামান্য সুবিধাই এসেছে তা যে জাপানী সরকারের চাপে—সে কথা বুঝিয়ে তাদের বিবেক বুদ্ধিকে জাপানী অনুকূল করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে কসুর করেনি।

অন্যদিকে ফরাসী সরকারের চেষ্টারও অন্ত ছিল না। তাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিজ্ঞতা ঘোরালো এবং অনেকদিনের। সুতরাং তাদের ধাপ্পাবাজীও আরো জটিল। শাসক রাষ্ট্র হিসেবে তাদেরও

চেষ্টা হোল কিছু কিছু পুরাতন ক্ষতে প্রলেপ লাগানো। ইন্দোচীন-বাসীদের সংগে সম্প্রীতির ভাবকে বৃদ্ধি করে তাদের মংগলের জন্য এবং এ পর্যন্ত ফরাসী সরকার তাদের কত মংগল করেছেন তার বিস্তৃত বিবরণ নজির হিসেবে দাখিল করে এবং ভবিষ্যত রাষ্ট্র গঠনে বৃহত্তর সুযোগ ও ধাপে ধাপে সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ইন্দোচীনবাসীদের মন ভেজাবার দুঃসাধ্য ব্রতে ব্রতী হোল। শাসক সরকারের প্রতিনিধিরা সারা দেশে ভ্রমণ করে এই সৌহার্দ্যের বীজ বপণ করবার চেষ্টা চালাতে লাগলেন।

সরকারী চাকুরীতে ইন্দোচীনারা অনুপাতে বাড়তে লাগল। প্রতিনিধি সংসদগুলিতে ইন্দোচীনারা অধিক সংখ্যায় আসনের অধিকার পেল। ১৯৪৩ সালের মে মাসে ইন্দোচীনের মিলিত সংসদ প্রতিষ্ঠিত হোল। ১৯৪০ সালে ভিসি সরকারের বরবাদ করা জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের পরিবর্তে এই নূতন সংসদ স্থাপিত হোল। পুরাতন নীতি পরিবর্তিত হয়ে এই নবতম সংসদে ইন্দোচীনারা হোল সংখ্যাগরিষ্ঠ। যদিও এ সংসদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধই রইল তবু এই পরিবর্তনকেই সায়গন বেতার ফ্রান্স-ইন্দোচীন সৌহার্দ্যের প্রাণধারা বলে অতিশয়োক্তি করতে ছাড়ল না।

জাপানী জংগীবাদ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে একটু তুলনামূলক সমালোচনার ফলে দেশের জাতীয়তাবোধ নিজেদের লক্ষ্যবিন্দুকে যেন আরো স্বচ্ছভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারল। জাপানীদের আত্মসমর্পণের ফলে আজ ইন্দোচীনের গণচেতনা স্বাধীনতার সংকল্পে আরো দৃঢ় হয়েছে। তারা নিজেদের ক্ষমতাতেও অধিক বিশ্বাসী হতে শিখেছে—সকল প্রকার অধিকারের দাবী নিয়ে তারা বিশ্বের সম্মুখে দৃঢ় মুষ্টি তুলে দাঁড়াতে পারছে।

যুদ্ধকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা সংগ্রাম বহুবর্ষ ধরে চলে আসছে। সেখানে গণচেতনা অন্য সব কলোনীর মতই

সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের যে মুখোসহীন দানবরূপ তারা দেখেছে তাতে আর ভবিষ্যতের আশ্বাসে বিশ্বাস করবে না কেউ। দেখা গেছে যে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মধ্যে দুনিয়াকে ভাগ করার ব্যাপারে যতই পরস্পরের মধ্যে হানাহানি করুক সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ-নীতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দরকারের সময় তারা সমস্বর ও সহকর্মী। যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস এই পারস্পরিক সাহচর্যের কলুষিত অধ্যায়। ইংরেজ জানে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফরাসী এবং ওলান্দাজ শক্তি ক্ষুন্ন হয় যদি এবং ঐ সব শাসিত দেশ যদি স্বাধীনতার প্রভাতে জাগ্রত হয়ে স্বাধীন ভারত এবং শক্তিমান স্বাধীন চীনের সংগে সম্মিলিত হয় তবে সমগ্র এশিয়া প্রকাণ্ড শক্তিধর হয়ে উঠবে। ফলে শুধু যে য়ুরোপের পুঁজিবাদের দুঃখের দিন আসন্ন হয়ে উঠবে তা নয় তার চরম মৃত্যুমুহূর্তও ঘনিয়ে আসবে। সুতরাং পারস্পরিক সাহায্যের দ্বারা যে কোন প্রকারে কলোনী ব্যবসা চালু রাখতে হবে। জাপানী সামরিক কর্তৃত্বের মধ্যেই ইন্দোচীনে গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে। তারা জাপানীদের নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তোলবার চেষ্টা চালায়। একদিকে ফরাসী সরকারের প্রাচীন শোষণনীতির বিরুদ্ধে অপরদিকে জাপানীদের জংগীবাদের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনারা যুগপৎ প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। ইন্দোচীনের গণচেতনা যখন জাপানের 'এশিয়া এশিয়াবাসীর' ধূয়ার ধাপ্পাবাজীর বিরুদ্ধে জাগ্রত হয় তখন কেবল যে জাপানী জংগীবাদকেই তারা প্রতিরোধের সংকল্প করেছিল তা নয় বস্তুত প্রাক্‌যুদ্ধ ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক কুশাসনের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করেছিল। যে কোন প্রকারে স্বাধিকার অর্জন করব এই ছিল তাদের মূলমন্ত্র।

১৯৪১ সালেই ইন্দোচীনে 'স্বাধীনতা লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইন্দোচীনের নানা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম দলগুলি সম্মিলিত প্রতিরোধ অর্পণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়। তার মধ্যে

'জাতীয় পার্টি' (যাদের পূর্বে নাম ছিল 'আনামী কুয়োমেনটিং'), নবীন আনাম পার্টি', কমিউনিষ্ট পার্টি, যুবক লীগ, কিষাণ সংঘ এবং জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়নই অন্যতম। এই স্বাধীনতা লীগের নামই 'ভাইটনাম'।

স্বাধীনতা লীগ জাপানীদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সুরু করে। সেই সংগে এ্যাড্‌মিরাল ডেক্যুর জাপানী তোষণনীতির নিন্দা করে তারা ব্যাপক আন্দোলন চালায়। এ্যাডমিরাল ডেক্যু যেভাবে ডিগবাজী খেয়েছিলেন তাতে গভীর ভাবে ক্ষুব্ধ হয় ইন্দোচীনারা।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের আত্মসমর্পণের সংগে সংগেই সংবাদ এল যে আনামের নামে মাত্র সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেছেন। আনামে নতুন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইন্দোচীনের নতুন নাম হোল 'ভাইটনাম' এবং জাতীয় সরকারের নাম হোল 'ভাইটনাম সরকার'।

আনামের সম্রাট বাও-দাই সিংহাসন ত্যাগ করে দেশের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যে বিবৃতি দেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ হোল—'ফরাসী গণতন্ত্রের কাছে আমার প্রথম আবেদন আমি পৌঁছে দিতে চাই......। ইন্দোচীন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কথা আমি ঘোষণা করছি......। সম্রাটত্বের লোভের চেয়ে আমার কাছে জাতীয় স্বার্থ বড় এবং সেই কারণে পরাধীন রাজ্যের তাঁবেদারী রাজা হওয়ার চেয়ে আমি স্বাধীন রাষ্ট্রের সাধারণ প্রজা হিসেবে বেঁচে থাকাকে বেশী মূল্যবান মনে করি।'

এই ভাবে জাতীয় সরকার সর্বদল সম্মিলিত হয়ে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা সুরু করে। অস্থায়ী সরকারের প্রধান মন্ত্রী হো-চি-মিন ভিয়েটমিন দলের নেতা গুয়েন হাইখানের সংগে মৈত্রীতে কাজ করেন। দেশে শান্তি স্থাপিত হোল। রাজধানী সায়গনে আশ্চর্য কর্মব্যস্ততা ও নবজীবনের সাড়া পড়ে গেল। ফরাসী সরকারের পতাকা সরিয়ে ভাইটনাম সরকার নিজেদের পতাকা তুলে দিল। নবলব্ধ স্বাধীনতার প্রতীক এই পতাকা

দেশের মানুষকে ত্যাগের পথে, গঠনমুলক পরিকল্পনার দিকে এবং জাতীয় অগ্রগতির পূর্ণতম রূপের দিকে আহ্বান করে। ভাইটনাম পতাকার রঙ লাল। সেই লালের পটভূমিকায় একটি পাঁচকোনা সোনালী তারকা। ভাইটনামের নবজাগৃতির সূচনা। ফ্রান্স ভিন্ন অন্য সব মিত্রপক্ষীয় নাগরিক ও সেনাবাহিনীর জন্য স্বাধীন সায়গন তার রাজধানীর দ্বার উন্মুক্ত করে রেখেছিল। পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে স্বাধীন সায়গন বলেছে—'আমাদের এতদিনের চেষ্টা সফল হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। আমাদের দেশের মালিকানা আমাদেরই।'

এর পরের ঘটনা সুরু হোল আশ্চর্য দ্রুত লয়ে। ভাইটনাম সরকারের প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে সমগ্র দেশে যে জনজাগরণ সুরু হয় তার উচ্ছ্বাস তখনও প্রবল। ইতিমধ্যে ইন্দোচীনের রাজনীতিতে বৃটিশ সৈন্য এসে প্রবেশ করল। বৃটিশ সামরিক শক্তির সায়গনে উপস্থিত হওয়ার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছিল যে জাপানীদের নিরস্ত্র করাই একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল যে ভাইটনাম সরকারকে নিরস্ত্র করে ফরাসী কুশাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। বৃটিশ জেনারেল গ্রেসী সায়গনে এসেই সেখান-কার সামরিক কতৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করলেন। সভাসমিতি নিষিদ্ধ হোল, পত্রিকা প্রকাশ ও প্রবেশ নিষিদ্ধ হোল—ভাইটনাম সরকারের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া হোল যে তাদের সৈন্যবাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্রের সম্পুর্ণ হিসেব দিতে হবে। তা ভিন্ন একমাত্র মিত্রপক্ষীয় সৈন্য ছাড়া কোন সামরিক অথবা বেসামরিক ইন্দোচীনা কোন অস্ত্র বহন করতে পারবে না।

ভাইটনাম সরকার অন্ততঃ এতটা রাহাজানি ধারণা করতে পারেনি। বৃটিশের নির্দেশ মেনে নিলে তারা অনিচ্ছায়। বৃটিশের সম্বন্ধে তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল চিরদিনের মত। বৃটিশ যে সায়গনের জাতীয় সরকারকে ইন্দোচীনের প্রতিনিধিমূলক সরকারের সম্মান দেবে এতটা আশা না করলেও অন্ততঃ সে সরকারের উপর যে

অনধিকার কর্তৃত্ব করতে আসবে না এ আশ্বাস ছিল বলেই তারা মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীকে স্বাগত করেছিল। এরপর থেকে প্রতি রাত্রে টহলদারী সুরু হোল ভারতীয় এবং জাপানী সৈন্যদের, জেনারেল গ্রেসীর নির্দেশে।

আনামরা কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল যে সমস্ত ফরাসীদের বৃটিশের সস্নেহ মমতায় তারা মুক্তি পেল। মুক্তি লাভ করেই তারা বিদ্রোহী এবং অকৃতজ্ঞ ইন্দোচীনাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার সুরু করল। তবু ফরাসীদের হাতে তখনো কোন ক্ষমতা নেই। তারা নিবীর্য। ভাইটনাম সরকার মফঃস্বল এলাকায় বে-সামরিক শাসনকার্য চালাচ্ছে আর বৃটিশ প্রভুরা সম্পূর্ণ সামরিক কর্তৃত্বের বল্গা হাতে নিয়ে যথেচ্ছাচারের মহড়া দিচ্ছে।

২১শে সেপ্টেম্বরের ভোর বেলা সুরু হোল ফরাসী সরকারের বীভৎস লীলা। তখনো সায়গনের পথে পথে ভারতীয় এবং জাপানী সৈন্যরা সশস্ত্র টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখা যাচ্ছে পথ থেকে পথে ছুটে বেড়াচ্ছে লরী। লরী বাহী সৈন্য সর্ব প্রকার অস্ত্রে সুসজ্জিত। এক সময় ছুটলো প্রথম গুলী। ভাইটনাম সরকারের স্বাধীন বেঁচে থাকার ইচ্ছার উপর গুলী পড়ল পুরাতন মানুষ ব্যবসায়ীদের বন্দুক থেকে। এই অতর্কিত আক্রমণের ঝোঁক সামলাতে পারল না অপ্রস্তুত ভাইটনাম সরকার। আনামরা বাধা দিল বটে কিন্তু ফরাসী সৈন্যরা ভাইটনামের সদর দপ্তর এবং অন্যান্য বাড়ী দখল করল—বন্দী করল লোকজনকে। অনেক রক্ত দিয়েও আনামরা সাম্রাজ্য-বাদীদের চক্রান্তের নীচে থেৎলে গেল।

যেসব আনাম বন্দী হোল তাদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার চলল। বিজয়ী ফরাসী কর্তারা ভাইটনাম সরকারের পতাকা ফেলে দিয়ে আবার শোষণের পতাকা উড়িয়ে দিল আকাশে। দেশে সব ঠাণ্ডা হয়ে এল মনে হোল। তারপর সুরু হোল বৈঠক—আশ্বাস—প্রতিশ্রুতি। গণতান্ত্রিক স্বাধীন ইন্দোচীন সরকার প্রতিষ্ঠার ধাপ্পাবাজী সুরু হোল প্রবল বিক্রমে। সাংবাদিকদের কাছে মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণ কমিশনের

ফরাসী প্রধান প্রতিনিধি বললেন—এসব কথা। কিন্তু আনামদের প্রতি অত্যাচারের নমুনায় সেসব আশ্বাস নির্জলা মিথ্যা বলেই গ্রহণ করল জগতের লোক।

সায়গনে হেরে গিয়েও আনামরা অত সহজে আত্মসমর্পণ করেনি। সহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে তারা ঘাঁটি নিয়ে আজাদী আন্দোলন চালনা করেছে। তখন ত্রাণ কর্তা বৃটিশ তার সভ্যতার মুখোস খুলে ফেলে খোলাখুলি ভাবে জাপানীদের সাহচর্যে ফরাসী সরকারকে রসদ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য স্থুরু করল। ইন্দোচীনের বলিষ্ঠ স্বাধীনতা ও গড়ে ওঠার চেষ্টাকে প্রকাশ্যভাবে হত্যা করে দেশের মানুষের উপর চণ্ডনীতি চালাতে লাগল।

এইভাবে ফরাসী কলোনীতে জাপানীদের সাহায্য নিয়ে জাতীয় আন্দোলনকে দমন করবার দুর্নীতিতে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই বৃটিশকে প্রশংসা করেনি। বরং এর প্রতিবাদে অষ্ট্রেলিয়ায় ধর্মঘট হয়েছে ব্যাপকভাবে অষ্ট্রেলিয়ার সামরিক রসদ যাতে ইন্দোচীনে এবং ইন্দোনেশিয়ায় অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত না হয় এর জন্য সেখানে ডকে ও কারখানায় ধর্মঘট চলে। তা ছাড়া আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছেও আবেদন গিয়েছে। পণ্ডিত জওহারলাল এই ধরণের দুর্নীতিকে কটু নিন্দা করেছেন এই বলে যে, বৃটিশ শক্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নব জাগরণে খুশী নয়—সে তাকে ভ্রূণহত্যা করতে চায়।

১৯৪৫'র ২রা অক্টোবর জেনারেল গ্রেসী মাধ্যমিকের কাজ করেন যাতে আনাম জাতীয়তাবাদী নেতা ও ফরাসী সরকারের মধ্যে একটা আপোষ হয়।

কিন্তু সে আপোষের সর্ত্ত ইন্দোচীনের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে অন্তরায় মাত্র। যেটুকু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে ইন্দোচীনাদের হাতে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার ক্ষমতা সব থেকে কমই আসবে। বরং ফরাসী শাসন কর্ত্তাদের হাতেই শাসনতান্ত্রিক চাবীকাঠি অটুট থাকবে।

আনাম প্রদেশের কৃত্রিম বিভাগ—কোচিন-চীন, টনকিং এবং আনাম একত্রীভূত করার দাবী অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ইন্দোচীনারা কিছু কিছু দায়িত্বশীল চাকুরী পাবে এই সামান্য লোভ তাদের দেখান হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সে দ্যিগল মন্ত্রীসভার পতনের সংগে সংগে ফ্রান্সের রাষ্ট্রনৈতিক ও ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভংগীর কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ সালে প্যারিশ বেতারের এক সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে যে ফ্রান্স ও কম্বোডিয়ার মধ্যে এক চুক্তির ফলে কম্বোডিয়া কার্যতঃ স্বাধীনতা লাভ করেছে। এই চুক্তি অনুসারে কম্বোডিয়া থেকে ফরাসী রেসিডেন্ট সরে আসবেন। কেবলমাত্র কম্বোডিয়ার রাজাকে পরামর্শ দেবার জন্য একজন ফরাসী পরামর্শ-দাতা নিযুক্ত থাকবেন। কম্বোডিয়া ইন্দোচীন ইউনিয়ন ও ফরাসী যুক্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সচিব মঁসিয়ে মেরিয়াল মুবের বক্তৃতায় বলা হয়েছে যে ফরাসী সরকার ফ্রান্সের কলোনীগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের জন্য প্রস্তুত। "শ্বেতজাতি সমূহের মধ্যে আমরা যেমন জাতিগত কোন বৈষম্য স্বীকার করব না তেমনি কৃষ্ণ ও পীত জাতিগুলির বিরুদ্ধেও কোন বৈষম্যমূলক মনোভাব আমরা সহ্য করব না।"

উপরোক্ত ভংগীরই সমর্থন হিসাবে অনেকগুলি কার্যকরী পরিবর্তন করা হয়েছে। যদিও সেগুলি কলোনীয় শাসনের চরম অবসান ঘোষণা করছে না তবু তাদের মধ্যে কিছু প্রগতিবাদী মনোভাব আছেই।

৭ই মার্চ ফরাসী সরকার ঘোষণা করেছেন যে ফরাসী সরকার ও হ্যানয়ের জাতিয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় উত্তর ইন্দোচীনের আনাম রাজ্য ফরাসী ইউনিয়নের মধ্যে থেকে স্বায়ত্ত শাসন অধিকার পাবে। অল্পদিন পূর্বে ফ্রান্স চীনে তার যে রাষ্ট্রাতিরিক্ত অধিকার ছিল তা ত্যাগ করেছে।

সাইগন হতে ফরাসী সূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে উত্তর ইন্দোচীন হ্যানয়তে ভিয়েট মিন দলের নেতা হো চি মিনের নেতৃত্বে একটি নূতন অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে। গত ৬ই মার্চ ভিয়েট মিন সরকার ও ফরাসী সরকারের মধ্যে নিষ্পন্ন চুক্তি অনুসারে উত্তর ইন্দোচীনের আনাম গণতন্ত্রকে ফ্রীষ্টেট রূপে স্বীকার করা হয়েছে এবং এই রাষ্ট্র ইন্দোচীন যৌথ রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হবে।

১৪ই মার্চ ফরাসী গণপরিষদে চারিটি ফরাসী উপনিবেশকে ফরাসীর প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান করে বিল পাশ হয়েছে। উপ-নিবেশ সচিব ফরাসী ইন্দোচীনের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী কোচিন-চীনকে স্বাধীন শাসনতন্ত্র দেওয়া হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন।

কলোনীতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী মনিবরাষ্ট্র যত রক্ষণশীলতার পরিচয় দিক না কেন জাতীয় জাগরণের ঢেউ সে শেষ অবধি রোধ করতে পারবে না। য়ুরোপীয় রাষ্ট্র প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ফ্রান্সের অবস্থান অনেক পিছনে। তাই আজ উপনিবেশ সমস্যায় তাকে মন দিতেই হচ্ছে। এবং মনিব রাষ্ট্রের এই মুমূর্ষু অবস্থাতেই তার দুষ্ট কলোনী নীতিকে চরম ঘা দিতে হয়। কলোনীতে কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্বার্থ বন্ধুত্বের হিসেবে বাঁচিয়ে রাখা চলে বলেই ফ্রান্স আজ তার নীতিকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে।

একথাও ঠিক যে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠাই সব কলোনীর মানুষদের একমাত্র লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে পৌঁছতে তার নানা দুর্যোগ পার হতে হবে। কিন্তু মহৎ ত্যাগের পথে যে স্বাধীনতা আসবে তার জন্য চরম প্রস্তুতির কার্পণ্য করবে না এশিয়ার কোন দেশ। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেভাবে বিবর্তিত হচ্ছে তাতে ভারতের প্রতিবেশী এইসব রাষ্ট্র অতি শীঘ্রই স্বাধীন ভারত ও শক্তিশালী চীনের সংগে সম্মিলিত এশিয়া রাষ্ট্র মণ্ডলে মিলিত হবে।

এ অবধারিত সত্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্যা বলতে মূলতঃ ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সমস্যাকেই বুঝায়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সমুদ্র বেষ্টিত এই 'দ্বীপময় ভারত' এমন কতকগুলি ব্যাপক ও জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে যার সঙ্গে একমাত্র পরাধীন ভারতবর্ষ ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর কোন স্থানেরই তুলনা হয় না। ইন্দোনেশিয়াকে বহ্নমান আগ্নেয়গিরির সংগেই তুলনা করা সমীচীন—যেখানে অগ্নিস্রাব সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে সমুদ্রের অতল তলে নিমজ্জিত করার জন্য শেষবারের মত বিদীর্ণ হবার চরম অপেক্ষায় আছে।

এক সময় ফারমোসা থেকে ফিলিপাইন, মাদাগাস্কার পর্যন্ত সমস্ত দ্বীপ এলাকাকেই ইন্দোনেশিয়া বলা হোত। কিন্তু বর্তমান কালে এর বিস্তৃতি অনেক সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে। এখন শুধু সুমাত্রা, বোর্ণিও, জাভা, সেলিবিস প্রভৃতি ওলন্দাজ বা ডাচ শাসিত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ইন্দোনেশিয়া নামে খ্যাত। স্থানীয় লোকেরা এই দ্বীপপুঞ্জকে বলে রত্নদ্বীপ। বস্তুতঃ পৃথিবীর দ্বীপাবলীর মধ্যে ইন্দোনেশিয়াই সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও ঐশ্বর্যশালিনী।

জাভা আর ছবির মত দ্বীপ বালি—এই দুই মিলে ইন্দোনেশিয়ার কেন্দ্রীয় ভূভাগ আর সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস ও অন্যান্য দ্বীপ মিলে এর বহির্ভূভাগ। একমাত্র সুমাত্রার তেল ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার যা' কিছু অর্থনৈতিক উন্নতি সবই জাভাতে কেন্দ্রীভূত।

ইন্দোনেশিয়ায় কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক সমস্যা নেই অথবা ভারতের মত এখানে ধর্ম নিয়ে হানাহানি, কাটাকাটিও হয় না। বালি দ্বীপে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য কিন্তু বালি ছাড়া আর সবগুলি দ্বীপেই একটি মাত্র ধর্ম প্রচলিত। সে ইসলাম ধর্ম। ইন্দোনেশিয়ানরা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করে ১৫শ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং এতদিনের ঔপনিবেশিক স্বৈর শাসনের পরও স্বধর্মে অবিচলিত আছে। মুসলমানরা সমগ্র জন সংখ্যার দশ ভাগের নয় ভাগ আর হিন্দুদের সংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার। এরা ছাড়াও তিরিশ লক্ষ আদিবাসী বাস করে এখানে। জাতি হিসেবে এরা সবাই মালয়ী এবং আট নয়টি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা সত্বেও সর্বত্র ভাব আদান প্রদানের একটি সাধারণ ভাষার ভিত্তি আছে। এই ভাষাকে বলা হয় Laag Malieisch। এইটিই এদের জাতীয় ভাষা। অবশ্য পাপুয়াতে স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলিত এবং পাপুয়াকে ভৌগলিক দিক থেকে অষ্ট্রেলিয়ার সংগেই সংশ্লিষ্ট বলা চলে। জাভার আর একটি জটিল সমস্যা হচ্ছে বহু সংখ্যক ইউরোপীয় জাভাতে 'ডোমিসাইল্ড' এবং তাদের সংখ্যাও কমপক্ষে লক্ষাধিক। এরা ছাড়াও এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ইউরেশিয়ান আছে। অর্থাৎ এক চতুর্থ মিলিয়ন শ্বেত ও অর্ধ শ্বেত লোকেরও জন্মভূমি জাভা। ১৯৩৯'র আদমশুমারীতে প্রকাশ যে ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা ৬ কোটী ৭৩ লক্ষেরও অধিক। সমগ্র ইন্দোনেশিয়াতে জনসংখ্যার সানুপাতিক হিসাব মোটামুটি নিম্ন ধরণের।

ইন্দোনেশিয়ান	৫৯৯.৬৮ লক্ষ
ইউরেশিয়ান	২.৪ „
চীনা	১.২৩ „
অন্যান্য এশিয়াবাসী	১.১৬ „

কলোনীর চিরাচরিত রীতি যা' এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ডাচরা স্থানীয় বাসিন্দাদের চেয়ে সর্বক্ষেত্রেই অধিকতর সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে। ডাচদের বর্ণছত্রের তলে এসে ভিড়েছে

য়ুরোপের সভ্যজাতের লোকেরা। তারাও শাসক শ্রেণীর এক মহাদেশে বাস করার পুণ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ও সুবিধাভোগী। এ ছাড়া জাপানীদেরও বর্ণশ্রেষ্ঠতা অর্পণ করা হয়েছে ওলন্দাজ সরকারের সুবিবেচনায়। এদের সংখ্যাও প্রায় আট হাজার। ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যেও কয়েক সহস্র সৌভাগ্যবানকে এই য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এরা সেবা দিয়ে, সামর্থ দিয়ে, এবং অন্য হাজার রকমে শাসক শ্রেণীকে খুশী করে তবে এই বিশেষ 'মর্যাদার' অধিকারী হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের য়ুরোপীয় নাগরিক মর্যাদা অর্জন করতে হলে তিনজন য়ুরোপীয়ানের প্রশংসাপত্র সহ শাসক দপ্তরে আবেদন করতে হয়। আবেদনের সময় ফী জমা দিতে হয় ভারতীয় মুদ্রায় ১৭৫০ টাকা। প্রায় সাত কোটী জনসংখ্যার মধ্যে এই রকম 'পুণ্যবীরদের' সংখ্যা দশ হাজারের অধিক হবে না।

দ্বীপ ভারতে দ্বীপ অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনতা :

		প্রতি বর্গ কিলোমিটার
জাভা ও মাদুরা	৪১.৭১৮ কোটী	৩১৫.৬৩
সুমাত্রা	৮.২৫৫ "	১৭.৪৭
বোর্ণিও	২.১৬৯ "	৪.০২
মান্দো	১.১৩৯ "	১২.৮৫
সেলিবিস	৩.০৯৩ "	৩০.৭৯
মালাক্কা (ডাচ নিউগিনি সহ)	.৮৯৩ "	১.৮০
টিমুর	১.৬৫৭ "	২৬.১৭
বালি ও লম্বক	১.৮০৩ "	১৭৫.১৮

মূল জাপানের চেয়ে পাঁচগুণ বড় ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ।

উপরের তালিকা থেকে এ সহজেই অনুমান করা যায় যে দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে জাভা দ্বীপই বিস্তৃতির চেয়ে জনবসতির দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারপরই বালি দ্বীপ। আর সমগ্র ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জাভাকে ঘিরে দুর্গপ্রাকারের মত অবস্থিত। জাভাই তিনশ' বছর ধরে ডাচ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। জাভার

কাঁচামাল ও সম্পদ রূপ কথায় বর্ণিত ঐশ্বর্যের মত। সংস্কৃত কবিরা জাভা থেকে আসা নানা মসলার কথা বর্ণনা করে গেছেন। আধুনিক যুগে জাভাতে প্রচুর পরিমাণে রবার, চিনি, সিংকোনা, পেট্রোলিয়াম, ম্যাংগানিজ ও টিন উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ জাভা মসলার দেশ। এই মসলার লোভেই প্রথমে পর্তুগীজ ও পরে ওলন্দাজরা এখানে এসে আস্তানা গেড়ে বসেছে। প্রাক্ ডাচ শাসন যুগেও জাভা ও বালি ছিল দ্বীপ শ্রেণীর মধ্যে সমৃদ্ধিশালী কেন্দ্র এবং সভ্যতার ও রাজশক্তির অনেক উত্থান পতনের বহুকালের সাক্ষী তারা। ডাচ শাসন পূণ্যে ও অর্থনৈতিক কারণে জাভাই সরকারী খাসমহল হয়েছে। এই জনঘনত্ব লঘু করার জন্য অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে কারিগর ও শ্রমিক চালান দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত যতগুলি ইচ্ছাধীন ও বাধ্যতামূলক চেষ্টা করা হয়েছে সরকার পক্ষ থেকে তার কোনটিই সফল হয়নি। কিন্তু দিনে দিনে এই ঐশ্বর্য-শালিনী দ্বীপপুঞ্জের খনিজ সম্পদ যখন নানাভাবে পুনর্গঠিত হবে এবং শিল্পোন্নতি দ্রুতলয়ে এগিয়ে চলবে তখন আপনা হতেই জনঘনতা বিস্তৃত হয়ে পড়বে বিভিন্ন এলাকায়। তবু জাভা ও বালিই ভবিষ্যৎ স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতি ও শিল্পোন্নতির লীলাভূমি থাকবে।

এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে জাভা সুমাত্রার সভ্যতা যেমন প্রাচীন এদের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসও তেমনি গৌরবোজ্জ্বল। শৈলেন্দ্র রাজাদের শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল সুমাত্রার পেলাংমবাংতে। এই রাজারা বহু শতাব্দী ধরে কেবলমাত্র সুমাত্রা ও চতুঃপার্শ্বস্থ দ্বীপপুঞ্জেই রাজত্ব করেননি, তাঁদের রাজত্ব মালয় অবধি বিস্তৃত ছিল। সুমাত্রায় ইসলাম আধিপত্যের পূর্ব পর্যন্ত শৈলেন্দ্র রাজারা সগৌরবে রাজত্ব করে গেছেন। তেমনি জাভাও পর পর রাজাদের রাজত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের সম্মানজনক স্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। জাভার নৌ-বাহিনী বহুবার কম্বোজের উপর রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করে কর আদায় করেছে। এরেলংগের

রাজত্বকালে জাভা অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং শিক্ষা সংস্কৃতির তীর্থ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।

পর্তুগীজরা যখন প্রাচ্যে আগমন করে তখন সুমাত্রা জাভা বালি শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা ও রাজনৈতিক উৎকর্ষতায় যে কোনদিক দিয়েই কোন দেশের পশ্চাৎপদ ছিল না। চাইনীজ পুরা দপ্তর ও দেশীয় বহু সাহিত্যে তার ভুরী ভুরী প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই ডাচরা যখন এদেশে এসেছিল তখন তাদের কোন পিছিয়ে পরা জাতির সংস্পর্শে আসতে হয়নি। কিন্তু আড়াইশ' বছর রাজত্বের পর এ বিপুল সাম্রাজ্যের কোন উন্নতিই করেনি তারা—করেছে কেবল শোষণ আর শোষণ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত শোষকভূমির সমৃদ্ধি বর্ধনের জন্য ইন্দোনেশিয়ার মাটি আগ্নেয়াস্ত্রের ফলাগ্রে শস্য ও মসলা দিয়েছে আর দিয়েছে খনিজ সম্পদ। যুদ্ধের পূর্বে এখানকার রাজনৈতিক কাঠামোর রূপটা ছিল অপ্রত্যক্ষ শাসন ব্যবস্থা। এর তাগিদ ছিল নিছক অর্থ নৈতিক। কাজেই এই কাঠামোকে চালু রাখতে কোন প্রকার সুগঠিত ও সুবিস্তৃত শাসনযন্ত্রেরও প্রয়োজন ছিল না। কলোনিয়াল শাসনকর্তাদেরও দায়িত্ব ছিল কমশ এর ফলে ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা হয়েছে সম্পূর্ণ অবহেলিত—জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতিরও কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি এতাবৎ। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত যারা জাতীয় সমৃদ্ধি ও শিক্ষাসংস্কৃতির জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল ডাচ শাসনের মাত্র আড়াইশ' বছরের মধ্যেই তারা হৃতস্বাস্থ্য হৃতসর্বস্ব হয়ে ব্যাপক ও সর্বনাশা অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্যের গভীরে মৃত্যুপথযাত্রী হতে বসেছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হল্যাণ্ডে নরমপন্থীদের আন্দোলনের ফলে এই সম্পূর্ণ ব্যবসাদারী নীতির কিছুটা সংস্কার সাধিত হোল এবং মনুষ্য ব্যবসার জন্য দাস নরনারীদের প্রতিও যে অন্ততঃ একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে তা স্বীকৃত হোল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যে কিছুটা শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হোল।

এখানে এও উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম যিনি শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন তিনি হচ্ছেন একজন জাভানীজ মহিলা। নাম প্রিন্সেস কারটিনা। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি সম্ভ্রান্ত জাভানীজদের শিক্ষার জন্য বিদ্যায়তন খোলেন। এই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে জাভার লোকেরা শিক্ষা প্রসারে সক্রিয় উৎসাহ দেখাতে শুরু করেছে।

ইন্দোনেশিয়ানদের শিক্ষার হার শতকরা সাত। ১৯৩৯ সালে প্রতি এগারটি ছেলের মধ্যে একটি স্কুলে যেত। ডাচ সরকার স্থানীয় অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য মাথা পিছু বৎসরে খরচ করেন আট আনা। ইন্দোনেশিয়ার ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই বটে কিন্তু প্রত্যেক ডাচ ছেলেমেয়ে নিখরচায় বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা গ্রহণ করে। মাধ্যমিক শিক্ষা নিতে হলে প্রত্যেক ইন্দোনেশিয়ান ছেলেমেয়ের পিতামাতার রাজনৈতিক জীবন ও রাজানুগত্যের পুংখানুপুংখ খবরাখবর নেওয়া হোত আগে। তারপর অনুমতি মিলত শিক্ষা প্রার্থীদের। মাধ্যমিক শিক্ষার খরচ অত্যন্ত বেশী এবং সাধারণের ক্ষমতার বাইরে। ইন্দোনেশিয়ার বাৎসরিক আয়ের শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় খরচ হয়।

কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় জাগরণের মূলে জাতীয়তাবাদীদের যে শিক্ষা প্রসার ও সমাজ সংস্কারের পরিকল্পনা তা' অনেকাংশেই সার্থক হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া সবসময়ই ভারতের জাগরণের দিকে তাকিয়ে প্রেরণা নিয়েছে। ভারতের গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-জওহরলাল সেদেশে মানুষের মনে শ্রদ্ধার সিংহাসন পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন বিপ্লবী ইন্দোনেশিয়ান 'শিক্ষা আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মহৎ প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন পরে কী হাজদার দাতনারা। জাভার বহু প্রাচীন সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রভূমি যোকাকার্তায় এই শিক্ষা আশ্রমটি গড়ে উঠেছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সংগীত, সাহিত্য এবং নৃত্য কলার; জাগৃতি ও প্রসারের জন্য এখানে ব্যাপকভাবে কাজ ও অনুশীলন চলে। এই বিদ্যালয়ের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। আশ্রমবাসীরা পরম

সম্প্রীতির মধ্যে বাস করে। ডাচ সরকার এই বিদ্যালয়টিকে এবং তার অনুসৃত নীতিকে কোন দিনই ভাল চোখে দেখেননি। একে কবলিত করবার জন্য কিছু অর্থিক সাহায্যও করতে চেয়েছিলেন। হাজদার তা নিতে স্বীকৃত হননি। জনসাধারণের আর্থিক এবং নৈতিক সাহায্যের ফলেই আজ এই বিদ্যায়তনটির শাখা সারা ইন্দোনেশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

যুদ্ধ বাঁধবার সময় সারা ইন্দোনেশিয়ায় ১৯০টি স্কুল চলছিল এদের। সাতশ' পুরুষ ও একশ' মহিলা শিক্ষক এইসব স্কুলে সতর হাজার ছেলে ও চার হাজার মেয়েকে জাতীয় সংস্কৃতি ও অন্যান্য সকল প্রকার শিক্ষায় মানুষ করে তোলবার চেষ্টা করছিলেন। এদের অধীনে শিশু শিক্ষা থেকে কলেজী শিক্ষার সব ব্যবস্থাই আছে। তা' ভিন্ন শিক্ষকদের ট্রেনিং এবং গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছে।

এইসব স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা জাতীয়তার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় জীবনে 'আমান শিস্য' প্রতিষ্ঠানের দান অতুলনীয়।

ডাচ সরকারও যেমন এই প্রতিষ্ঠানকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন জাপানীরাও তাদের বিষদৃষ্টি দিয়েছে এদের উপর। জাপানী জংগীবাদের আক্রোশে এই মহৎ ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠানের সব দরজাই বন্ধ হয়ে যায়। তারপর গোপনে গোপনে কাজ চলে বটে কিন্তু তার বিরাটত্ব হ্রাস পায়।

ইন্দোনেশিয়ান গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে এই প্রতিষ্ঠান আবার কাজ স্নুরু করেছে। কী হাজদারের তত্বাবধানে এর কর্মক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হচ্ছে।

কী হাজদার একজন দেশপ্রিয় নেতা এবং সফল শিক্ষাব্রতী। ১৯১৩ সালে স্বদেশীয়ানার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। ডাচ সরকার তাঁকে দু'টি সর্ত্ত দেন। হয় ইন্দোনেশিয়ায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করতে হবে আর নয়ত ইন্দোনেশিয়া থেকে বিদায় নিয়ে

বিপুল পৃথিবীতে বাঁচবার সুযোগ খুঁজে নিতে হবে। কী হাজদার দ্বিতীয় সর্তেই সন্তুষ্ট হলেন। হল্যাণ্ডে ছ'বছর তিনি শিক্ষা পরিকল্পনার অনুশীলন করেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের আদর্শ এই সময়ই তাঁর মনকে গভীর ভাবে প্রবুদ্ধ করে। দেশে ফিরে তিনি শিক্ষাপ্রসারের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং 'আমন শিষ্য' প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার দায়িত্ব নেন। তাঁরই চেষ্টায় আজ 'আমন শিষ্য' পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে পড়েছে।

জাপানী অধিকারের সময় জাপানীরা তাঁকে শিক্ষাপরিষদের পরামর্শদাতার কাজ নিতে বলে। কিন্তু তিনি তাতে রাজী হননি।

ইন্দোনেশিয়ার লোকায়ত্ত সরকারের প্রথম মন্ত্রীপরিষদের তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক এবং দ্বিমুখী—স্থানীয় কৃষি অর্থনীতি ও ব্যাপক কলোনিয়াল অর্থনীতি। জাভাতে এই দ্বিমুখী অর্থনীতির পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। স্থানীয় কৃষি অর্থনীতির ফলে চাল ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। এবং শাসক শ্রেণীর নির্দেশের অতিরিক্ত উৎপন্ন মাল অগ্নিদগ্ধ করা হয়। আজো এখানে কৃষি কার্য চলে সেই মান্ধাতার আমলের প্রচলিত প্রথায় এবং এদিক থেকে বৃটিশ কলোনী ভারতের চাষবাসের সংগে তুলনীয়। এই ব্যবস্থার যদিও কিছুটা উন্নতির চেষ্টা হয়েছে তবুও কলোনিয়াল অর্থনীতি জাভার জাতীয় জীবনের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় হয়ে আছে।

এখানে দ্বীপ ভারতের মৃত্তিকা সম্পদের একটা মোটামুটি হিসেব দেওয়া প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ইন্দোনেশিয়ায় প্রকৃতির দান অফুরন্ত। দুনিয়ার প্রয়োজনের বিরানব্বুই ভাগ মসলা যোগায় এই দ্বীপপুঞ্জ। সিংকোনা যোগায় শতকরা একানব্বুই ভাগ। পৃথিবীর বকসাইট, লোহা ও এ্যালুমিনিয়মের শতকরা আশী ভাগ যায় এখান থেকে। এ ভিন্ন শতকরা ৭৭ ভাগ ক্যাপক; ১৯ ভাগ চা; ২৯ ভাগ কোকো; ২০ ভাগ টিন; শুকান নারিকেল শাঁস

৩১ ভাগ ; ৫ ভাগ চিনি ; এবং সোনারূপা ছাড়াও খনিজ তেলের শতকরা ২'৫ ভাগের যোগান দেয় ইন্দোনেশিয়া। খনিজ তেল উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। এসব ছাড়াও ম্যাংগানিজ ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য এখানে আছে। ইন্দোনেশিয়ার শিল্প প্রসার সাম্প্রতিক কালে কিছুটা অগ্রসর হয়েছে বটে কিন্তু তাও বিদেশী প্রযুক্ত মূলধনে।

ইন্দোনেশিয়ার কলোনিয়াল অর্থনীতিকে আরো দৃঢ়তর করার জন্য সম্প্রতি কিছু কিছু পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তার ফলে রবার কুইনাইন প্রভৃতির আবাদ প্রসারণে এবং পেট্রোলিয়াম টিন প্রভৃতি খনিজ সম্পদ আহরণেও প্রচুর টাকা খাটানর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। জাভার রবার পৃথিবীর বাজারে সু-উচ্চ স্থান পেয়েছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার রবার চাষ কোম্পানীগুলি কর্তৃক জাভার রবার ব্যবস্থা সম্পুর্ণ নিয়ন্ত্রিত হোত। আখের চাষও সম্পুর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুসৃত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা এখানে ইক্ষুতে চিনির পরিমাণ এত বৃদ্ধি করা হয়েছে যা অন্য কোন দেশে সম্ভব হয়নি। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও হল্যাণ্ড এখানকার খনিজ সম্পদ ও কৃষি সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করে। জাভা সুমাত্রার তেলের কোম্পানী ও খনি-গুলিতে যে পরিমাণ অর্থ খাটে তা আসে সরকারী ও বেসরকারী কোষাগার থেকে, কাজেই লভ্যাংশও সমুদ্র পেরিয়ে চলে যায়।

বিদেশী মূলধনের প্রতি হল্যাণ্ডের উদারনৈতিক মনোবৃত্তির জন্যই জাভা ও সুমাত্রার কলোনিয়াল অর্থনীতির দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। ফরাসীরা ইন্দোচীনকে নিজস্ব ব্যক্তিগত জমিদারী মনে করে, কিন্তু ডাচরা আড়াইশ' বছরের একচেটিয়া অধিকারের পর বুঝেছে যে বিদেশী মূলধনের সহায়তাই অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়। ডাচ সরকার আমেরিকান ও বৃটিশ পুঁজিবাদকে সাদরে আহ্বান করেছে এবং তারাও প্রচুর টাকা খাটিয়ে লাভবান হয়েছে। এর ফলও একদিক থেকে অপূর্ব হয়েছে। কেন না, এই ধরণের অর্থনীতি একদিক থেকে ভাল হলেও এর দুটো অবশ্যম্ভাবী কুফল

(লাইফ)

"চলি চলি পা পা"—শেখাচ্ছেন ইন্দোনেশিয়া গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি আহম্মদ সোয়েকর্ণ ও তাঁর স্ত্রী জাভার বিখ্যাত রূপসী। আহম্মদ বেনগেয়েং ইনষ্টিটিউটের ডিগ্রীধারী ইঞ্জিনিয়র, বয়স ৪৪। সমগ্র ইন্দো-নেশিয়ানদের স্বাধীনতার পথে চালিয়ে নেওয়ার দুরূহ পণ নিয়েছেন সোয়েকর্ণ।

জন-গণ-মন অধিনায়ক সোয়েকর্ণ ও তাঁর স্ত্রী। জাভার ব্লিটারে। জয়ধ্বনি করে সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছে পথপার্শ্বের অপেক্ষমান জনতা। পশ্চাতে অনুগমন করছে সহস্র সহস্র বালক, বালিকা, যুবক ও বৃদ্ধের দল।

(টাইম)

হোল। এই প্রকার অর্থ নৈতিক শোষণের ফলে গ্রামীন অর্থনীতি নিরালম্ব হয়ে পড়ল এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি হল বটে কিন্তু কৃষিজীবীরা যারা সেই প্রাচীন মধ্যযুগীয় প্রথায় কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল তারা ক্রমশঃ দরিদ্র থেকে হতদরিদ্র হয়ে পড়তে লাগল। দ্বিতীয়তঃ, যেকোন কলোনীর সমৃদ্ধি অন্য সব দেশের শিল্পোন্নতির উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় শর্করা শিল্পের উন্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির সংগে সংগে জাভার চিনির উপর আমদানী শুল্ক বসে গেল। এই ধাক্কায় জাভাতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যে অর্থ নৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল তাতে দেশের অর্থ নৈতিক সমতাই বানচাল হয়ে গিয়েছিল। কারণ এই ধরণের দ্বিমুখী অর্থনীতির নিজস্ব আভ্যন্তরিণ প্রতিরোধ ও আত্ম-রক্ষামূলক শক্তি থাকে না।

১৯৩০'র সর্বনাশা সংকট ডাচ শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা পরিবর্তন ঘটাল এবং জাভার সমৃদ্ধি জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হোল। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই ক্রমশঃ দেশকে শিল্পপ্রসারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা সুরু হয়। য়ুরোপে যখন যুদ্ধ বাধল তখনও এদিক থেকে জাভার বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। সেই ঘোর দুর্দিনে রাষ্ট্রনায়করা এই কঠিন সত্য প্রথম উপলব্ধি করলেন যে অন্য দেশের শিল্প প্রসারের উপর নির্ভর করে দেশরক্ষা অসম্ভব। কিন্তু তখন যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে।

যে দেশ এমন শ্রীমন্ত সে দেশের মানুষ সুখী ও সুস্থ হবে এইত স্বাভাবিক। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ানরা আমাদের মতই নিজ বাসভূমে পরবাসী তাই তারা অসুখী।

ইন্দোনেশিয়ানরা সংখ্যায় সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের শতকরা ৯৭'৫ ভাগ হলেও দেশের আয়ের মাত্র শতকরা ১২ ভাগের অংশীদার। ডাচ কলোনীর নীতিই হচ্চে ইন্দোনেশিয়ানরা শুধু কাঁচামাল উৎপাদন করবে আর সস্তা শ্রমিক যোগাবে। যে সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয় তার শতকরা ৬৯'৩ ভাগ জমিতে উৎপন্ন হয় এবং তার

মালিক হচ্চে ডাচরা অথবা শ্বেতকায় বিদেশীরা। ১৯৩৮ সালে শতকরা যে ৯৯'৪ ভাগ চিনি ও ৮১'৯ ভাগ চা রপ্তানী হয়েছে তার সবই এসেছে বিদেশী মালিকের জমি থেকে। ক্যাপক, গোলমরিচ, নারকেলের শুষ্ক শাঁস প্রভৃতি স্থানীয় বাসিন্দাদের এক্তিয়ারে এবং রবার ও সিনকোনা উৎপাদন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দেশীয় লোকদের। কিন্তু এখানেও একটি মজার কথা উল্লেখযোগ্য যে, যানবাহনাদি সবই ডাচদের একচেটিয়া অধিকারে এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানই আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করে সর্বাংশে। কাজেই এরাই প্রকৃতপক্ষে চাষীর উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে।

১৯৩৯ সালে বিদেশে রপ্তানী মালের ৬১ ভাগ গেছে হল্যাণ্ডে। বহির্জগতের সংগে জাহাজী ব্যবসার হার নিম্নরূপ ঃ

ডাচ	শতকরা	৪৬'৭
যুক্তরাজ্য	„	৩০'৭
জাপান	„	৯'৪

দ্বীপপুঞ্জের মূলধনের চার ভাগের তিন ভাগই ডাচদের এবং বছরে এখান থেকে প্রায় ৩২ মিলিয়ন পাউণ্ড কি কিছু বেশী যায় হল্যাণ্ডের রাজকোষে। জাভায় অধিকাংশ চাষ আবাদ ডাচদের মূলধনে। এ ভিন্ন বৃটিশ ও আমেরিকার লগ্নী টাকাও খাটে এখানে। ১৯৩৯ সালের হিসেবে প্রকাশ যে ১'৩ লক্ষ কোটী গিলডার সরকারী লোন ও সরকারী মূলধন বাদ দিয়ে সাড়ে তিন লক্ষ কোটী গিলডার মূলধন খাটছে। এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ডাচদের। স্থানীয় চীনাদের মূলধন শতকরা দশ ভাগ। আর বাকী অংশের ৩৭ কোটী বৃটিশের এবং ২৪ কোটী আমেরিকার। রবার, চা এবং তামাকে প্রচুর স্বার্থ ছাড়াও নিউইয়র্কের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী এবং সোকনী ভ্যাকুয়াম কর্পোরেশান সমস্ত ইন্দোনেশিয়ার পেট্রোলিয়ামের শতকরা চল্লিশ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। পেট্রোলিয়ামে বৃটিশের একক স্বার্থের পরিমাণ মোট ২৪ কোটী।

শুদ্ধ এই কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জের

সম্মিলিত জংগীবাদের অর্থ পরিষ্কার হয়। ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনে সুসভ্য য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের জঘন্য আত্মপ্রকাশের কারণ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

ইন্দোনেশিয়ার শাসন কাঠামোতেও ঐ একই প্রকার অস্বাস্থ্যকর দ্বৈতবাদের দুর্নীতি। হল্যাণ্ডের রাজমুকুট কর্তৃক নিযুক্ত শাসন কর্তাই সমস্ত কলোনীর একচ্ছত্র শাসক ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। একমাত্র রাজমুকুটের নির্দেশই মানতে বাধ্য তিনি। শাসন ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য পাঁচজনের একটি মন্ত্রণা পরিষদ আছে। এই পাঁচজনের একজন হ'বে ইন্দোনেশিয়ান। পরিষদ থেকে নিযুক্ত। গভর্ণর জেনারেল বা শাসন কর্তার এই মন্ত্রণা পরিষদের প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনের ধাপ্পাবাজী স্বরূপ ১৯১৭ সালে শাসন সংস্কারের জন্য প্রবল আন্দোলনের চাপে পড়ে ডাচ সরকার একটি মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন যাকে বলা হয় ভলক্সরাড (Volksraad)। জাপানী অধিকারের সময় এই পরিষদে ৬০ জনের ৩৮ জন নির্বাচিত ও ২২ জন মনোনীত সদস্য ছিল। সাধারণ নির্বাচনও গণতন্ত্র বিরোধী এবং ভোটদাতাদের সংখ্যা নানাভাবে সীমাবদ্ধ। ৩৮ জন মনোনীত সদস্যের মধ্যে ২০ জন ইন্দোনেশিয়ান, ১৫ জন ডাচ ও ৩ জন অন্যান্য এশিয়াবাসী। সর্বসমেত পরিষদের শক্তির হার ৩০ জন ইন্দোনেশিয়ান, ২৫ জন ডাচ এবং বাকী ৫ জন আরব ও চীনাদের প্রতিনিধি। অর্থাৎ জনসংখ্যার শতকরা ৯৭ জনের প্রতিনিধিত্ব করে ৩০ জন এবং শতকরা আধ জনের প্রতিনিধিত্ব করে ২৫ জন। চমৎকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা! কিন্তু এত কড়াকড়ি সত্বেও ভলক্সরাডকে কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। বৎসরে দু'বার অধিবেশন হয় পরিষদের। একবার বাজেট আলোচনার জন্য আর একবার সাধারণ আলোচনার জন্য। সদস্যরা কেবলমাত্র বাজেট সমালোচনা, অনুমোদন ও বাজেট সম্পর্কিত নানাবিধ প্রশ্ন করতে পারেন। অর্থাৎ সমস্ত ব্যবস্থাই একটা হাস্যকর প্রহসন মাত্র।

কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রদেশ জাভার শাসন প্রণালী বহিঃপ্রদেশের শাসন প্রণালী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জাভা আবার তিনটি প্রদেশে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি এক একজন সপরিষদ গভর্ণরের অধীন। প্রাদেশিক রাষ্ট্র সভা কিছু নির্বাচিত ও কিছু মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাপারেই একমাত্র প্রাদেশিক রাষ্ট্র পরিষদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার ভার রাজ-প্রতিনিধি বা রিজেন্টের উপর ন্যস্ত। রিজেন্ট দ্বারা শাসন ডাচ রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। এই শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী জেলাগুলি বা রেসিডেন্সি এক একজন রিজেন্ট বা বড় বড় ইন্দো-নেশিয়ান অফিসার দ্বারা শাসিত হয়। এই সমস্ত অফিসারদের স্থানীয় অভিজাত পরিবার থেকে সংগ্রহ করা হয়। রিজেন্টকে বলা চলে শাসন যন্ত্র, কারণ প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ডাচ রেসিডেন্ট বা এ্যাসিষ্টাণ্ট রেসিডেন্টের হাতেই থাকে। এঁরা শাসন ব্যাপারে রিজেন্টদের মন্ত্রণাদি প্রদান করেন। জাভানীজদের নিকট রিজেন্টরাই হচ্ছে মধ্যবর্তী প্রতিনিধি যাদের সংস্পর্শে এরা আসবার সুযোগ পায়। এইভাবেই তথাকথিত দেশীয় শাসনের অভিনয় চলে এসেছে এবং কিছুকাল এই শাসন ব্যবস্থায় সাফল্যও দেখা গিয়েছে। রিজেন্টের সংগে আর একটি মন্ত্রণা পরিষদ বা রিজেন্সি কাউন্সিল যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এর সদস্যরাও কিছু নির্বাচিত এবং কিছু মনোনীত। এই মন্ত্রণা পরিষদেরও শুধু মাত্র মন্ত্রণা বা পরামর্শ দানের ক্ষমতাই আছে—এমন কি স্থানীয় কর বসানরও কোন ক্ষমতা নেই। কর বসানর প্রস্তাবও বড়লাট বা গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়।

জাভানীজদের জীবন যাত্রায় রিজেন্টদের এক সময় যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদের প্রসারের ফলে এই অবস্থার যথেষ্ট ব্যত্যয় ঘটেছে। বস্তুতঃ শাসন কর্তা হিসেবে এদের মর্যাদার অনুরূপ পর্যাপ্ত ক্ষমতা নেই। বরং এদের কমবেশী ডাচ রেসিডেন্টের শাসন যন্ত্র মাত্র বলা চলে। তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট

এদের পদমর্যাদারও যথেষ্ট অপহ্নব ঘটেছে। ক্ষমতাও নেই আবার জনসাধারণের নিকট যে সম্মান প্রতিপত্তি ছিল তাও দ্রুত হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে কাজেই এই বিসদৃশ অবস্থায় রিজেণ্টরাও খুশী নন এবং প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে রিজেণ্ট হবার ঝোঁকও কমে আসতে লাগল ক্রমশঃ। বস্তুতঃ এই রাজনৈতিক ক্ষমতা আকাংখী জাতীয়তাবাদীতার প্রসারের ফলেই নিঃসন্দেহ বলা চলে যে রিজেন্সি প্রথার প্রয়োজনীয়তার অবসান ঘটেছে।

বহিঃপ্রদেশে রিজেন্সি প্রথা নেই। সেখানে সোজাসুজি শাসন-কার্য চলে। ইন্দোনেশিয়ার দশ ভাগের নয় ভাগ সুমাত্রা, বোর্ণিও ও বৃহত্তর প্রাচ্য এই তিনটি প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রদেশ এক একজন গভর্ণরের অধীন। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় তখন শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সংগঠন চলছিল।

শাসন ব্যবস্থার দ্বৈতনীতি প্রায় সকল বিভাগেই প্রত্যক্ষমান। অর্থ নৈতিক দ্বৈতভাব এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দুর্নীতি পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি।

রত্নদ্বীপ ইন্দোনেশিয়ার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ডাচ সরকারের মমতা প্রশান্ত মহাসাগরের মতই গভীর! আবাদ এলাকায় শ্রমিক ও চাষারা দিন মজুরী পায় গড়ে তিন আনা থেকে ছয় আনা। ১৯৩৬ সালের হিসেবে প্রকাশ যে রাজস্বের শতকরা তিন ভাগেরও কম জাতির স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়িত হয়। সাত কোটী লোকের জন্য পাঁচশ' হাসপাতালে আছে তেষট্টি হাজার বেড। প্রতি ষোল হাজার ইন্দোনেশিয়ানের জন্য একটি ডাক্তার আছে এখানে। ইন্দোনেশিয়ায় শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ২১।

শাসনতান্ত্রিক সব দপ্তরের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব গভর্ণর জেনারেলের। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ গোয়েন্দা বিভাগ সবচেয়ে প্রবল ও ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন। সকল প্রকার সভাসমিতিতে এদের অবাধ বিচরণ—ধরপাকড়, সভাভঙ্গ ও পরোয়ানা জারীর ব্যাপক ক্ষমতাও এদের হাতে। শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য বক্তৃতা লেখা অথবা

প্রাচীর পত্রের সুযোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ এবং তার জন্য কঠোর শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া যারা দেশের তথা-কথিত শান্তি অর্থাৎ দেশের ঝিমিয়েপড়া অবস্থাকে নূতন কর্মশক্তিতে জাগ্রত করতে চায় তাদের জন্য ওলন্দাজ সরকার কয়েকটি স্থান বা 'ভূস্বর্গ' নির্বাচন করে রেখেছেন এবং সেইসব 'দেশপাগল' কর্মীকে সেখানে নির্বাসনে পাঠান হয়। এই আইনের সংযোজনায় বলা হয়েছে যে নির্বাসন দণ্ড দেবার জন্য কোন বিচারের প্রয়োজন নেই।

আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এখানে দ্বিমুখী নীতি। ইন্দো-নেশিয়ানদের জন্য এক প্রস্ত আইন আর এক প্রস্ত য়ুরোপীয়ানদের জন্য। এই বিভিন্ন ব্যবস্থার যুক্তি স্বরূপ বলা হয় যে স্থানীয় আইনের আওতায় স্থানীয় লোকেরা বেশী সুবিধা পায়। য়ুরোপীয়দের বিচার করবার ক্ষমতা এর রাজমুকুটের প্রতিনিধি কোর্টের অধীন অর্থাৎ সে সমস্ত আদালতের বিচারকেরা হবেন য়ুরোপীয়।

ইন্দোনেশিয় রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য ডাচ সরকার দুটি বন্দী নিবাস করে রেখেছেন তানামারায় এবং তানাদিতে। এই দুটি ডাচ নিউগিনির ডেলো নদীর উজানমুখে অবস্থিত। এই সব বন্দীনিবাসে যেসব রাজনৈতিক কর্মীরা নির্বাসিত হয় তারা প্রায় আর ফিরে আসে না। ডাচ নিউগিনির হল্যাণ্ডিয়া এলাকা জাপানী কবলমুক্ত করার পর অষ্ট্রেলিয়ানরা বন্দীশালা থেকে বহু বন্দীকে মুক্তি করে। এদের মধ্যে অনেকেই বহু বর্ষ বন্দীজীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল ডাচ সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার অভিযোগে। এইসব মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীরা জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে যুদ্ধের বৎসরগুলিতে। ডাচ পুনরধিকারের পর সেইসব মুক্ত বন্দীদের আবার কারাপ্রাচীরের অন্তরালে প্রের করবার আশু ব্যবস্থা হয়েছে এমন সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে। এইসব কারণেই সাম্প্রতিক বিদ্রোহের সময় বাটাভিয়ার ইন্দোনেশিয়ানরা রব তুলেছে—'কলোনীর কুশাসনের মধ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে নরকে যাওয়া ভাল।'

এসব ছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনে ইন্দোনেশিয়ান নাগরিক ও গ্রামীন মানুষকে কতকগুলি অত্যন্ত হীন ও অপমানজনক আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করতে হয়। কোন ওলন্দাজ রাজকর্মচারীর প্রতি অপমান-জনক আচরণের জন্য শাস্তি নির্দিষ্ট আছে। কোন ডাচ নাগরিককে ডাচ ভাষায় সম্বোধন করাও এক ধরণের অপরাধ বলে গণ্য।

ডাচ আদালতে বিচারকের সম্মুখে কোন এশিয়াবাসী দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মেঝেতে মাদুরের উপর তাকে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। এইত গেল বেসামরিক শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১৯৩৮ সাল অবধি ইন্দোনেশিয়ায় দেশরক্ষা ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। হল্যাণ্ডও প্রাচ্যে ব্রিটিশ নৌ-ছত্র ছায়ায় নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। হংকং, ম্যানিলা ও সিংগাপুরের ত্রিভুজের আওতায় নিজেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদই মনে করেছিল এতদিন। ইন্দোনেশিয়ান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ডাচদের মনে একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব এনে দিয়েছিল। কাজেই স্থানীয় লোকদের সামরিক শিক্ষা প্রদানের কথা গভীরভাবে কোনদিনই চিন্তা করা হয়নি। জাভায় জনপ্রিয় ও জাতীয়তাবাদী নেতা ডেকারের সময় থেকেই ডাচদের মনে এ ভয় বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে একদিন এই ধনবান ইউরেশিয়ান জনগোষ্ঠী, যাদের তারা ভারতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মত এতদিন বন্ধুভাবে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, সাহায্য করেছে নানাভাবে তারাই হয়ত একদিন নিজেদের ভাগ্যকে ইন্দো-নেশিয়ার ভাগ্যের সংগে জড়িত করবে। প্রগতিশীল বর্ণসংকররাই একদিন স্থানীয় লোকদের হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিতে পারে যেমন করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিদাতা সাইমন বলিভার। এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই ভারতে বৃটিশশাসকবৃন্দ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের পর থেকে এই বিপদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছে। ইন্দোনেশিয়ায় য়ুরোপীয়ান ও ইউরেশিয়ানরা সমশ্রেণীভুক্ত এবং একজন ডাচ যে সুযোগ সুবিধার অধিকারী ইউরেশিয়ানরাও

তাই ভোগ করে। ইউরেশিয়ানদের নিয়ে দেশরক্ষা ব্যবস্থা একটা কিছু করা হয়ত চলত কিন্তু ডেকার সংক্ষেপে ডি, ডি,'র অভ্যুত্থানে সে-সম্ভাবনা মুকুলেই ঝরে গিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ান ও ইউরেশিয়ানদের নিয়ে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া গঠনের জন্য ডি, ডি,'র 'ভারতীয় সংঘের' সৃষ্টিতে ইউরেশিয়ানদের আর রাজানুগত বলে গ্রহণ করার চিন্তা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেল। ইউরেশিয়ানরা ইন্দোনেশিয়াকেই আপন মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করেছে এবং য়ুরোপীয়ান স্বার্থ থেকে নিজেদের ক্রমশঃ মুক্ত করে নিয়েছে। এই প্রগতিশীল মনোবৃত্তির জন্য জাতীয়তাবাদী নেতা ডেকারেরই প্রধান কৃতিত্ব। এর ফলে য়ুরোপীয়ানরা ইন্দোনেশিয়ায় ন্যূনতম লঘিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকশ্রেণীর যে দুর্বল আতংক ও সন্দেহ তাই তাদেরও অস্তিত্বকে জর্জরিত করে তুলেছে। এই অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রত্যাশিত পরিণতির জন্য ইন্দোনেশিয়ায় শিল্পোন্নতি ও অন্যান্য আত্মরক্ষামূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা আর সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

এশিয়ায় বৃটিশ এবং ডাচ প্রায় সমসাময়িক। ভারতের বিস্তৃত ভূভাগে জমি নিয়ে যখন বৃটিশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে মন দিল ততক্ষণে রত্নদ্বীপ ইন্দোনেশিয়ায় ডাচেরা বেশ জমিয়ে বসেছে।

ডাচ ব্যবসায়ীরা যখন ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে পড়ল তখন পর্তুগীজদের আসন টলমল করছে—তাদের সরিয়ে দিতে ডাচদের বিলম্ব হোল না। ডাচ ব্যবসায়ী কোম্পানী কয়েকটি দ্বীপে তাদের ব্যবসার ঘাঁটি নির্মাণ করল। অবশ্য রত্নদ্বীপের ডাচ ব্যবসায়ীরা পা দেবার আগে যে ভগ্নদূতটিকে পাঠিয়েছিল তার নাম জন পিটারস। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার নাম করে এই ভদ্রলোক মোটামুটি ভাবে জাভায় বাণিজ্যিক সম্ভাবনার এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পাঠান ডাচ সরকারের কাছে। এই সময় জাভার প্রতাপ চূর্ণ হয়ে গেছে। ছোট ছোট সম্রাটের অধীনে পরস্পর বিরোধী ছোট ছোট রাষ্ট্রে

বিভক্ত হয়ে পড়েছে জাভা। সুতরাং ডাচ সরকারের পক্ষে একের বিপক্ষে আর একেকে লাগিয়ে দিয়ে এবং প্রয়োজন বোধে চক্রান্ত, রাহাজানি ও খণ্ডযুদ্ধের পথে ধীরে ধীরে বাণিজ্যিক একচেটিয়া অধিকার লাভের সম্ভাবনা কম বলে মনে হয়নি। ভারতবর্ষেও যা হয়েছে ইন্দোনেশিয়াতেও সেই একই কাহিনী।

বাণিজ্যিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে নৌ-বহর ও সৈন্য সমাবেশের প্রয়োজন হয় প্রথমতঃ ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীতা ঠেকান'র জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে। ছোট ছোট রাষ্ট্রের ক্ষুদে কর্তাদের সংগে চুক্তি করে এই ঘাঁটি নির্মিত হয় এবং অপর রাষ্ট্রের সংগে যুদ্ধের সময় তাকে সৈন্য ও নৌ-বহর সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই অনধিকার সুবিধা আদায় করা হয়।

১৬১৯ সালে বাটাভিয়ায় ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদর ঘাঁটি বসল। ১৬৪১ সালে জোহারের রাজার সহযোগিতায় পর্তুগীজদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে ডাচ কোম্পানী সারা ইন্দোনেশিয়ায় খুশীমত ব্যবসা ও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে লাগল। প্রতিদ্বন্দ্বীতা হ্রাস করার জন্য এবং বিরোধী রাষ্ট্রের গলা টিপে দেবার জন্য এই সময় ডাচ কোম্পানী যে উৎপীড়ন ও রাহাজানি চালিয়েছে তার তুলনা নেই কোন সভ্য মানুষের ইতিহাসে। কোম্পানীর কর্মচারীরা বৃটীশ এবং পর্তুগীজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর অত্যাচার করেছে—অবশ্য তারাও তার প্রতিশোধ নিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। কোম্পানীর আমলে কৃত আত্ম পাপপ্রক্ষালন-কারী অনেক কাহিনীই চালু করা হয়েছিল। ছোট ছোট স্থানীয় রাজাদের বিরুদ্ধে জঘন্য অত্যাচারের অপরাধ চাপানো হয়েছে কিন্তু তার তুলনায় য়ুরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির ক্রুরতা ও দানবিকতা ইতিহাসের কলংকিত অধ্যায়ে অক্ষয় হয়ে আছে এবং থাকবে।

এমনিভাবে অসত্য ও অন্যায় আচরণের সুড়ংগ পথ ধরে ডাচ কোম্পানী তার শক্তি বৃদ্ধি করে চলতে থাকে। দেড়শ' বছর ব্যবসায়ের ইতিহাসও তেমনি নারকীয়। এমনি করে ডাচ কোম্পানীই সর্বময় কর্তা হয়ে বসল, রাষ্ট্রগুলি হোল তাঁবেদারী ভৃত্য।

আমদানী রপ্তানীর নির্দেশ দেয় কোম্পানী—কর ও শুল্কের নির্দেশ দেয় কোম্পানী। জনসাধারণের কাছ থেকে এত উচ্চ হারে রাজস্ব আদায় করা হয় যার ফলে গরীবদের জিভ বেরিয়ে আসে। তার উপর কোম্পানীর কর্মচারী ও তাদের ইন্দোনেশিয়ান ভৃত্যের দল তাদের উপরি আদায় করে। কর দিতে না পারলে তার শাস্তি মৃত্যু যন্ত্রণার চেয়েও নির্মম।

এমনিভাবে কোম্পানীর আমলেই দেশের জনসাধারণ কোম্পানীর লোকদের উপর আক্রোশে ফুলতে থাকে। অনাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে ক্রমশঃ, অথচ কোম্পানীর রাজস্বের তহবিলে ঘাটতি পড়তে থাকে। অবশেষে ডাচ সরকারের নির্দেশে কোম্পানীর আমল শেষ করে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোল।

ডাচ সরকারের আমলে কিছু কিছু অনাচারের লোপ করা হোল বটে কিন্তু অত্যাচার ও শোষণ চালু রইল প্রায় সমান তালে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভ চলতে লাগল আর চলতে লাগল বৃটিশের সংগে শত্রুতা। এই দু'য়ের ফলে দ্বীপপুঞ্জের সংগে বহির্জগতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়েই রইল।

১৮১১ সালে য়ুরোপে ডাচ সরকারের দুর্দিন এল ঘনিয়ে। নেপোলিয়ানের বিজয়ী বাহিনীর কাছে হল্যাণ্ড আত্মসমর্পণ চুক্তি করল। তার অনিবার্য ফলে ইন্দোনেশিয়া একবার জেগে উঠে স্বাধীন হবার সুযোগ পেল কিন্তু শতধাচ্ছিন্ন দেশে এমন কোন নেতা অথবা রাষ্ট্রশক্তি তখন ছিল না যার নেতৃত্বাধীনে এই বিদেশী দস্যুদের চিরকালের মত ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ থেকে নির্বাসিত করা চলে। ডাচ সরকার তার শত্রু ইংরেজের হাতে সমর্পণ করল ইন্দোনেশিয়ার ভাগ্যকে। ইংরেজ লোভীর মত হাত বাড়িয়ে নিল্ এই রত্নদ্বীপের কর্তৃত্ব ভবিষ্যতের আশায়। বৃটিশের চার বৎসরের কর্তৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় আর কোন রাষ্ট্র বাকী রইল না ভেঙে পড়তে। ১৮১৫ সালে ডাচ সরকার বৃটিশ গভর্ণর র‍্যাফেলসের হাত থেকে ইন্দোনেশিয়ার শোষণ বলগা ফিরিয়ে নিল নিজ হাতে।

১৮২৫ থেকে ১৮৩০ ডাচ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ইতিহাস। সুমাত্রা শৃংখলিত হোল। শেষ প্রতিরোধ দিয়েছিলেন একজন জাভানীজ রাজপুত্র। তাঁর নাম আজও জাভায় অক্ষয় হয়ে আছে। এক আপোষ আলোচনায় নিমন্ত্রণ করে এনে ডাচ গভর্ণর তাঁকে হত্যা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এলজে দখলের সংগে সংগে সমগ্র ইন্দোনেশিয়া অধীন হয় ডাচ শাসনের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ললাটে বহুদিনের জন্য বৈদেশিক শাসন ও শোষণের কলংক গভীর রেখায় অংকিত হয়ে ওঠে।

ডাচ শাসনের অনেক দুর্নীতির মধ্যে জবরদস্তি আবাদের চেষ্টাই হোল জঘন্যতম। জাভায় বিস্তীর্ণ কয়েকটি এলাকায় জবরদস্তি আবাদ করতে হোত একমাত্র রপ্তানীর জন্য। এখানে ভারতের নীলকুঠীর অত্যাচারের উপমা মনে আসে। এর ফলে একদিকে ডাচ সরকারের তহবিল যেমন ফেঁপে উঠতে লাগল অপরদিকে স্থানীয় জাভা চাষীদের অবস্থা হোতে লাগল নিদারুণ কষ্টের। সেইসব দিনের কথা আজও কোন ইন্দোনেশিয়ান ভোলেনি।

ডাচ শাসনে ইন্দোনেশিয়ার নামে মাত্র মংগল হয়েছে কিন্তু ইন্দোনেশিয়া তিনশ’ বছর রক্ত দিয়ে সেইটুকুর দাম দিয়ে আসছে।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় জাগরণের ইতিহাস রোমাঞ্চকর। কলোনী শাসন ব্যবস্থার অধীনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ধীরে ধীরে অবলুপ্তির ধাপে ধাপে নেমে যায়—মনুষ্যত্বের অপমানে দিনে দিনে ক্ষুদ্রতা ও হীনতা এসে বাসা বাঁধে তাদের অপরিসর সামান্য জীবন যাত্রায়। মানুষকে মনুষ্যেতর করার লক্ষ্য হোল কলোনী শাসনের। কিন্তু আর একদিকে নাগরিক জীবনে গড়ে ওঠে বিলাস আর সমৃদ্ধি। অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক নরনারী শাসক সম্প্রদায়ের সংগে বিভীষণ সম্প্রীতি করে আরামের শয্যা রচনা করে। তারা শিক্ষার সুযোগ পায়—দাস-করা শাসন ব্যবস্থা অটুট রাখবার জন্য নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং ধার করা শক্তি নিয়োজিত করে—দেশের

জনচেতনাকে ক্লীবত্বের নরকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষায় কুশলী হয়ে ওঠে। কলোনী শাসন সুদৃঢ় হয়।

কিন্তু ইতিহাসের অশ্রুত ইংগিতে আর একদিক থেকে ভাঙনের গতি সুরু হয়। শিক্ষিত মানুষের মনে এক সময় ঝলকে ওঠে সম্পূর্ণ এক বিরুদ্ধভাব। যে মাটি থেকে জন্ম সেই মাটির প্রতি একটা কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয় মানসে। সব কলোনীর সংগ্রামী ইতিহাস এক।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একজন অবসরভোগী সরকারী ডাক্তার তার কয়েকটি শিক্ষিত প্রতিবেশীকে নিয়ে ছোট একটি বৈঠক করতেন। ডাঃ সুটোমো বলতেন যে ডাচ শাসন অবসানের দ্রুততার জন্য এখনি আমাদের গণ আন্দোলন করলে চলবে না—কারণ দেশের লোক তৈরী নয়। তারা শিক্ষায় দীক্ষায় আধুনিক যন্ত্রযুগের সমস্ত কৌশলে এবং স্বাস্থ্যে এখনও অত্যন্ত পিছিয়ে পড়ে আছে। সুতরাং দেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়াইয়ের শক্তি সঞ্চয় করতে হলে আগে আমাদের অভিযান চালাতে হবে অশিক্ষাকে দূর করতে এবং অস্বাস্থ্যতার নির্বাসনের দিকে। এইভাবে সমাজ সংস্কার ও অগ্রগতির দিক দিয়ে এগোলে দেশের গণচেতনা আপনিই শক্তি খুঁজে পাবে।

এমনিভাবেই প্রথম গণজাগরণের সূত্রপাত।

১৯০৮ সালে প্রথম জনসংঘ গড়ে উঠল জাতীয়তাবাদী ভংগী নিয়ে—তার নাম হোল 'Boedi Oetomo'। জাভায় হোল তাদের মূল ঘাঁটি। এর কারণ আর কিছুই নয়—সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে জাভাই বহুদিন ধরে সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের কেন্দ্রমূল হয়ে আছে। সেখানকার মানুষদের মধ্যে একতাবোধ বংশপরম্পরায় চলে এসেছে। তারাই শিক্ষিত বেশী। এই দলের মধ্যে অধিকাংশই আমষ্টার্ডম শিক্ষিত ইন্দোনেশিয়ার নওজোয়ান। বোয়েডী অটোমো দাবী জানাল ইন্দোনেশিয়ানদের জন্য বিনামূল্যে উন্নত ধরণের উচ্চ শিক্ষা এবং শ্রমিকদের বেতনের হার বৃদ্ধি। এ ভিন্ন শাসন সংস্কারের

প্রতিও তারা দেশের জনসাধারণ ও শাসকবর্গকে সচেতন করে তুলবার চেষ্টা করল। মনে রাখা প্রয়োজন যে এর কিছুদিন আগেই নবজাগ্রত জাপান য়ুরোপের ভল্লুক রাশিয়াকে পরাজিত করেছিল। জাপানের এই জয়ে জাপান প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়াই শুধু নয় সমগ্র পরাধীন এশিয়ার বন্দী আত্মা এক নূতন প্রেরণা লাভ করেছিল। ধীরে ধীরে বোয়েডী অটোমো তার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করে তুলতে লাগল। দু' তিন বছরের মধ্যেই দেখা গেল আবাদী এবং শ্রম এলাকায় বোয়েডী অটোমো'র কর্মীরা ইন্দোনেশিয়ার কিষাণ ও শ্রমিকদের মধ্যে অনেকখানি জাগরণ আনতে পেরেছে। তা ছাড়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ভংগীকেও হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে সম্পূর্ণ নূতন পরিপ্রেক্ষিতের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শারেকাত-ই-ইসলাম (Sarekat-i Islam)। এরা ধর্মের ভিত্তিতে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার দেশপ্রেমকে সংহত করবার চেষ্টা করে। 'দেশাত্মবোধ ধর্মেরই অংগ'—এই ছিল তাদের শ্লোগান। জনসাধারণের ভিতর ধর্মের নামে প্রচার স্থরু হোল। বোয়েডী অটোমোর কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করল এই নব-প্রতিষ্ঠিত জনসংঘ। ডাচ শাসকশ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা লাঞ্ছিত হোতে লাগল। অনেকেই তানামারায় নির্বাসিত হোলেন।

আগেই বলা হয়েছে যে তখনকার দিনে ইন্দোনেশিয়া সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশ। সে দেশের শিল্পোন্নতি হয়নি। সে দেশে কৃষি চলে অত্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতিতে। শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক প্রগতি রুদ্ধ হওয়ার জন্য সেখানকার অধিকাংশ মানুষ অন্ধকারের বাসিন্দা। তা ভিন্ন ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত প্রযুক্ত মূলধনই য়ুরোপীয় জাপানী, আরবীয়, চীনা এবং অন্যান্য জাতির। ইন্দোনেশিয়ান পুঁজি-বাদীর জন্ম হয়নি তখনো। এর সঙ্গে ইউরেশিয়ানদের মনোবৃত্তির ফলে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার সংহত শক্তি আকাংখার প্রবলতায় দুর্বার হয়ে উঠবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এখনো অবধি ইন্দোনেশিয়ান রাজনৈতিক নেতারা ডাচ রাজ-মুকুটের আওতায় স্বায়ত্বশাসনকেই সর্বোত্তম বলে মনে করতেন।

এমন সময় এল রাশিয়ার বিপ্লব। পিছিয়ে পড়া দেশ রাশিয়া জারের জঘন্য অত্যাচারে পর্যুদস্ত। কিষাণ মজুর যেভাবে সে দেশে নূতন সূর্যালোক নিয়ে এল তাতে সর্বদেশের শৃংখলিত পদদলিত মানুষ জয়াশার নূতন বাণী শুনতে পেল।

১৯১৭ সালে শারেকাত-ই-ইসলামের জাতীয় কংগ্রেস তার অধিবেশনে প্রথম ধ্বনি তুলল—'আমরা ডাচ শৃংখল ভাঙতে চাই। পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।'

জাতীয় সংগ্রামের কণ্টকিত পথে দেশের আধা-য়ুরোপীয়ান জন-সমাজ অনেক দান দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের তারা অগ্রগামী সৈনিক। তাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসার অন্যান্যদের চেয়ে বেশী। সুতরাং তাদের অধিকাংশের মধ্যেই স্বাধীনতার বোধ প্রবল। স্বাধীন ইন্দো-নেশিয়ায় তারা যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিনয় করবে এ আশা তাদের বরাবরের। ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ প্রতিষ্ঠার অন্যতম কর্মী ইউ-রেশিয়ান নেতা ডেকার। স্বাধীনতা লীগ দূর প্রাচ্যের সবকটি পরশাসিত দেশের জাতীয় রাজনৈতিক দলের পৃষ্টপোষকতায় এবং সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় নেতারাও ছিলেন—বিশেষ করে পণ্ডিত জওহরলাল। ডেকারের নেতৃত্বে এই স্বাধীনতা লীগ ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অভ্যুত্থানকে আরো দ্রুত লয়ে মুক্তির পথে অগ্রবর্তী করেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে বাটভিয়ায় শ্রমিক সংঘ গড়ে ওঠে। সারা দ্বীপপুঞ্জে শাখা প্রসারিত হতে থাকে দ্রুতগতিতে। এইসব শ্রমিক ইউনিয়ন সেই এক দাবী নিয়ে জনসাধারণের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। উচ্চহার বেতন এবং বাধ্যতামূলক বিনামূল্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা। এইসব শ্রমিক ইউনিয়নের দাবী সরাসরি অস্বীকার করায় এবং তাদের কর্মীদের দৈনন্দিন গতিবিধির উপর অন্যায় জুলুম চাপানোতে দেশে ধর্মঘট সুরু হয়। অধিকাংশ কারখানা, বিশেষ

(লাইফ)

(উপরে) **“মুক্তি চাই, শান্তি চাই, চাই ন্যায়-নিষ্ঠনীতি** রক্ত দিয়ে নেভাতে চাই পরাধীনতার আগুন।” এই বাণী ধ্বনিত হচ্ছে জনগণের কণ্ঠে, লিখিত হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার গৃহদ্বার ও অলিন্দে।

(নিম্নে) **“স্বরাজ চাই”** — বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হচ্ছে সোয়েরাবাজার পথে পথে সাধারণতন্ত্রের শ্বেতরক্ত পতাকাবাহী ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিকামীদের সহস্র কণ্ঠে।

করে বিদেশী শোষণের ঘাঁটি চিনি কলগুলিতে প্রবল বিক্ষোভ সুরু হয়।

১৯২০ সালে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। দ্বীপমালার জাতীয়তাবাদী সর্বদলকে এক ফ্রণ্টে সমবেত করে সাম্রাজ্যবাদকে শেষ আঘাতে বিধ্বস্ত করবার জন্য দেশ প্রস্তুত হতে থাকে। ধর্মঘট চলে। ট্রাম ও অন্যান্য যানবাহন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। গভর্ণর জেনারেল এই গণ আন্দোলনকে কঠোরতার সংগে দমন করবার চেষ্টা করলেন। মিটিং ও শোভাযাত্রার উপর নিশেধাজ্ঞা জারী হোল, শ্রমিক কর্মীদের অনেকেই নির্বাসিত এবং কারারুদ্ধ হলেন।

১৯২৩ সালের মধ্যে কমিউনিষ্ট আদর্শ সারা দেশের জনমতকে এমন ভাবে জাগিয়ে তুলেছিল যে ধর্মের বাতাসে রাজনৈতিক প্রগতির ধারণাই পরিবর্তিত হয়ে গেল। সারেকেট-ই-ইসলামের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে নিষ্কাশনের ফলে নূতন যে পার্টি গড়ে উঠল তার নাম সারেকেট-ই-মেঁ। এই পার্টি দেশের সর্বমতের লোককেই ঐক্য বন্ধনে পেল। ইন্দোনেশিয়ার বিদেশী শাসন বরবাদ করতে হলে প্রথম ঘা দিতে হবে বৈদেশিক রপ্তানীর উপর এ বুঝতে তাদের দেরী হয়নি। সুতরাং সর্বশক্তি সংহত করে এর রপ্তানী বন্ধের দিকে তা প্রয়োগ করবার চেষ্টা সুরু হোল। ১৯২৫ সাল থেকে সুরু হোল শ্রমিক ধর্মঘট, কারখানা শ্রমিকদের নিষ্ক্রিয় উপস্থিতি এবং আরো নানারকমের প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকতা। ১৯২৬ সালের নভেম্বর থেকে ১৯২৭ সালের জানুয়ারী অবধি জাভা ও সুমাত্রায় বিদেশী মাল বয়কট আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করল। এ আন্দোলনের জন্য ইন্দানেশিয়ার নেতারা আবার কারগারে বন্দী হলেন অথবা ডাচ নিউগিনির বন্দীশালায় নির্বাসিত হলেন। মৃত্যুদণ্ডও পেলেন কয়েকজন শহীদ।

১৯২৭'র গোড়ার দিকে এই গণ আন্দোলন আবার রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসে উঠল: সাম্প্রতিক সশস্ত্র বিদ্রোহ ও অস্থায়ী গণ-

তান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার আগে ইন্দোনেশিয়ার জীবনে সেই বৃহত্তম গণবিক্ষোভ। সারা দেশে খণ্ডযুদ্ধ ও ধর্মঘট চলতে লাগল। ডাচ সরকার এই আন্দোলন থামাবার জন্য সর্বপ্রকার শাস্তি ও অত্যাচারের আমদানী করলেন। সাড়ে চার হাজার ইন্দোনেশিয়ান কারাগারে নিক্ষিপ্ত হোল। তানামারা এবং তানাটিংগির বন্দীশিবিরে প্রেরিত হোল তেরশ'। কমিউনিষ্ট পার্টি অপ্রকাশ্যে চলে গিয়ে কাজ করতে সুরু করল। সেই অবধি ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি অন্তরালে রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধের মধ্যে জাপানী শাসনকালে এবং যুদ্ধোত্তর ম'সগুলিতে ডাচ-জাপানী-ভারতীয়-বৃটিশ যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে সার্থকভাবে।

তানামারা ও তানাটিংগি বন্দীশিবির ইন্দোনেশিয়নেদের কাছে পবিত্র হয়ে উঠেছে, কেন না ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামী বীরেরা এইসব শিবিরে জীবনের বহু অমূল্য বর্ষ কাটিয়েছে। এইসব বীর বন্দীরা দেশের মুক্তির প্রতীক।

১৯২৭ সালের গণবিক্ষোভের পর ডাচ সরকার চূড়ান্ত বিভীষিকার রাজ্য করে তুলল ইন্দোনেশিয়াকে। সর্বপ্রকার জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান বরবাদ হোল এবং দেশের নেতা ও কর্মীরা বিন্দুমাত্র সন্দেহাত্মক আচরণের ফলে বন্দী হতে লাগলেন। শারেকাট-ই-মেঁয়া এবং ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টি আত্মরক্ষার জন্য গুপ্তভাবে কাজ চালাতে লাগল। এই সময় ডাচ সরকার নূতন গঠিত পার্টি 'জাতীয়তা-বাদী ইন্দোনেশিয়া সংসদ'কে স্বীকার করলেন। এই পার্টির উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই ছিলেন হল্যাণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ ইন্দো-নেশিয়ান। ডাঃ সুকর্ণ এবং মহম্মদ হাত্তা—এঁরা দু'জনেই সেই পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন। এই পার্টির কণ্ঠেই আজকের সারা ইন্দো-নেশিয়ার জাতীয় সংগীত—'Indoonese Rajaa'—ধ্বনিত হয়ে ওঠে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় পতাকা এই পার্টিরই দান। কিন্তু ১৯২৯ সালের মধ্যেই এই নূতন রাজনৈতিক পার্টিও রাজরোষে পড়ল। পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হোল—নির্বাসিত হলেন ডাঃ

(টাইম)

ঝাণ্ডা উচা রহে হামারা! বাটাভিয়া প্রাসাদের বাইরে সোয়েকর্ণ ও তাঁর দেহরক্ষীদল ইন্দোনেশিয়া রিপাবলিকের জাতীয়পতাকা অভিবাদন করছেন। শ্বেত ও রক্ত বর্ণের এই জাতীয়পতাকা জাভায় দ্বাদশ শতাব্দীর হিন্দুরাজত্বের প্রতীক বলে কথিত।

সুকর্ণ ও হাত্তা। সেই সংগে ডাচ সরকারের ঘোষণায় সর্বপ্রকার আন্দোলনও বে-আইনী ঘোষিত হোল। দমনমূলক ব্যবস্থার ভয় দেখিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় চিরস্থায়ী শোষণ ব্যবস্থা চালু রাখবার ষড়যন্ত্র করল ডাচ সরকার।

এইখানে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের পরিচয় দেওয়া দরকার। ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণ, বিশেষ করে জাতীয়-কংগ্রেসের আন্দোলন সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে এবং উদ্বুদ্ধ করেছে। গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা নীতিই যে অসহায় কলোনী বাসিন্দার একমাত্র অস্ত্র এ তারাও বুঝেছিল। বিদেশী বেনিয়া শাসক রাষ্ট্রকে গুরুতর আঘাত দিতে হলে তাদের বাণিজ্যিক শাসনের গলা টিপে ধরতে হবে এবং রক্ত দোহনকারী কর ও শুল্ক দেওয়া বন্ধ করতে হবে—এ বুঝতে জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিলম্ব হয়নি। বিদেশী বর্জন, কর বন্ধ এবং ধর্মঘট এই তিন পাশুপাতের সাহায্যে শাসক শক্তিকে অহিংস উপায়ে ধীরে ধীরে দুর্বল করতে হবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতারাও অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়েছিল। তার মধ্যে হিংসা এসেও পড়েছে কখনো কখনো। কিন্তু গান্ধিজীর আদর্শ থেকে তারা স্বেচ্ছায় বিচলিত হয়নি।

পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণ কনিষ্ঠতম। এখন তার বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ। দেশের লোক তাকে বলে 'জাভার গান্ধী।' তরুণ সুকর্ণর বাগ্মীতায় জনসাধারণের স্বাধীনতার আকাংখা বারে বারে সত্যপথ খুঁজে পেয়েছে—বিভেদ এবং বিচ্যুতি থেকে আত্মরক্ষার অস্ত্র পেয়েছে।

১৯২৯ সালে ডাচ সরকার এই তরুণ ইঞ্জিনিয়রটিকে চার বৎসরের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু দু বৎসরের পর তিনি মুক্তি পান। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে এই তরুণ ইন্দোনেশিয়ান বীর নিজের ভবিষ্যৎ জীবনকে আরো স্বচ্ছভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন।

দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য সমর্পণ করলেন তিনি নিজের জীবনকে। রাজনৈতিক জীবনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯৩৩ সালে রাজরোষ আবার পড়ল তাঁর উপর। ফ্লোরেশ দ্বীপে নির্বাসিত হলেন তিনি। কয়েক বৎসর পরে শুমাত্রার বন্দীশালায় বদলী করা হোল তাঁকে। দূর প্রাচ্যে যুদ্ধ বাধবার সময় অবধি দীর্ঘ কয়েকটি বৎসর তিনি সাম্রাজ্যবাদের নরকে কাটাতে বাধ্য হয়েছেন।

এই বয়সের মধ্যে শাসক রাষ্ট্রের উৎপীড়ন তিনি সহ্য করছেন প্রচুর। দেশের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ তাঁকে দেশের বরেণ্য করে তুলেছে। আজ দেশে বিদেশে অনেকেই তাঁকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সংগে তুলনা করেন। আদর্শ ও কর্মশক্তির দিক দিয়ে এই দুই শ্রেষ্ঠ মানুষের অনেকখানি সাদৃশ্য।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে সুকর্ণ হল্যাণ্ডে গেলেন ইঞ্জিনিয়ারীং শিখতে। দেশে যখন ফিরলেন, সংগে করে আনলেন একটা ডিগ্রী কিন্তু মনের দিক থেকে তাঁর যা বিবর্তন হোল তা আশ্চর্য। হল্যাণ্ডের ছাত্র আন্দোলনের সংগে তাঁর ছিল সক্রিয়যোগ। দেশে ফিরে তিনি দেশবিদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করতে লাগলেন। বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং মহাত্মাজীর পরিকল্পিত মতকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করলেন।

এই সময়ই ডাঃ মহম্মদ হাতার সহযোগিতায় 'ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী সংসদ' গড়ে তোলেন।

জাপানী অধিকারের বৎসরগুলিতে সুকর্ণ গোপনে জাপানী বিরোধী আন্দোলন চালিয়েছেন এবং দেশের লোককে প্রস্তুত করেছেন উপযুক্ত সুযোগ নেবার জন্য। যে মুহূর্তে জাপান আত্ম-সমর্পণ করেছে ডাঃ সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় বল্গা জনসাধারণের প্রতিনিধি লোকায়ত্ত সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তিনি ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন।

১৯২৭ সালে কলোনী বিরোধী লীগের অধিবেশন হয় ব্রুসেল্‌সে। সেখানে ডাঃ হাতার সংগে পণ্ডিত জওহরলালের পরিচয় এবং সে-পরিচয় পরে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তিনিই এখন ইন্দোনেশিয়ার গণতান্ত্রিক পরিষদের সহ-সভাপতি। পণ্ডিত জওহরলালকে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ তিনিই করেছিলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকারের নানা অজুহাতে পণ্ডিতজীর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি ইন্দোনেশিয়ায়।

ডাঃ স্থকর্ণর প্রায় সমবয়সী এই জাতীয় নেতাও য়ুরোপে শিক্ষা পেয়েছেন। কর্মশক্তিতে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ। ডাঃ হাতাকে সর্বত্যাগী বৈরাগীর মত দেখতে।

জাপান যখন পার্লহারবার আক্রমণ করে তখন ডাঃ হাতা ডাচবন্দী শিবির বান্দানেইরাতে আটক ছিলেন। জেল থেকেই তিনি দেশবাসীকে জাপানের ভাঁওতায় ভুলতে বারণ করেন। তাঁর বিবৃতি ডাচ ও ইন্দোনেশিয়ান সকল সংবাদ পত্রেই প্রকাশিত হয়। কারণ ডাঃ হাতার বিবৃতির গুরুত্ব অনেক।

ইন্দেনেশিয়ার প্রথম অস্থায়ী লোকায়ত্ত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন ব্যারিষ্টার ডাঃ সোয়েবারজো। এই তরুণ নেতাটি সংগ্রামে আপোষ জানেন না। ১৯৪৫'র ১৪ই নভেম্বর যখন সর্বদল মিলিত মন্ত্রীসভা গড়ে ওঠে শারিয়ারের প্রধান মন্ত্রীত্বে তিনি মন্ত্রীত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। তাঁর আপোষবিরোধী খ্যাতির জন্যই সরে আসতে হয় তাঁকে।

মন্ত্রীপরিষদের সদস্য ডাঃ আমীর সরিফুদ্দিন কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম কর্মী। বাটাভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই তিনি বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। গ্রাজুয়েট হবার ঠিক দুদিন পরেই তিনি ডাচ সরকারের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল আপত্তিকর ইস্তাহার প্রচার। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি ডাঃ ভ্যানমুকের অর্থনৈতিক দপ্তরে গবেষণা স্থরু করেন।

১৯৪১ সালে ফ্যাসীবিরোধী লীগে যোগ দিয়ে তিনি জাপানের বিরুদ্ধে গুপ্ত আন্দোলন চালাতে থাকেন। ১৯৪৩ সালে জাপানী সরকার তাঁকে এবং তাঁর চুয়ান্ন জন সংগীকে গ্রেপ্তার করে সুরাবায়া বন্দীশালায় পাঠায়। সেখান থেকে বাটাভিয়া এবং মালাং বন্দীনিবাসেও তিনি জাপানী আক্রোশের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কুখ্যাত জাপানী শাস্তি, 'জল চিকিৎসা' ডাঃ আমীরের জাতীয়তাবাদের রোগ সারাবার জন্য জাপানী কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৪৫'র ১লা অক্টোবর তিনি ছাড়া পেয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়ার গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শারিয়ার দেশের সর্বদলের নির্বাচিত বিশ্বাসভাজন নেতা। চৌত্রিশ বৎসর বয়সের এই রাষ্ট্র কর্ণধারটির জীবনের দশ বৎসর কেটেছে ডাচ সরকারের কারাগারে। তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী, হল্যাণ্ডে শিক্ষা-প্রাপ্ত একজন সার্থক আইনজীবী। প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেই তিনি সর্বপ্রকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন।

ইন্দোনেশিয়া কলোনী শাসনের অত্যাচার জানে। সেখানে দেশপ্রেমিকদের অগ্নিপরীক্ষা বারে বারে হয়েছে। আজকের ইন্দো-নেশিয়ার যারা প্রতিপত্তিশালী প্রতিনিধি তাদের সকলেরই জীবনের বহু বৎসর কেটেছে সাম্রাজ্যবাদীদের কারাগারে এবং বন্দীশিবিরে। অত্যাচার ও উৎপীড়ন তাদের স্বাধীন সত্ত্বাকে হত্যা করতে পারেনি বরং নিপীড়নের অগ্নিতে তারা আরো উজ্জলতর হয়েছে। তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দোনেশিয়ার সাত কোটী জনসাধারণ। তারাও অনেক দিয়েছে শাসককে। এবার তারা মুক্তি চায়। নিজের দেশের কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে তারা মুক্ত জীবনের আনন্দ ভোগ করতে চায়। সে মুক্তি তাদের আসবেও।

শাস্তির ভয়, কারাদণ্ড এবং নির্বাসনের ভয়ে কোন কালেই শোষিত মানুষ তার আজাদীর সাধনা ভোলে না। ইন্দোনেশিয়াতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রকাশ্য আন্দোলনের সুযোগ যখন বন্ধ হল—আলোড়ন চলতে লাগল ফল্গু ধারায়। শাসন ব্যবস্থা ও

সাম্রাজ্যবাদকে চিরদিনের মত ধূলিসাৎ করবার জন্য জাতীয়তাবাদ তলে তলে প্রস্তুত হতে লাগল। ভিত্তির ভিতর চিড় ধরতে লাগল। যদিও বাইরের কাঠামো এবং অলংকারে কোন ভেঙে পড়বার লক্ষণ দৃশ্যমান হোল না। কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদী নেতারা জেলে এবং নির্বাসনে শাস্তি পেতে লাগলেন, শোষণ চলতে লাগল এবং ধীরে ধীরে দেশের গণদেবতা জাগ্রত হয়ে উঠতে লাগলেন। সে দেবতার রুদ্ররূপ আজ প্রকাশ পেয়েছে।

পার্ল হারবারের পতনের সংগে সংগে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধাগ্নি জ্বলে উঠল। হত্যা, ষড়যন্ত্র, আত্মসমর্পণ এবং নিরীহ নরনারী ও শিশু-মৃত্যুর যেন বীভৎস লীলা সুরু হোল। সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে শ্মশান করবার জন্য হানাহানি লেগে গেল সাম্রাজ্য-বাদী শকুনিদের। কিন্তু সেই ধ্বংসের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তার মগ্ন চেতনাকে জানতে পারল। বিষ সমুদ্র মন্থনে সেই অমৃতটুকু লাভ করেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহুকালের নিপীড়িত মানুষ। ইন্দোনেশিয়া তা প্রমাণ করেছে।

জাপানী জংগীবাদের দুর্দম অভিযানের কাছে দাম্ভিক ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ কেমন করে হাঁটু ভেঙে বসল তা দেখেছিল ইন্দো-নেশিয়ার নিরস্ত্র মানুষ। অত্যাচারী শত্রুর নির্দয়তার সামনে ফেলে রেখে দিয়ে এতদিনের ভণ্ড শোষকরাজ কেমন করে পালিয়ে গেল তাও তারা চেয়ে দেখেছে। একথা মনে হয়েছিল সেইসব অগ্নিময় দিনে যে হয়ত এশিয়ার নূতন ভাগ্য নিয়ন্তা হবে জাপান। এবং জাপানের 'এশিয়া এশিয়াবাসীর' ধুয়ার মধ্যে কিছু সততা আছে। সে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজীতে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিল তখন মানুষের মন একথা অস্বীকার করে লাভ নেই।

কিন্তু জাপানীরা ইন্দোনেশিয়ায় দ্বৈতনীতি চালাতে লাগল। যেসব ডাচের বিষদাঁত ভাঙা গেল না তারা বন্দীশিবিরে বিশ্রাম করতে লাগল। যারা জাপানীদের প্রতি অসাধু উদ্দেশ্য গোপন করে রাখল তারা 'মাননীয়' জাপানী নাগরিকত্বের মর্যাদা নিয়ে বাস

করতে লাগল। যেসব ইন্দোনেশিয়ান নেতা জাপানীদের সংগে কাজ করতে সম্মত হল না তারাও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হোল। বিভ্রান্ত কয়েকজন নেতা জাপানীদের মুখোসকে সত্য বলে মেনে কিছুদিন ভুলপথ অনুসরণ করল কিন্তু তাদেরও ভুল ভাঙতে দেরী হোল না।

ইন্দোনেশিয়ায় জাপানী প্রীতি প্রচারের চেষ্টায় জাপানীরা দুমুখো নীতি অনুসরণ করতে লাগল। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অনুভূতিকে জাগ্রত করে এবং ডাচ বিদ্বেষ প্রচার করে যেমন তারা শাসন কার্য চালানোর সুবিধা করে নিতে পারবে একধারে, ইন্দোনেশিয়ার অরণ্য, কৃষি ও খনিজ সম্পদ রপ্তানী করে ঘরে নিয়ে যেতে পারবে তেমনি আর একদিকে। জাগ্রত-বোধ ইন্দোনেশিয়ানরা তাদের ধাপ্পাবাজীর অর্থ বুঝে যদি কোনদিন বিরুদ্ধ সংগ্রাম সুরু করে সেদিন তাদের প্রতিরোধ করাও যে দুঃসাধ্য হবে এ বিপরীত সিদ্ধান্তে তারা পৌছতে পেরেছিল। এই দুমুখো নীতি যে সাপের দ্বিখণ্ডিত জিহ্বারই প্রতীক এ বুঝতে ইন্দোনেশিয়ার বিলম্ব ঘটেনি।

ইন্দোনেশিয়ার কাছে ডাচশক্তির আত্মসমর্পণ এবং জাপানী জংগী-বাদের প্রতিষ্ঠায় একটিমাত্র অর্থই বহন করত। সে হচ্ছে প্রভু পরিবর্তন যার সংগে ইন্দোনেশিয়ার শৃংখল মোচনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রকাশ্য প্রতিরোধ চালানো যে কত দুঃসাধ্য এবং তার দমনমূলক ব্যবস্থার নির্দয়তা কত চূড়ান্ত হ'তে পারে জাপানীদের শাস্ত্রমতে এ তারা জানত। সুতরাং সুরু হোল গুপ্ত আঘাত। কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে গেরিলারা নানাভাবে জাপানী ও ডাচদের বিব্রত করতে লাগল। এ ভিন্ন দেশের ইতিবৃত্তের সবচেয়ে রক্তাক্ত ও কলুষিত যুগের মুখোমুখী হয়ে সর্বদলের ইন্দোনেশিয়ান বুঝেছিল যে সংহত শক্তিতে এই দুই শত্রুকে আঘাত করে অবশ করতে না পারলে তাদের স্বাধীনতার সূর্য উঠতে আরো অনেক দেরী হবে। সুতরাং 'এক হও—আঘাত কর'—এই ধুয়ো উঠল সর্বদলের নেতার কণ্ঠ থেকে। ১৯৪৫ সালে Times'র একজন সংবাদদাতা

জানিয়েছিলেন যে, জাপানী অধিকারের বৎসরগুলিতে ইন্দোনেশিয়া তার জাতীয় শক্তিকে নূতন ভাবে আবিস্কার করতে পেরেছিল।

১৯৪৩ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় জাপানী বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকভাবে প্রকাশ্য সংগ্রামের রূপ নেয়। সে আন্দোলন থামে অনেক ইন্দোনেশিয়ান শহীদের রক্তস্নানের পর। 'এশিয়া এশিয়াবাসীর' নয় এবং এশিয়ার সব দেশগুলি যে নিজেদের রাষ্ট্রপরিকল্পনার ভার নিজের হাতে নিতে পারবে না—এ প্রমাণ করতে দেরী হয়নি জাপানী জংগীবাদের। গেরিলা যুদ্ধ কিন্তু থামাতে পারেনি জাপানীরা। কারণ ইন্দোনেশিয়ানরা দেশের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করতে জানে না। ১৯৪৪ সালে লণ্ডন টাইমস লিখেছিল—'ইন্দোনেশিয়ায় একটিও কুইসলিং হয়নি।' এ কম গর্বের কথা নয়। এই সময় ডাঃ সুকর্ণ ও হাতা দুজনেই জাপানীবিরোধীতার নেতৃত্ব নিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন।

এমনি করে ইন্দোনেশিয়া যুদ্ধের কটি বৎসর কাটিয়েছে। তারপর একদিন নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা পড়ল পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশের বিমান থেকে। নূতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে গুঁড়িয়ে দিল পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র। নাগাসাকি এবং হিরোসিমোর বীভৎসতায় জাপান আত্মসমর্পণ করল। সেদিন ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৫।

ইন্দোনেশিয়ার বহু প্রতীক্ষিত সুসময় এল।

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই শত্রু তখন বিপর্যস্ত। ডাচ সরকার ভগ্ন উরু হয়ে পড়ে আছে। জাপানী জংগীবাদ পরমাণুর তেজে বিধ্বস্ত।

১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৫ ইন্দোনেশিয়ার গণমত স্বাধীনতা ঘোষণা করল। সংগে সংগে সুরু হোল জাপানীদের ধরপাকড় এবং নিরস্ত্র করার ব্যাপক আয়োজন।

যাকার্তায় স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার সদর দপ্তর হোল। দেশের মৃত্তিকার উপর দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে চলাফেরা সুরু করল।

ডাচ বাসিন্দারা সভয়ে এবং সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল এই সব মুক্ত মানুষের দলকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথম কাজ হোল ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাবীরদের কারামুক্ত করা।

১৯শে আগষ্ট সমস্ত ইন্দোনেশিয়াবাসীরা প্রাচীর পত্রে পড়তে পেল নবগঠিত সাধারণতন্ত্রের নির্দেশবাণী ও ঘোষণা।

'স্বাধীনতা প্রতি জাতির জন্মগত অধিকার। পররাষ্ট্রের অধীনতা মনুষ্যনীতির বিপরীত এবং তা দূর করতেই হবে।'

'ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্রের সর্বক্ষমতা জনসাধারণের।'

কলোনী শাসনব্যবস্থায় অভ্যস্ত প্রতিটি ইন্দোনেশিয়ান প্রতিজ্ঞা করল যে আর কোন জাতির অধীনতা তারা স্বীকার করবে না। প্রয়োজন হলে অহিংস এবং হিংস্র সংগ্রাম তারা করতে প্রস্তুত যে কোন দেশের সংগে—যারা তাদের স্বাধীনতার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করতে আসবে। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া সকল রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং প্রত্যেকের সংগে সমমৈত্রীতে সে উৎসুক।

ডাচ সরকার নিরস্ত্র এবং হস্তবাক। জাপানীদের অধিকাংশকেই নিরস্ত্র করা হয়ে গেছে। দেশে স্বাধীনতার হাওয়া বইছে। এমন সময় কূটনৈতিক আকাশ থেকে বাজ পড়ল। নাগাসাকি হিরোসিমায় যেমন পরমাণু বোমা জাপানী সার্বভৌমত্বকে খর্ব করল—এখানে কলোনী শাসনব্যবস্থা চালু রাখবার জন্য সেই একই দুর্নীতি নরমপন্থায় সুরু হোল।

জাপানীদের নিরস্ত্র করার ছল নিয়ে বৃটিশ সৈন্য এসে প্রবেশ করল ইন্দোনেশিয়ায়। জাতিসংসদ এবং বৃটিশকর্তৃপক্ষের কাছে ডাঃ সুকর্ণ এবং হাত্তা আবেদন করলেন কিন্তু তা নিষ্ফল হোল। কারণ বৃটিশ ছদ্ম গণতন্ত্র ডাচ কলোনীকে স্বাধীন বাঁচতে দিতে চায় না। পৃথিবীর সর্বজাতির কাছে আবেদন জানাল ইন্দোনেশিয়া কিন্তু তার আবেদন দুর্বলের আক্ষেপ বলে তাতে কেউ কর্ণপাত করল না অথবা গুরুত্ব বুঝেও ভয়ে বা সংকোচে কেউই অগ্রসর হোল না।

বৃটিশবাহিনীর অস্ত্রসজ্জায় ভারতীয় ডাচ বৃটিশ এবং জাপানী সৈন্যরা ইন্দোনেশিয়ায় অত্যাচারের চরম চালাতে লাগল। সর্বপ্রকার দমনমূলক ব্যবস্থা, ভীতি প্রদর্শন এবং নিষেধাজ্ঞা যখন বিফল হোল এবং প্রমাণ হোল যে ইন্দোনেশিয়ানরা অস্ত্র ত্যাগ করে আর একবার রাজতন্ত্রের কাছে মাথা নামাতে রাজী নয় তখন সর্বপ্রকার কৌশল ও মুখোস খসিয়ে ছদ্মগণতন্ত্র তার দাপট সুরু করল।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে ডাঃ সুকর্ণ বললেন—'ইন্দোনেশিয়ানরা বৃটিশের সংগে লড়তে চায় না কিন্তু তারা জানতে চায় কার সংগে তারা লড়ছে।'

বৃটিশের অভিযোগ যে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী সরকার আসলে জাপানের তাঁবেদারী সরকার এবং জাপানী অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্যেই ইন্দোনেশিয়ানরা লড়ছে এ যে কতদূর মিথ্যা তা প্রমাণ হয়ে গেছে। সেই অভিযোগের ভিতর দিয়ে বৃটিশ ও ডাচ সরকার তাদের নিজেদের পাপ গোপন করবারই চেষ্টা করছেন। কারণ গতকালের শত্রু জাপানের সৈন্যদের ব্যবহার করছে বৃটিশ ও ডাচ সরকার। ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সরকার সায়গনে বাটভিয়ায় বৃটিশ সৈন্যকে সাদর করেছিল কিন্তু সায়গনে জেনারেল গ্রেসী ও বাটাভিয়ায় জেনারেল ক্রীশ্চেনসন ফ্রান্স ও ডাচ সরকারকে সশস্ত্র করেই সরে আসেনি—জাপানীদেরও সেই অন্যায় বাহিনীতে ব্যবহার করেছে। ইন্দোনেশিয়ায়, মালয় ব্রহ্ম ও ভারত বিমান দপ্তরের পক্ষ হতে দুই মাসকাল প্রচার সফরের জন্য প্রেরিত পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ হ্যারল্ড ডেভিস ২৭শে জানুয়ারী বলেন—'ইন্দোনেশিয়ান আন্দোলন সুদূর প্রাচ্যের জনগণের ঐতিহাসিক প্রগতিরই পরিণতি। একথা হয়ত কেউ বলতে পারেন যে জাপানীরা সেখানে তাদের রাক্ষুসে দংষ্ট্রা প্রবিষ্ট করিয়েছিল। কিন্তু তা হলেও স্বায়ত্বশাসন লাভের জন্য এই যে সংগ্রাম এর জন্য জাপানীরাই দায়ী একথা বলা সম্পূর্ণ ভুল।' এই বিবৃতিতে বৃটিশ ধাপ্পাবাজী চূড়ান্তভাবে দৃশ্যমান হয়ে পড়েছে।

জাভার কেন্দ্র থেকে ধীরে ধীরে আন্দোলন সারা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভ এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ চালাতে থাকে ইন্দোনেশিয়ানরা। ভাড়াটে ভারতীয় এবং জাপানী সৈন্য অনধিকারী বৃটিশ ও ডাচ সৈন্যদের সংগে অত্যাচারের চরম করতে থাকে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার জনমত এতটুকু পথ ছাড়তে রাজী নয়।

ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি সরকারকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার জন্য বৃটিশ ও ডাচ কর্তৃপক্ষের হীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বত্র গভীর অসন্তোষের সংবাদ আসতে থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিকরা এই দাবীতে ধর্মঘট করে যে অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য অস্ত্র চালান দেওয়া হচ্ছে। এ অসন্তোষ নিউজিল্যাণ্ডের শ্রমিকদের মধ্যেও ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। নিউইয়র্কের নাবিক ও অন্যান্য ডক শ্রমিকদের মিটিংয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা' প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে জানানো হয়। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃটিশ ডাচ সৈন্যরা অনধিকার হস্তক্ষেপ করেছে এদাবী পেশ করে শ্রমিকরা।

অনেকে আশ্চর্য হয়ে ভাবেন যে ফরাসী কলোনী ইন্দোচীন এবং ডাচ কলোনী ইন্দোনেশিয়ায় বৃটিশের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের কারণ কি?

ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনে বৃটিশের স্বার্থ বহুবর্ষ ধরেই অন্যতম হয়ে আছে। এই কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ডাচ এবং বৃটিশ রাজমৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ। বৃটিশের অপরাজেয় নৌশক্তির ভরসাতেই ডাচ রাজতন্ত্র ইন্দোনেশিয়ায় আত্মরক্ষামূলক কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেনি এবং সেদেশের যথার্থ অর্থনৈতিক সংস্কার করবার চেষ্টা করেনি। তার নিশ্চিত ফলও পেয়েছিল ডাচ গভর্ণমেণ্ট জাপানের হাতে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগের কয়েকটি বৎসরে এইসব দ্বীপপুঞ্জেও আমেরিকার প্রযুক্ত মূলধনের আয়তন বাড়তে থাকে। তেল এবং রবারেই আমেরিকার মূলধন প্রধান হয়ে ওঠবার পথ পায়। সুতরাং বৃটিশ স্বার্থ সেখানে অসহায় ও অসহিষ্ণু

বোধ করছিল। যুদ্ধান্তে আমেরিকার অর্থ নৈতিক অনুপ্রবেশ আরো কতখানি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এ তার চিন্তার কারণ ঘটিয়েছিল। তা' ভিন্ন য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদ এটুকু উপলব্ধি করবার অভিজ্ঞতা পেয়েছিল যে যুদ্ধান্তে এশিয়ার কলোনীগুলি তাদের প্রাক্তন অবস্থায় ফিরে আসবে না কোনমতেই বরং য়ুরোপের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করতেই তারা দৃঢ় সংকল্প হবে।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অর্থনীতি পররাজ্য শোষণের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেজন্য কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই নয় পৃথিবীর সর্বত্র বন্ধু রাষ্ট্রের কলোনী তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। প্রয়োজন বোধে সেসব পররাজ্যে গিয়েও সশস্ত্র রক্ষাব্যবস্থা মোতায়ন করতে হবে— এই হোল বৃটিশ কূটনীতিকের আন্তরিক মত। সুতরাং জাপানীদের নিরস্ত্র করার নাম করে তারা উদ্বুদ্ধ জাতীয় চেতনাকে ধ্বংস করবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

কিন্তু ডাচ উৎপীড়ন ও বৃটিশের অসাধু হস্তক্ষেপ অত সহজে সাফল্য লাভ করতে পারল না।

সমস্ত ইন্দোনেশিয়া এক মানুষের মত অস্থায়ী ইন্দোনেশিয়ান সরকারের পিছনে শক্তি সংহত করে সংগ্রাম চালাতে লাগল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিকরা বুঝেছিলেন যে যদি তাদের আন্দোলনকে সফল করতে হয় এবং সারা পৃথিবীর জনমতের সমর্থন লাভ করতে হয় তবে এমন এক অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যার প্রতিনিধিদের ফ্যাসী বিরোধী নীতি সুপরিচিত এবং যাদের এতদিনের সংগ্রামের ইতিহাসে কলংক লাগেনি কোনদিন।

ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন বসল অক্টোবরের মাঝামাঝি বাটাভিয়ায়। এই সম্মেলন এক 'জাতীয় কমিটী' গঠন করলেন। তার কর্তৃত্ব গেল মিঃ সুলতান শারিয়ারের হাতে। সম্মেলন সিদ্ধান্ত করল যে যতদিন 'জাতীয় কংগ্রেস' গঠিত না হচ্ছে ততদিন এই কমিটীর হাতেই রাষ্ট্রক্ষমতা থাকবে এবং ১৯৪৬'র গোড়ার দিকে সারা ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিনিধি নির্বাচন হবে। রাষ্ট্র-

ব্যবস্থা চালানোর জন্য একটি কর্মপরিষদও গঠিত হোল—তারা এই জাতীয় কমিটীর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

জাতীয় কমিটীর উপর নির্দেশ দেওয়া হোল যে আগামী বিশ্বস্বস্তি সম্মেলনে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া যাতে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক।

বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে আশ্বাস দেওয়া হোল যে জাপানীদের নিরস্ত্র করার ব্যাপারে এই জাতীয় কমিটী তাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কিন্তু নিরস্ত্র করার কাজ শেষ হলেই সকল বিদেশী শক্তিকে ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করতে হবে।

জেনারেল ক্রীশ্চেনসনের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হোল যে অনতিবিলম্বে ডাচ কলোনী শাসনের অবসান ঘটিয়ে সমস্ত ডাচ সৈন্য ও নৌ-বাহিনী সরিয়ে দিতে হবে ইন্দোনেশিয়ার ভূমি ও সমুদ্র এলাকা থেকে। আরো প্রস্তাব করা হোল যে সম্মিলিত জাতি সংঘের বিবেচনাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রশ্ন মীমাংসা না হওয়া অবধি ইন্দোনেশিয়ান অস্থায়ী জনরাষ্ট্রকেই ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিমূলক গভর্ণমেন্ট মনে করতে হবে।

এই পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়ে বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ ডাচ প্রতিনিধিদের হাত থেকে ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিলেন। ইন্দোনেশিয়ার উপর ওলন্দাজ অফিসার ও সৈন্যদের জঘন্য আক্রোশ প্রবল তাণ্ডব সুরু করে দিল।

সেসব অত্যাচার ও নির্মমতার কাহিনী সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসকে চিরদিনের মত কলংকিত করে রাখবে।

ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণ অপূর্ব বীরত্বের সংগে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগল। প্রকাশ্য বিদ্রোহ—ঘাঁটির পর ঘাঁটি অধিকার—নৌ-সেনাদের পর্যুদস্ত করে নৌবাহিনী করায়ত্ত করে দ্বীপের পর দ্বীপ, এলাকার পর এলাকায় তারা বিজয় অভিযান চালাতে লাগল।

প্রবীণ বৃটিশ কূটনীতি অবশেষে দুই সংগ্রামশীল জাতিকে মুখোমুখী আপোষের চেষ্টায় একত্রিত করল। নভেম্বর মাসের প্রথম

সপ্তাহে ওলন্দাজ সরকারের প্রতিনিধি ডাঃ ভ্যানমুক এবং ইন্দো-নেশিয়ার জাতীয় নেতা ডাঃ সুকর্ণ জেনারেল ক্রীশ্চেনসনের ঘরে আপোষ আলোচনা সুরু করলেন।

অব্যর্থভাবে সে আলোচনা ব্যর্থ হল। এরই সংগে সংগে এক খণ্ড যুদ্ধে সুরাবায়ার বৃটিশ সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার ম্যালবি নিহত হলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বৃটিশ নিজের হাতে ইন্দো-নেশিয়াকে শাস্তি দেবার ভার গ্রহণ করল। বৃটিশের সামরিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতার সামনে ইন্দোনেশিয়ার সত্যকার স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হোল। যুদ্ধ, বিদ্রোহ, উৎপীড়ন এবং হত্যা বীভৎস মূর্তিতে অবতীর্ণ হোল।

বৃটিশের ব্যাপক অভিযানের বাহিনী গঠিত হোল—ভাড়াটে ভারতীয় সৈন্য, জাপানী সৈন্য এবং বৃটিশ সৈন্যদের নিয়ে। ভারত-বর্ষে এবং অন্যান্য দেশে এই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অসন্তোষ জানানো হোল। বৃটিশ বিরোধী যখন দুনিয়ার মনোভাব এবং একদা সাদরে আমন্ত্রিত বৃটিশ হস্তক্ষেপ যখন ইন্দোনেশিয়ার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইন্দোনেশিয়াকে বৃটিশের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে ঠিক সেই সময় ডাচ সরকার তার নিজের প্রস্তাব পেশ করল। হয়ত এও বৃটিশ স্বার্থের রাহাজানির বিরুদ্ধে ডাচ সরকারের একটা কূটনৈতিক চাল।

কিন্তু ইন্দোনেশিয়া ডাচ সরকার প্রস্তাবিত 'বন্ধুত্বপূর্ণ অধীনতা' গ্রহণ করতে পারল না। তার মধ্যে সামান্য কিছু শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি আছে বটে কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার আকাংখা তাতে মিটল না।

যুদ্ধের বেগ বৃদ্ধি পেল। নবগঠিত ইন্দোনেশিয়া সংগ্রামে অপূর্ব বীরত্ব ও ত্যাগ প্রদর্শন করে জগতের কৌতূহল ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে লাগল। দিনের পর দিন ইন্দোনেশিয়ার সংবাদই সংবাদ-পত্রের প্রধান পাঠ্য হয়ে দাঁড়াল।

এ যুদ্ধের আশু অবসান হবে না জেনে ইন্দানেশিয়ার সভাপতি

ডাঃ সুকর্ণ ১৩ই নভেম্বর নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। মন্ত্রীসভার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শারিয়ার ঘোষণায় যা বললেন তার মর্মার্থ এই যে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীন গণতন্ত্র দেশের মধ্যে এমন কোন রাজনৈতিক মতবাদকেই বরদাস্ত করবে না যা ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার পথে এখন অথবা ভবিষ্যতে কণ্টক হতে পারে। বরং প্রগতিশীল এবং সর্বশ্রেণীর নরনারীর প্রতিনিধিমূলক পার্টিকেই তিনি আহ্বান করলেন নূতন গঠিত মন্ত্রীসভাকে সহযোগিতা করতে।

বাটাভিয়ায় আবার সম্মেলন বসল। সেখানে সমবেত হলেন প্রতিনিধিরা সর্বদলের হয়ে—সর্বশ্রেণীর মানুষের হয়ে। ১০ই জুন নারী প্রতিনিধি, ৩ জন চীনা এবং ৩ জন ইউরেশীয়ানও তাদের উপস্থিতি দিয়ে সম্মেলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করলেন।

একদিকে সাম্রাজ্যবাদী দানবের ভয়াল দংষ্ট্রা অপরদিকে স্বাধীন জীবন যাপনের প্রতিশ্রুতির মধ্যে দাঁড়িয়ে ইন্দোনেশিয়ার সমাজতন্ত্রী পার্টি, ইন্দোনেশিয়ার খ্রীশ্চান পরিষদ, ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি, জাতীয়তাবাদী ইসলাম পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন পার্টি, ছাত্র সংসদ, কিষাণ সভা এবং অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলই শারিয়ার মন্ত্রীসভাকে সংহত শক্তিতে অনুমোদন করল।

আকাশে যখন দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠল মতবিরোধের অবসান হোল। নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা এক হলেন, অহিংসার নেতারা এবং বিপ্লবী নেতারা এক হলেন। ইন্দোনেশিয়ার নানা মত, নানা পথ এবং নানা স্বার্থ এক আওয়াজ তুলল—'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার সংকল্প গ্রহণ করছি—ইন্দোনেশিয়ার জয়।'

দেশের মধ্যে ঐক্য যত বৃদ্ধি পেতে লাগল, সাম্রাজ্যবাদের হিংসাও তত প্রবলতর হয়ে উঠল। আধুনিক সমরাস্ত্রের সবগুলিই ইন্দোনেশিয়ার আকাশে মাটীতে সমুদ্রে গর্জন করতে লাগল। সামাবাং সুরাবায়া বনডিয়াং প্রভৃতি এলাকায় বিমান হানায় লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যু বরণ করল। গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হতে লাগল গণতান্ত্রিক দেশের হামলায়। নাৎসী বর্বরতা অন্য নামে

চলতে লাগল। বিশেষ করে এশিয়ার জাতিকে মাথা তুলতে দেখলে শ্বেত প্রভুদের মাথা ঠিক থাকে না। য়ুরোপের সভ্যতা যে কেবলমাত্র দেহের পরিধান যা যে-কোন মুহূর্তে খুলে নেওয়া যায় তাই প্রমাণ হোল এশিয়ায়।

ইন্দোনেশিয়া রক্তস্নান করতে লাগল।

কিন্তু আগুন মৃত্যু আর রক্তের ভিতর দিয়ে ইন্দোনেশিয়া শক্তি সঞ্চয় করতে পারলে। নানা এলাকায় বৃটিশের ভাড়াটে সৈন্য ভারতীয় এবং জাপানীরা পিছু হটেছে। ডাচ ও বৃটিশ সৈন্য পদে পদে বাধা পেয়েছে—অগ্রগামী দলকে পিছিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে তীব্র প্রতিরোধের ধাক্কা সামলাতে। ইন্দোনেশিয়ানদের বীরত্বের কাহিনী নূতন ইতিবৃত্ত রচনা করেছে এশিয়ায়।

ডিসেম্বরের গোড়াতেই সিংগাপুরে মিত্রপক্ষীয় সামরিক শক্তিদের বৈঠক বসল—কেমন করে ইন্দোনেশিয়ান বিদ্রোহীদের দমন করা যায়।

এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন মাউন্টব্যাটেন। বৃটিশ সেনাপতিরা সভার শোভা বৃদ্ধি করলেন! ডাচ গভর্ণর ড্যান ভ্যানমুকও বৈঠকে যোগ দিলেন। প্রস্তাব হোল ইন্দোনেশিয়ার চরম ও নরম পন্থীদের মধ্যে একটা ভাঙন ধরাবার জন্য ব্যাপকভাবে সামরিক শক্তি নিয়োগ করতে হবে।

কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী সোজা প্রত্যুত্তর দিলেন—'দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে ইন্দোনেশিয়া দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। শান্তিমূলক সমাধানের চেষ্টায় আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত কিন্তু জবরদস্তি অত্যাচারের পথে যে মীমাংসা তা আমরা গ্রহণ করব না।'

'জবরদস্তির প্রতিরোধ আমরা করব সর্বশক্তি দিয়ে এবং সে প্রতিরোধের অবধারিত ফল হবে সুদূর প্রসারী। ইন্দোনেশিয়ার লোকতন্ত্রের রাজনৈতিক এবং ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্য মেনে নেবার পরই একমাত্র শান্তিপূর্ণ আলোচনা চলতে পারে।'
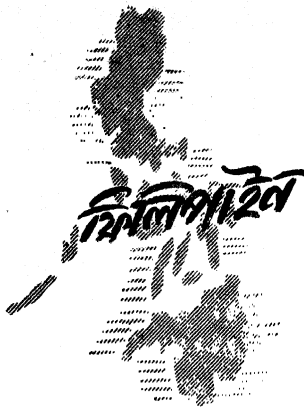
চীন-উপকূলের দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় সাত হাজার ছোট বড় দ্বীপ আছে যাকে একত্রে বলা যায় দ্বীপ নীহারিকা। দ্বীপগুলির অবস্থিতির জ্যামেতিক চিত্র একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভূজের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই দ্বীপ নীহারিকার নামই ফিলিপাইন।

উত্তর থেকে দক্ষিণে এই দ্বীপগুলো ১১৫০ মাইল পরিমিত স্থান জুড়ে আছে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে এদের বিস্তৃতি ৬৬০ মাইল। সমগ্র দ্বীপের আয়তন ১১৫০০০ বর্গমাইলের কিছু বেশী। ১৯৪০ সালে এই দ্বীপপুঞ্জের লোক সংখ্যা ছিল এক কোটী সাত লক্ষ। অর্থাৎ ফিলিপাইন আকারে ইতালীর প্রায় সমান। এখানে প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যা ১৪৭ জন। জাপানে ঐ হার ৪৮৮ আর জাভা ও মাদুরায় ৮২২।

বেশীর ভাগ দ্বীপই আয়তনে এক বর্গ মাইলেরও কম কিন্তু মাত্র এগারটি দ্বীপ মিলে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের আয়তনের চুরানব্বুই ভাগ। দ্বীপগুলোকে চারটে প্রধান দলে ভাগ করে নেওয়া যায়। উত্তরে লুজন ও সন্নিকটবর্তী ছোট ছোট দ্বীপমালা ; ভিসায়াস নামক কেন্দ্রীয় দ্বীপ সমষ্টি ; দক্ষিণের মিণ্ডানা ও সুলু দ্বীপ-সমুদ্র এবং প্রধান দ্বীপ-

পুঞ্জের পশ্চিমে পালায়ান ও তৎসংলগ্ন ছোট ছোট দ্বীপের দুর্গপ্রাকার মালা।

এই দ্বীপ-পুঞ্জের মধ্যে লুজনই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম। এর আয়তন ৪০,৮১৪ বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র ফিলিপাইনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। লুজনকে আবার তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তর প্রান্তে পর্বতমালা বেষ্টিত বিস্তীর্ণ উপত্যকা। পর্বতবালারা এসে দক্ষিণে পরস্পরের সংগে হাত মিলিয়েছে। দক্ষিণে লুজনের সমতল প্রান্তর। এই প্রান্তরের পশ্চিম ঘিরে রেখেছে বাটান ও লিনুগায়েন উপদ্বীপ। এরই ভিতর সুবৃহৎ লিনুগায়েন উপসাগর। ১৯৪১'র ডিসেম্বরে জাপানী সৈন্যের প্রধান ভাগ এই উপসাগরের ধূলিধুসর সৈকত ভূমিতে অবতরণ করেছিল। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা লিনুগায়েনের দক্ষিণ-পশ্চিমে কেন্দ্রীয় প্রান্তরের দক্ষিণ ধার ঘেঁসে অবস্থিত। অর্থাৎ ম্যানিলা উপসাগর আর 'লেগুন ডী বে' নামক বিশাল হ্রদকে পৃথক করে রেখেছে ম্যানিলা। আর দক্ষিণ লুজনের দীর্ঘ সংকীর্ণ উপদ্বীপ লুজনের দক্ষিণ-পূর্ব সীমানার সতর্ক প্রহরী।

সমগ্র ফিলিপাইনের উনপঞ্চাশটি রাজ্যের পঁচিশটি নিয়ে লুজন গঠিত। এর লোক সংখ্যা সাড়ে ছয় মিলিয়ন। ফিলিপাইনের যা কিছু রাজনৈতিক চাঞ্চল্য এই লুজনকে ঘিরেই আবর্তিত। অর্থ-নৈতিক দিক থেকেও লুজনই ফিলিপাইনের মেরুদণ্ড। কারণ ফিলিপাইনের প্রধান প্রধান শস্য যা সবই এখানে জন্মায় ও তার ভাঁড়ার এখানেই।

কেন্দ্রীয় বা ভিসায়ান গ্রুপ প্রধানতঃ পর্বত সংকুল। এই দ্বীপা-বলির নানা গুরুত্বপূর্ণ সৈকত প্রান্তর আছে। এদের মধ্যে পানায়ের সমতল প্রান্তরই সর্বাপেক্ষা সুবিস্তীর্ণ এবং ক্ষুদ্রতম হচ্ছে কেবু। কিন্তু তা হলেও সমগ্র ফিলিপাইনে কেবুই হচ্ছে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দ্বীপ। এই কেবু দ্বীপেই ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্প্যানিশ উপনিবেশ স্থায়ীভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল।

আকারের তুলনায়—মিণ্ডানাও লুজনের দ্বিতীয়। এর আয়তন ৩৭,০০০ বর্গমাইল। কিন্তু এখানকার বিরল বসতিই এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মিণ্ডানাও আটটি রাজ্যে বিভক্ত। পশ্চিমে জামবোয়ানগো ও ল্যানাও ; দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে কোটাবাটো ও ড্যাভাও ; উত্তর ও উত্তর-পূর্বে মিসামিস, বুকিডনন আগুসান ও সুরিগাও। মিণ্ডানাওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে বোর্ণিও'র মুখোমুখী হচ্ছে সুলু দ্বীপপুঞ্জ।

ফিলিপাইন সম্পদশালী অনুপম দেশ। বৃহত্তর দ্বীপগুলিকে ঘিরে রেখেছে খনিজপদার্থপূর্ণ সবুজ বনরাজি শোভিত পাহাড়ের বেড়াজাল। এখানে আছে বিস্তীর্ণ উপত্যকা, ব-দ্বীপ, সৈকত প্রান্তর, স্রোতস্বতী আর নদনদীর জটিল শাখাপ্রশাখা। হ্রদ আর প্রস্রবন ত সারা দ্বীপপুঞ্জেই ছড়িয়ে রয়েছে। তটরেখার খাঁজ বেশ সুচিহ্নিত, মাঝে মাঝে জাহাজ ডিঙি নঙর করার উপযোগী উপসাগর, দীর্ঘ-প্রসারিত ধূসর বেলাভূমি আর ফলভার নত নারিকেল সারি বিচিত্র শান্তিপূর্ণ জেলে নগরগুলিকে পত্রপুটের স্নিগ্ধ শীতল ছায়ার চন্দ্রাতপে ঢেকে রাখে। প্রকৃতির রম্যভূমি এই ফিলিপাইন।

ফিলিপাইনের আদিম অধিবাসীরা হচ্ছে নেগরিটো। এরা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এখন এদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের বেশী হ'বে না। এরা প্যানায়, নেগ্রকস এবং লুজনের পার্বত্যাঞ্চল ও অন্য কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপে বসবাস করে। পুরুষদের পরণে শুধু মাত্র নেংটি কিন্তু মেয়েরা কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখতে শিখেছে। এরা ছাড়া ফিলিপাইনের শতকরা নব্বুই ভাগ বাসিন্দা মালয় জাতীয়। এদের মধ্যে আছে ক্রিশ্চান, দক্ষিণের মুসলমান সম্প্রদায় এবং কিছু কিছু পৌত্তলিক। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী মালয়ীরা শতকরা একানব্বুই ভাগ, মুসলমানরা চার ভাগ আর পৌত্তলিক মালয়ীরা বাকী পাঁচ ভাগ।

মধ্য লুজনের তাগালোগরাই সমগ্র ফিলিপাইনদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী সম্প্রদায়। এদের সংখ্যা ২০ লক্ষের কিছু কম কিন্তু সংখ্যা

লঘুত্ব সত্বেও দেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এদের অবদানই প্রধান। শিক্ষার দিক থেকেও এরা সবচেয়ে উন্নত। এদের মাতৃভাষা তাগালগই ফিলিপাইনের সরকারী ভাষা বলে গণ্য।

মধ্য লুজনের ভিসায়ানরাই অবশ্য সবচেয়ে দলে ভারী। এদের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। এদের মাতৃভাষাকে ফিলিপাইনের সরকারী ভাষা করার দাবী নিয়ে এরা বহুদিন থেকে আন্দোলন চালিয়ে আসছে।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য দল হচ্ছে ইলোকানোরা। প্রথম দিকে লুজনের উত্তর পশ্চিমের দুটি সংকীর্ণ এলাকার বাসিন্দা ছিল এরা, অনেকটা যাযাবর শ্রেণীর। তটপ্রান্তের জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমে বড় বড় নদীর উপত্যকায় ক্রমশঃ এরা ছড়িয়ে পড়েছে।

পৌত্তলিক আর ক্রিশ্চানরা ছাড়া ফিলিপাইনে প্রায় ৬,৭৮,০০০ লক্ষ মুসলমানের বাস। দুর্জয় সাহস ও নির্ভীকতার জন্য এরা ফিলিপাইনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। স্প্যানিশ রাজত্বের প্রায় শেষ অবধি এরা নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। তারপরও সম্পূর্ণ বশ্যতা এরা স্বীকার করেনি কোনদিন এবং বেশীর ভাগ সময়ই এরা স্বায়ত্বশাসন ভোগ করে এসেছে। স্পেনিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে এদের এই সাফল্যের মূল কারণই হচ্ছে সমগ্র ফিলিপাইনে এদেরই একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে কিছু ছিল।

প্রাচীন চীনা আরব ও হিন্দু মালয়ান রেকর্ডে ফিলিপাইনের উল্লেখ দেখা যায়। চীনা ও আরবী ব্যবসাদাররা ফিলিপাইনে আসত এবং ফিলিপিনোদের যে চীন, জাপান, বোর্ণিও ইষ্ট ইণ্ডীজ ও ভারতের লোকেদের সংগে সামাজিক ও ব্যবসায়ী সম্পর্ক ছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১২২৫ খৃষ্টাব্দে রচিত 'চু-কান-চি' নামক পুস্তকে চৈনিক পরিব্রাজক ও ভূগোল বিস্তাবিৎ 'চাউ-জু-কাউয়া'ও ফিলিপাইনের সংগে—বিশেষ করে থাই—আধুনিক মিণ্ডোরো'র সংগে চীনের বাণিজ্যের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

রূপ কথার সমৃদ্ধিশালিনী মসলা দ্বীপের খোঁজে যাত্রা করে ১৫২১ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয় অভিযাত্রী বাহিনীর নেতা ম্যাজিলান কেবুতে এসে উপস্থিত হন। এইখানেই ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়রা স্থায়ীভাবে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ১৫৬৪ সাল থেকে স্পেনীয়রা ফিলিপাইনে উপনিবেশ স্থাপনের সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে লেগাসপি নামক একজন ভদ্রলোককে নিয়োগ করেছিল। তারই নেতৃত্বে জনসাধারণের মধ্যে একদিকে ক্রিশ্চান ধর্মপ্রচার এবং অপরদিকে রাজনৈতিক কতৃত্ব দৃঢ় করবার অভিযান সুরু হয়েছিল। এই অভিযানের ইতিহাস অকলংকিত নয়। রাজশক্তির উৎপীড়নে নিরস্ত্র এবং নিরীহ মানুষেরা ধীরে ধীরে বশ্যতা মানতে লাগল। ফিলিপাইনের মত এমন ব্যাপকভাবে ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করেনি আর কোন ভূভাগের মানুষেরা। স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদ কেবল বাধা পেয়েছিল দক্ষিণ দ্বীপবাসী মুসলমানদের কাছে। তারা স্পেন রাজত্বের অবসান অবধি স্বায়ত্ব শাসন বজায় রাখতে পেরেছিল সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বই নয় ধর্মপ্রচারকদের অভিযানও তাদের মধ্যে বিফল হয়েছে। শাসনযন্ত্রের রাহাজানি চলে সাড়ে তিনশ' বছর। প্রথম প্রথম কলোনী শাসন চলত মেকসিকো থেকে। নব আবিষ্কৃত আমেরিকায় স্পেনীয় রাজতন্ত্রের সদর দপ্তর ছিল মেকসিকো। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রধান আমেরিকান কলোনীগুলো স্পেনের হাতছাড়া হয়ে যায়। এরপর সোজা মাদ্রিদ থেকেই আসত শাসনকার্যের অনুশাসন ও হুমকি। সুয়েজ খাল খনিত হওয়ায় ফিলিপাইনে আসা যাওয়ার সমুদ্র পথ অনেক সহজসাধ্য হোল এবং আপেক্ষিক দূরত্বও কমে গেল।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ম্যানিলা বিদেশী বাণিজ্যের পক্ষে উন্মুক্ত হোল, ধীরে ধীরে অন্যান্য বন্দরেও বিদেশী জাহাজ এসে ভিড়তে লাগল। বাইরের বিশ্বের সংগে সংস্পর্শে কেবল মাত্র দেশের সমৃদ্ধিই বৃদ্ধি পেল না, স্বাধীনতা ও সংস্কারের নূতন ভাবধারাও ফিলিপাইনে অনুপ্রবেশ করল।

স্প্যানিশ শাসন কোন সময়েই জনপ্রিয় ছিল না। যে কোন প্রকার বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমিত হোত। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে সংস্কারকামী আন্দোলন দ্রুত জোরাল ও সংহত হয়ে উঠতে লাগল।

ফিলিপিনোদের প্রধান অনুযোগই ছিল যে দেশের শাসনকার্যে তাদের কোনই অংশ নেই। সরকারী চাকুরীতে তারা বঞ্চিত। অথচ তাদেরই দিতে হয় চড়াহারে কর। কোন প্রকার স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অধীন জাইগীরদারদের মত আচরণ করা হয় তাদের সংগে। জোর করে কর আদায় করা ও কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। অত্যাচারের একটি প্রধান নমুনা হচ্ছে—স্প্যানিশ ধর্ম সম্বন্ধীয় আদেশগুলি। স্পেন যখন উপনিবেশ স্থাপন করে তখন ফিলিপাইনে কোন বড় শাসক বা ছোট শাসকবৃন্দ ছিল না। সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশ ফিলিপাইন ছোট ছোট পঞ্চায়েতে বিভক্ত হয়ে ছিল। সুতরাং স্পেনীয় ধর্মপ্রচারকরা জনসাধারণের ভিতরে প্রবেশ করে তাদের ক্রিশ্চান করার দায়িত্ব নিল।

তীরভূমি ও ছোট ছোট সহরে গীর্জার আশে পাশে জমা হয়ে উঠতে লাগল বেনিয়া সম্প্রদায় ও রাজ ভক্তদের দল। এদের প্রথম উৎসাহই হোল স্পেনীয়দের রীতিনীতি ও বাহাড়ম্বর অনুকরণ করা। এর ফলে একটা বিশিষ্ট শ্রেণী উন্নত হোল, সমৃদ্ধশালী হোল বটে, কিন্তু দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ উৎপীড়নে, উচ্চ করভারে এবং দারিদ্র্যে ধুঁকতে লাগল। ফিলিপাইনে চীনা ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া অধিকারের সংগে এই সময় স্পেনীয় রাজতন্ত্রের কলহ বেধে ওঠে। গোপন ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ প্রবল ও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল কিন্তু চীনারা হার মানেনি। দলে দলে তারা এসেছে বারবার। সে কাহিনী স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিবৃত করা হয়েছে।

ধর্মপ্রচারকদের জবরদস্তি কলোনী শাসননীতির অব্যবস্থা

প্রভৃতি দোষ ও দুর্নীতি দূর করবার জন্য ফিলিপিনোরা বিদেশে বহু সংঘ গড়ে তুলল। এইসব দুর্নীতি উদ্ঘাটন করে প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রচার সুরু হোল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংস্কার-পন্থী ও স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ডাঃ জস রিজাল। তিনি জাতীয় মনোভাবের দরুণ স্পেনিয়ার্ডদের হাতে নিহত হন। ফলে নূতন সংঘর্ষের আগুন প্রধূমায়িত হয়ে ওঠে যা পরে দ্রুত রক্তপাতী বিপ্লবে পরিণতি লাভ করে।

ফিলিপাইনে যখন (১৮৯১) এই ধরণের বিপ্লবাত্মক মনোভাব তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছিল তখন স্পেন ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মধ্যে বেধে যায় সংঘর্ষ। ফিলিপিনোরা দেশ থেকে স্প্যানিশ কর্তৃত্ব অবসান করবার জন্য এই অবস্থারই চরম সুযোগ নিল। কম্যাণ্ডার ডিউয়ী তখন চীন-সমুদ্রে অবস্থান করছিলেন। আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট তাঁকে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে স্প্যানিশ নৌ-বহর ধ্বংস করবার আদেশ দিলেন। তাঁর পক্ষে সাতটি জাহাজ গঠিত স্প্যানিশ নৌ-বহরকে অকর্মণ্য ও ম্যানিলার রক্ষাব্যূহকে 'চুপ' করে দিতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা লাগল। কিন্তু তখন তখনই দ্বীপে অবতীর্ণ হয়ে দ্বীপ অধিকার করার মত যথেষ্ট আমেরিকান সৈন্য ছিল না। তার ফলে এমিলো আগুইনাল ডো র নেতৃত্বে সু-সংঘবদ্ধ বিপ্লবী ফিলিপিনোদের হাতেই স্পেনিয়ার্ডদের সংগে লড়বার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হোল। কিছু পরে আমেরিকান সৈন্যরা এসে উপস্থিত হোল এবং যুদ্ধ বিরতিও স্বাক্ষরিত হোল। এরপর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিশ চুক্তি অনুসারে দ্বীপের কর্তৃত্ব চলে এল আমেরিকানদের হাতে।

আমেরিকান অস্ত্রের দ্বারা দেশে স্পেনীয় কর্তৃত্বের অবসান ঘটানোর সময় ফিলিপিনো ও আমেরিকানদের মধ্যে সম্প্রীতি হোল বটে কিন্তু দ্বীপে অবতরণ করে আমেরিকার সেনাধ্যক্ষ ফিলিপিনোদের হাতে তাদের মাতৃভূমিকে ছেড়ে দিতে সম্মত হলেন না। ইতিমধ্যে আগুইনাল ডোকে প্রেসিডেণ্ট করে ফিলিপিনের জনমত এক স্বাধীন

সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কাজেই আবার আমেরিকানদের সংগে সুরু হোল সংঘর্ষ। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ অবধি এই যুদ্ধ চলেছিল। অবশেষে জাতীয় সরকারের অবসান ঘটিয়ে আমেরিকানরা ফিলিপাইনের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে রাখল। স্পেন সরকারের শাসন ব্যবস্থায় দেশ ছিল দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অনুন্নত। নবাগত আমেরিকানদের সংগে যুদ্ধে ফিলিপাইন একেবারে সর্বস্ব হারিয়ে বসল। তিনটি বৎসর দেশের উপর দিয়ে মৃত্যু উৎপীড়ন আর অত্যাচার চলল। জাতীয় সম্পত্তি ও মানুষের চরম ক্ষতি করে আমেরিকান সরকার ফিলিপাইনের সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নিল।

ফিলিপিনোদের প্রতিরোধ সম্পূর্ণ দমন করার পূর্বে আমেরিকান সরকারের নেতৃত্বে ফিলিপাইনের চালু শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করার পরিকল্পনা সুরু হয়ে যায়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইন সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ আহরণের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। এই রিপোর্টের ফলেই ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আর একটি স্থায়ী কমিশন বসে। এই কমিশনের প্রতি প্রেসিডেন্ট ম্যাকিনলের নির্দেশ ছিল যে—জনসাধারণের সম্মতি অনুযায়ী ফিলিপাইনের পক্ষে যতদূর সম্ভব গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে একটি সর্বোত্তম কুশলী সরকার স্থাপন করতে হবে। এর উপর ভিত্তি করেই ফিলিপাইনে আমেরিকানদের নীতি নির্ধারিত হয়।

১৮৯৮ থেকে ১৯১৩ অবধি যুক্তরাজ্য শাসন ব্যবস্থার সর্বদপ্তরে আমেরিকান নেতৃত্বের অধীনে ফিলিপিনোদের নিয়োগ অনুমোদন করেছিল। স্বায়ত্বশাসন দাবীর প্রত্যুত্তরে এই ধরণের ন্যূনতম অধিকার দিয়ে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা চালাচ্ছিল আমেরিকান কংগ্রেস।

১৯১২ সালের পর নির্বাচনে আমেরিকান কংগ্রেসে ক্ষমতা হাতে পেল ডেমক্রেটিক পার্টি। তারা ফিলিপিনোদের চূড়ান্ত স্বায়ত্বশাসন দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। ১৯১২ থেকে ১৯১৬'র মধ্যে শাসনব্যবস্থায় ফিলিপিনোদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়া হোল। তারা দ্বীপের

সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর থেকে আমেরিকানদের সরিয়ে দিল। গভর্ণর-জেনারেলও ফিলিপিনোদের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতার উপদেশ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার নীতি গ্রহণ করলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জোন্‌স আইন পাশ হোল। এই আইনে ফিলিপিনোদের পূর্ণস্বাধীনতা দেওয়ার স্বীকৃতি মেনে নেওয়া হোল এবং দেশীয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ফিলিপিনো রাষ্ট্রপরিষদের হস্তেই সমর্পিত হোল। অবশ্য রাষ্ট্রপরিষদকে অতিক্রম করে কোন আইন চালু করা অথবা রাষ্ট্রপরিষদের খসড়ার কোন আইনকে ব্যতিক্রম করার পূর্ণক্ষমতা রইল গভর্ণর জেনারেলের। তবুও এই ধরণের মতদ্বৈধতার ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের কাছে আপীল করার অধিকারও মেনে নেওয়া হোল।

জোন্‌স আইনের ভূমিকায় বলা ছিল—যে মুহূর্তে ফিলিপাইনে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে সেই মুহূর্তে আমেরিকানরা ফিলিপাইন থেকে তাদের সমস্ত অধিকার প্রত্যাহার করে সরে আসবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল হ্যারিসন প্রেসিডেণ্টকে জানালেন যে, দ্বীপে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই রিপোর্টের উপর কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, কারণ তারপরই আমেরিকায় ডেমক্রেটিক পার্টি ক্ষমতাচ্যুত হয়।

এই সময় ফিলিপাইনে হ্যারিসনের জায়গায় মেজর লিওনার্ড উড গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে এলেন। হ্যারিসনের শাসন কালে রাষ্ট্রের সর্বদপ্তরে ফিলিপিনোদের নিযুক্ত করার নীতি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু নূতন গভর্ণর-জেনারেল জনমতের উপর ভিত্তি করা রাষ্ট্রপরিষদের চেয়ে ক্ষমতাবান কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বেশী চাপ দিলেন। তাঁরই নির্দেশে মন্ত্রণাপরিষদের বিলোপ সাধন করা হোল এবং সমস্ত শাসন ক্ষমতা তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। এই ব্যবস্থায় কিন্তু ফিলিপিনোরা খুশী হোল না। আমেরিকান প্রতিশ্রুতির সততায় ফিলিপিনোরা যেভাবে গড়ে উঠছিল তাতে চরম আঘাত লাগল এবং সংগে সংগে আন্দোলন সুরু হোল। সে আন্দোলনের

প্রাবল্যে আমেরিকান কংগ্রেসের টনক নড়ে উঠলো। গভর্ণর জেনারেল উড তাঁর মন্ত্রী সহ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল হেনরী, এল, ষ্টিমসন কার্যকরী ও রাষ্ট্রিয় পরিষদের মধ্যে পুনরায় সখ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চেষ্টা করলেন। তিনি জাতিয়তাবাদী দলের সদস্যদের পরামর্শদাতা নিযুক্ত করলেন এবং মন্ত্রণা পরিষদও পুনর্জীবিত করা হোল। ফিলিপিনো নেতাদের নিকট গভর্ণর জেনারেলের এই পরিবর্তন সাদরে গৃহীত হোল এবং তারা সরকার পক্ষের ভংগীকে নূতন আপোষমূলক মনোবৃত্তির সূত্রপাত বলে গ্রহণ করল।

ফিলিপাইন আবার স্বায়ত্ব শাসনের পথে অগ্রসর হতে লাগল। সিনেটর হ্যারি, বি, হসে'র নেতৃত্বে কংগ্রেসের একদল স্বতন্ত্র সদস্য ফিলিপাইনের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী নিয়ে আন্দোলন করতে লাগলেন। যুক্তরাজ্যে একটি ফিলিপিনো মিশনও এল দাবীর সারবত্তা প্রমাণের জন্য। এই সমস্ত আন্দোলনের ফলেই আরো প্রগতিমূলক একটি আইন পাশ হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পরে স্বীয় ক্ষমতা বলে এই আইন বাতিল করে দেন।

এরপর স্বাধীনতা প্রদানের আইন প্রণয়ণের জন্য প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের নিকট দাবী জানাতে আবার আর একটি ফিলিপিনো প্রতিনিধি দল এল যুক্তরাজ্যে। এতদিনে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং আমেরিকার জনমতের চাপে পড়ে আমেরিকান কংগ্রেস ১৯৩৪ সালের ২৪শে মার্চ ফিলিপাইনের স্বাধীনতা আইন পাশ করতে বাধ্য হল। এই আইন অনুসারে ১৯৪৬ সালের ৪ঠা জুলাই ফিলিপাইন পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে এবং তখন থেকে আমেরিকার সংগে তার বাণিজ্যিক চুক্তি কাজ করবে সাধারণ ভাবে।

এই আইনের বলে ফিলিপাইন কমনওয়েলথের হাতে আভ্যন্তরীণ প্রায় সমস্ত ক্ষমতাই এল। কেবলমাত্র সরকারী ঋণ, শুল্ক বিদেশীদের নাগরিক অধিকার প্রদান এবং বৈদেশিক, সামরিক ও কিছু কিছু আইনঘটিত ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনতা তারা

মানতে বাধ্য রইল। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্টের নিজস্ব প্রতিনিধি হিসেবে রইলেন একজন হাই কমিশনার। তিনিই এইসব ব্যাপারের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী।

তবু আমেরিকান কর্তৃত্ব মেনে চলার অনেকগুলি আপত্তির মধ্যে ফিলিপাইনের জাতিয়তাবাদী নেতাদের প্রধান আপত্তি হোল শুল্ক ঘটিত কর্তৃত্বে। ফিলিপাইনকে ১৯৪৬ সালের পর স্বাধীনতা বজায় রাখতে হলে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন অর্জন করতেই হবে। আইন অনুযায়ী যুক্তরাজ্য ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংগে বাণিজ্যিক বিনিময়ের চুক্তি করার পক্ষে ফিলিপাইনের অক্ষমতা এবং দেশীয় অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সুগঠিত করে তোলবার জন্য বিদেশী মালের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর অক্ষমতাও ফিলিপাইনের পক্ষে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে—এ সম্বন্ধে অনেক ফিলিপিনো অর্থনীতিকের ঘোরতর আপত্তি। তাঁদের মত গত ত্রিশ বৎসর ধরে ফিলিপাইনে যুক্তরাজ্য যে অর্থনীতির কাঠামো নির্মাণ করেছে এবং যেভাবে আমদানী রপ্তানীর ব্যবস্থা চালু রেখেছে তা' ফিলিপাইনের জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল। ফিলিপাইনের দেশজাত বস্তুর একটি মাত্র বাজারের জন্য দেশীয় কৃষিজাত দ্রব্য ও অন্যান্য শিল্প প্রসারের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হয়েছিল।

বাইরের পৃথিবীর বাণিজ্যিক বাজারে ফিলিপাইন তার ব্যবসা চালু রেখে এবং দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করে কিভাবে অর্থনৈতিক কাঠামো অটুট রাখবে এ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। আমেরিকার বাঁধা বাজার যখন বন্ধ হবে তখন ফিলিপাইন তার মাল বিক্রী করতে পারবে কিনা—বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে চুক্তি করে কিভাবে তারা স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখবে অথচ দেশে শিল্প প্রসারের দ্বারা জাতীয় সমৃদ্ধি বাড়াবে এসব নিয়ে ফিলিপাইনের নেতারা চিন্তা করছেন।

পার্লহারবার পতনের আগে ফিলিপাইন সর্বদিকের সকল শক্তি সংহত করে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এমন সময়

পার্লহারবারে জাপানী জংগীবাদ প্রথম তাণ্ডবে মত্ত হোল। জ্বলে উঠল প্রশান্ত মহাসাগরের আগুন।

যতদিন না যুক্তরাজ্য সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যাহার করছে এবং ফিলিপাইনের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষিত হচ্ছে ততদিন এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বলা হয় ফিলিপিনো কমনওয়েল্‌থ। ম্যানুয়েল কুয়েজন এই জাতীয় রাষ্ট্রের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। কুয়েজন যৌবনে ছিলেন উগ্র বিপ্লবী, জনগণের আস্থাবান নায়ক ও ক্ষমতাবান পুরুষ। তাঁর প্রতি জনসাধারণের যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অপরিমেয় বিশ্বাস ছিল তিনি তার যথার্থ ই উপযুক্ত ছিলেন। তাঁর অতুল ব্যক্তিত্ব অন্তর্বর্তীকালীন শাসন পরিচালনায় যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

শাসন পরিচালনায় প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করবার জন্য রাজস্ব, বিচার, কৃষি, বাণিজ্য, পাবলিক ওয়ার্কস ও যানবাহন, জনশিক্ষা ও শ্রম এবং আভ্যন্তরীণ বিভাগ নামক সাতটি বিভিন্ন দপ্তর সৃষ্টি হোল। এক এক দপ্তরের সর্বময় কর্তাকে বলা হোত সেক্রেটারী এবং এইসব সেক্রেটারীদের নিয়েই প্রেসিডেন্টের পরিষদ। পরে দেশরক্ষা ও জনস্বাস্থ্য, জনরক্ষা নামক আরো দু'টো বিভাগ সৃষ্ট হোল। সর্বাধিনায়করূপে সমস্ত সরকারী দপ্তরখানার উপর শাসনের বল্‌গা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতেন প্রেসিডেন্ট।

কমনওয়েলথের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আটানব্বুইজন সদস্যের একটি মাত্র জাতীয় পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল। সদস্যরা প্রতি তিন বছর অন্তর নির্বাচিত হোতেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে শাসনতন্ত্রের নিয়মাবলী সংশোধন করে নিম্ন ও উচ্চ দু'টো পরিষদ সৃষ্টি করা হয় এবং চব্বিশ জন সদস্যের একটি উচ্চ পরিষদও গঠিত হয়েছিল।

শাসন তান্ত্রিক দিক থেকে কুয়েজন জাতীয় সরকার জনপ্রিয় হয়েছিল এবং দেশের সর্বাংগীন মংগল সাধনায় তাদের চেষ্টা সর্বাংশে ফলবতীও হয়েছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশের মতই ফিলিপাইনও কৃষিপ্রধান দেশ। ফিলিপাইনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ বহুকাল কৃষি সম্পদ

রপ্তানির উপরই একান্ত নির্ভরশীল ছিল। ফিলিপাইনে চাষোপযোগী ভূমির পরিমান প্রায় ৯,৭৬৫,০০০ একর অর্থাৎ দ্বীপের সমগ্র ভূমির শতকরা পনেরো ভাগে কৃষিকার্য চলে যদিও কৃষি উপযুক্ত ভূভাগ শতকরা পঞ্চাশ। যুদ্ধের পূর্বে ফিলিপাইনের জাতীয় আয়ের শতকরা ৮০ ভাগই আসতো কৃষি থেকে এবং এক তৃতীয়াংশ লোকই কৃষিজীবী।

চাল, চিনি, নারিকেল, দড়ির সূতা, তামাকই ফিলিপাইনের প্রধান ফসল এবং দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সর্বত্রই এদের ফলন হয়। চালই হচ্ছে ফিলিপাইনের প্রধান খাদ্য এবং প্রধান ফসল। প্রায় ৪,২৩২,০০০ লক্ষ একর জমিতে চালের চাষ হয় এবং সর্বত্রই কম বেশী চাল উৎপাদিত হয়। লুজনের কেন্দ্রীয় সমতল প্রান্তরেই সবচেয়ে বেশী সর্বোত্তম চালের ফলন হয়। মধ্য লুজনের পাঁচটি প্রদেশেই সমগ্র ফিলিপাইনের উৎপন্ন চালের প্রায় ৪৭ ভাগ উৎপাদিত হয়। উত্তর লুজনের পার্বত্যময় প্রান্তরেও চালের ফলন প্রচুর।

তবুও নিজের দেশের প্রয়োজন মেটাতে পারে না ফিলিপাইনের বর্তমান উৎপাদন। ঘাটতি চাল আমদানী হয় ফরাসী ইন্দোচীন থেকে।

১৯৩৬ সালে জাতীয় চাল ও শস্য সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান দেশে চালের ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য বেঁধে দেওয়া এবং প্রতিবেশী দেশ থেকে চাল আমদানী করা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করত। জাপানী অধিকারের সময় ফিলিপাইনে মূল খাদ্য শস্য চালের অভাব হয়েছিল অত্যন্ত। একে ত ফিলিপাইন চালের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী নয়, বিদেশ থেকে আমদানী করে সে অভাব পূরণ করে—তার উপর উপস্থিত জাপানী সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহ করতে হয়েছে ফিলিপাইনকে। অথচ জাহাজের অভাবে ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশ থেকে চাল আমদানীর পথও অনেকাংশে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই অভাব মেটান'র জন্য কৃষি উপযুক্ত ভূমিভাগে চাল উৎপন্ন করার চেষ্টা চালু করেছিল জাপানীরা। শুধু তাই নয় নেগ্রসদ্বীপের আখের ক্ষেতকে ধানের ক্ষেতে পরিণত করা হয়েছিল ঐ অসুবিধা দূর করার জন্য।

ফিলিপাইনের খাদ্যবস্তুর জন্য পরমুখাপেক্ষীতা দূর করে ফিলি-পাইনকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলবার জন্য চাল ছাড়াও অন্যান্য ফসল ফলাবার চেষ্টা করেছিল জাপানীরা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্চে গমজাত শস্য। যুদ্ধের পূর্বে প্রায় ১,০৭৭,১৫০ একরেরও অধিক জমিতে গমজাত শস্যের চাষ হোত কিন্তু দেশের চাহিদা মেটান'র জন্য তখন থেকে আরো অধিক পরিমান জমি চাষের ব্যবস্থা হোল। একই উদ্দেশ্যে ক্যাসাভা ও মিষ্টি আলুর চাষও বর্ধিত হোল। এত সব পরিবর্তন সত্বেও কিন্তু যুদ্ধের বৎসর গুলিতে ফিলিপাইনের সাক্ষীগোপাল সরকারের প্রধান সমস্যাই ছিল খাদ্য অনটন।

বিদেশে রপ্তানী দ্রব্যের তালিকায় চিনির স্থান উল্লেখযোগ্য। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪০ সালে রপ্তানী তালিকায় চিনির আপেক্ষিক স্থান ছিল নিম্নরূপ ঃ

চিনি	শতকরা	৪০ ভাগ
নারিকল জাত দ্রব্য	„	২০ „
দড়ি	„	১১ „
তামাক	„	৪ „
কাঠের চোঁচ	„	৩ „

(১) নেগ্রস ও প্যানায় দ্বীপাবলী, (২) মধ্য লুজনের পামপাংগা, বাতান ও তারলাক, (৩) এবং ম্যানিলার দক্ষিণে লেগুনা ও বাটানগাম—এই তিনটি প্রধান চিনি উৎপাদক অঞ্চলেই শর্করা শিল্প গড়ে উঠেছে। ফিলিপাইনের চিনির শতকরা পঞ্চাশ ভাগই আসে নেগ্রস থেকে।

ফিলিপাইনের খাদ্য তালিকায় চিনির স্থান গৌণ। সমগ্র দ্বীপে চিনির খরচা ১১৫,০০০ টনের বেশী নয় অথচ বাৎসরিক উৎপাদন ১,০০০,০০০ টনেরও অধিক। কাজেই বেশীর ভাগ চিনিই রপ্তানী হয় এবং রপ্তানী চিনির শতকরা ৯০ ভাগই যায় যুক্তরাজ্যে। বিদেশে রপ্তানী মালের মধ্যে চিনির স্থান প্রথম। কাজেই জাপানী যুদ্ধের

আগে এইটিই জাতীয় আয়ের প্রধান পথ ছিল। ২,০০০,০০০ লক্ষ লোক সোজাসুজি চিনির আয়ের উপর নির্ভর করত। তাছাড়া বেশীর ভাগ ব্যাংকিং কাজকারবার চিনিকে নিয়েই এবং চিনির বস্তা চালান দিয়েই রেল বিভাগের প্রধান আয়।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফিলিপাইন নারিকেল জাত দ্রব্য রপ্তানীতে অন্যতম ছিল। এর কারণ অবশ্য সমুদ্র উপকূল ও উষ্ণ আবহাওয়া। ফিলিপাইনের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই নারিকেল জন্মায়। এই নারিকেল শিল্প থেকে যুদ্ধের পূর্বে ৪,০০০,০০০ লক্ষ লোক জীবিকা নির্বাহ করত এবং ফিলিপাইন গণতন্ত্রের রাজস্ব খাতে বাৎসরিক ৭,০০০,০০০ পেসস আয় হোত। যুদ্ধের পূর্বে ফিলিপাইনের নারিকেল তেল ও ছোবরার শতকরা ৯৫ ভাগই চলে যেত আমেরিকার যুক্তরাজ্যে।

কিন্তু জাপানী অধিকারের সময় নারিকেলের খাদ্যমূল্য হিসেবেই চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল অত্যধিক। কারণ যুক্তরাজ্যের বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে নারিকেল শিল্পেরই মৃত্যু ঘটতে বসেছিল। কিন্তু জাপানীরা তা হতে দেয়নি। নারিকেল উৎপাদক এসোসিয়েসান প্রচার করলেন যে, ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে নারিকেলের শাঁস থেকে প্রতিদিন ন্যূনপক্ষে পাঁচ টন নারিকেলের ময়দা তৈরী করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হবে। সেই দিক দিয়ে খাদ্য সংকটেরও কিছুটা সুরাহা হোল।

কলাগাছের শন থেকে একপ্রকার দড়ি প্রস্তুত হোত ফিলিপাইনে যার জনপ্রিয় নাম হচ্চে 'ম্যানিলা রজ্জু'। এক সময় শুধু ম্যানিলাতেই এই দড়ি প্রস্তুত হোত। এখন ইন্দোনেশিয়া মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে এই রজ্জু প্রস্তুত হলেও এখনও এ ফিলিপাইনের একচেটিয়া ব্যবসা। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত দড়ি ফিলিপাইনের প্রধান রপ্তানী ব্যবসা ছিল। কিন্তু পরে চিনি উৎপাদন, খনিজ শিল্পোন্নতি, নারিকেল তেল ও ছোবড়া রপ্তানী সুরু হওয়ার ফলে এই রজ্জু শিল্প ফিলিপাইনের অর্থনীতিতে গৌণ হয়ে পড়েছে।

গাঁজা প্রধানত দক্ষিণ লুজন ও অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপে জন্মায়। গাঁজার চাষে জাপানীরা প্রচুর টাকা খাটিয়েছিল যুদ্ধের আগে। জাপানী দখলের পর দু'টো জাপানী প্রতিষ্ঠান সমগ্র গাঁজা উৎপাদনের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেও যুদ্ধের জন্য এই ফসলের যথেষ্ট অবনতি ঘটে।

স্পেনিয়ার্ডরাই প্রথমে ফিলিপাইনে তামাকের প্রচলন করে এবং এও ফিলিপাইনের একটি উল্লেখযোগ্য রপ্তানী। ১৯৩৯ সালের হিসেব মত ১৪৩০৬৫ একর জমিতে তামাকের চাষ হোত এবং এই আবাদে ৬০০,০০০ লোকের জীবিকা নির্বাহ হোত। ইসাবেলা ও ক্যাগায়ানই হচ্চে তামাকের দুটো প্রধান কেন্দ্র এবং এই দুটি প্রদেশ থেকেই সমগ্র উৎপন্নের শতকরা ৪২ ভাগেরও অধিক সরবরাহ হয়।

যুদ্ধের পূর্বে ফিলিপাইন সিগাররূপে শতকরা ৮৮ ভাগ তামাক যুক্তরাজ্যে রপ্তানী করত এবং যুক্তরাজ্য থেকে পরিবর্তে সিগারেট এনে দেশের চাহিদা মেটান হোত। যুদ্ধের দরুণ রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় সিগারেটের ষ্টক বাড়তে থাকে। এই সমস্যা সমাধান করবার জন্য জাপানীরা দ্বীপপুঞ্জের ভিতরই সিগার প্রচলন ও সিগারেট তৈরীর জন্য তামাক চাষে উৎসাহ দিয়ে ছিল।

বিগত শতাব্দী থেকে খনি ব্যবসা ফিলিপাইনের জাতীয় অর্থাগমের একটি প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দশ বা বার বছর যাবৎ স্বর্ণোৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং শর্করা শিল্পের পরই এই শিল্পের স্থান।

প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদগুলি হচ্ছে লৌহ, ক্রোম, ম্যাংগানিজ ও তামা। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে খনিজ ধাতব পদার্থের পরিমাণ ১,৫০০,০০০ টন।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত উত্তোলিত লৌহ জাহাজ বোঝাই করে জাপানীরা দেশে নিয়ে গেছে কিন্তু ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায় একেবারে। জাপানীরা দাবী করে যে, দ্বীপ দখলের পর তারা খনিগুলিতে উৎপাদন চালু করতে পেরেছিল।

জাপানে ফিলিপাইনের খনিজ ধাতুর চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ খনিজ ম্যাংগানিজ ও তামা উত্তোলনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১৯৩৪ সালে উৎপাদিত ম্যাংগানিজের পরিমাণ ছিল ৫০০ টন মাত্র এবং এই সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে ১৯৩৯ সালে ২৯৩৯৪ টনের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। এই উৎপাদিত মালের একচেটিয়া ক্রেতা ছিল জাপান। ১৯৩৫ সালে তামা রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১২৫ মেট্রিক টন এবং এর সমস্তই যুক্তরাজ্য গ্রহণ করেছে। কিন্তু ১৯৩৮ সালে জাপানই ছিল ফিলিপাইনের তামার একমাত্র ক্রেতা। ফিলি-পাইনের বেশীর ভাগ ক্রোম যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হোত অবশ্য জাপানীরাও এতে ভাগ বসাতে চেষ্টা করেছে।

খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হলেও তেল ও কয়লার যথেষ্ট অভাবের জন্য দেশে প্রচুর সংখ্যায় কলকারখানা গড়ে উঠতে পারেনি। প্রতি বৎসর পেট্রোলিয়ামের জন্য ফিলিপাইনের বহু অর্থ বিদেশে চলে যায়। চাহিদা অনুসারে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণও অত্যন্ত কম বলে ফিলিপাইনকে জাপান, ইন্দোচীন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে কয়লা আমদানী করতে হয়।

অন্যান্য কৃষি প্রধান দেশের মত ফিলিপাইনেও বিশেষ বড় রকমের কোন শিল্পোন্নতি সম্ভব হয়নি। তৈরী মাল বলতে সিগার, দড়িদাড়া, এমব্রয়ডারী, বেতের টুপি প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য। আমেরিকায় ফিলিপাইনের কৃষিজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদার জন্যই সেখানে ৪৬টা চিনির কল কাজ করে, চিনি শোধন হয় ৪টি শোধনা-গারে। নারিকেল তেলের ও নারিকেল শুষ্ক করার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিগার ও সিগারেট প্রস্তুতের কারখানাগুলিও সারা বৎসর ব্যস্ত থাকে। তা ছাড়া প্রায় দুশ সাবানের কারখানা, কতকগুলো উদ্ভিজ্য ঘী, স্ক্রু পেরেক প্রভৃতি ছোট ছোট দ্রব্যের কয়েকটা কারখানাও এখানে উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক কালে কাপড়ের কল ও টিনে ভর্তি খাদ্য প্রস্তুতের চেষ্টাও সফল হয়েছে।

কুটীর শিল্প দ্বারাও কৃষিশ্রমিকরা কিছুটা অর্থোপায় করে। সূচী-

শিল্প ইলকস ও কেন্দ্রীয় দ্বীপগুলির বহু প্রাচীন কুটীর শিল্প। তা ছাড়া অনেক গৃহস্থ পরিবারই টুপী তৈরী করে, ঝুড়ি বাঁধে, মাদুর বোনে। ফিলিপাইনের হাতে তৈরী জুতা আমেরিকান সৌখীনমহলে আদৃত।

১৯৩৫ সালে ফিলিপাইনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার চেষ্টা সুরু হয়। যুক্তরাজ্যের সংগে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছেদনের পর যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা তা প্রতিরোধ করার জন্যই মুখ্যতঃ দেশীয় শিল্প প্রসারের সূত্রপাত। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নবজাত গণতন্ত্র একটি জাতীয় অর্থনৈতিক মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেছিলেন। এদের কাজ ছিল সরকারকে অর্থনীতি ও রাজস্ব বিষয়ে মন্ত্রণা দেওয়া অর্থাৎ কিভাবে চলতি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দেশের অর্থনৈতিক পরমুখাপেক্ষীতা দূর করা যয় সে-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা। এদের প্রথম পরিকল্পনা ছিল দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্র দেশেই উৎপাদন করা। এই পরিষদ সুচারুরূপে কাজ করার জন্য আরও অনেক শাখা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। ফিলিপাইনে জাপানী সামরিক শাসনের সময় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি জাপানীরা দখল করে নেয়। পরে কিছুটা নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে রেখে প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় ফিলিপিনোদের হাতে ফিরিয়ে দেয়। জাপানীরা ফিলিপাইনের শিল্পোন্নতিতে একটুও মাথা ঘামায়নি। তাদের সকল প্রচেষ্টা একমাত্র খাদ্য ও তুলা উৎপাদনেই নিযুক্ত ছিল।

১৯৪৬ সাল নিয়ে এসেছে ফিলিপাইনের আসন্ন স্বাধীনতা লাভের অংগীকার। ১৯৩৪ সালের অংগীকৃত স্বাধীনতা আসবে ৪ঠা জুলাই। ম্যানিলা উপসাগরে ১৮৯৮ সালে জেনারেল ডিউয়ির আক্রমণে এবং ফিলিপিনোদের সহযোগিতায় স্পেন সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ১৯৪১ সালে ফিলিপাইনে জাপানী আক্রমণের সময় অবধি ফিলি-পাইনের ইতিহাস একটা প্রস্তুতির ইতিবৃত্ত। স্বাধীনতা লাভের আকাংখায় ফিলিপিনোদের জয়যাত্রা শাসন সংস্কারের রাজপথ দিয়ে

এগিয়ে এসেছে এই স্বীকৃতি অবধি। এই সময়ের মধ্যে ফিলিপাইনের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে—তাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের হার চতুর্গুণ হয়ে উঠেছে। ১৯৪১ সালে সমগ্র বৈদেশিক রপ্তানীর ৬০ ভাগ যুক্তরাজ্যেই বাজার পেয়েছিল।

জাপানী জংগীবাদের তাণ্ডবে ফিলিপাইন কিছুদিনের জন্য অস্তমিত হয়েছিল কিন্তু ১৯৪৫ আবার তাকে রাহুমুক্ত দেখাচ্ছে। স্পেন সাম্রাজ্যের অবসানের জন্য ফিলিপিনোরা আমেরিকানদের দেওয়া অস্ত্র নিয়ে লড়েছিল—তারপর আমেরিকান অধিকার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার জন্য যুদ্ধ করেছে—মৃত্যু দিয়েছে এবং প্রয়োজন বোধে আমেরিকানদের হাতে পড়বার ভয়ে নিজেদের শস্যসঞ্চয় ও গোলবাড়ীতে পোড়ানীতি অবলম্বন করেছে। সে ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'টি বৎসর। বিংশ শতাব্দীরই চতুর্থ স্তবকে অংগীকৃত আমেরিকান সরকারের সহযোগিতায় ফিলিপিনোরা আর একবার তেমনি গেরিলা যুদ্ধ করেছে—নিজের সঞ্চয় এবং মাটীতে পোড়ামাটী নীতি অবলম্বন করে জাপানীদের অধিকারকে বিব্রত করেছে। ফিলিপাইনের যা ক্ষতি হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তার ফলে তার গড়ে তোলা অনেক কিছু ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সব হারিয়েও ফিলিপাইনের অন্তশ্চেতনা তার স্বাধীনতার আকাংখাকে মরতে দেয়নি। জাপানী জংগীবাদের অবসানের সংগে সংগে সে আবার বিশ্বের দরবারে তার দাবী জোর গলায় জানিয়েছে—'ক্ষয় এবং ক্ষতি সত্বেও স্বাধীন হয়েই আমরা বেঁচে থাকতে চাই।'

১৯৪২, ২রা জানুয়ারী ম্যানিলা জাপানীদের দ্বারা অধিকৃত হয়। ৬ই মে করিজিডোরের পতনের সংগে সংগে সরকারী ভাবে সমগ্র দ্বীপের প্রতিরোধ অবস্থার অবসান ঘটে এবং তারপর জাপানীজ সৈন্যরা দ্বীপ অধিকার সুরু করে। এদিকে উত্তর লুজনের পাহাড় পর্বতে, প্যানায় ও নেগ্রসের ঘন অরণ্যে, মিণ্ডানাও ও কেবুর জন-বসতিপূর্ণ অঞ্চলে—এমন কি ম্যানিলার আশেপাশেও গেরিলারা তৎপর হয়ে ওঠে।

ম্যানিলা অধিকারের পর জাপানীরা প্রেসিডেন্ট কুয়েজনের প্রাক্তন সেক্রেটারী জর্জ, বি, ভারগাসকে ম্যানিলার মেয়র নিযুক্ত করে। করিজিডরের পতনের পর ভারগাস প্রধান সিভিল এ্যাডমিনিসট্রেটার এবং সংগে সংগে ফিলিপাইনের একজিকিউটিভ কমিশনের চেয়ার-ম্যানের পদেও উন্নীত হন। এই কমিশনকে শাসন পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং অনেক গণ্যমান্য ফিলিপিনোকে কমিশনের সদস্যও নিযুক্ত করা হয়। এই কমিশন জাপানী সামরিক শাসন নীতির সংগে সকল প্রকার সংঘর্ষমূলক ব্যবস্থা সতর্কতার সংগে পরিহার করতে লাগল।

আমেরিকান পলিসি অনুসারে ১৯৪৬'র জুলাই মাসে ফিলি-পাইনের সার্বভৌম স্বাধীনতা পাওয়ার কথা। জাপানীরাও এই ব্যবস্থা উপেক্ষা করল না। তারা আগে ফিলিপাইনের স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী টোজো এমন কতকগুলো আইন কানুন সাপেক্ষ স্বাধীনতার ব্যবস্থা করল যে তার ফলে ফিলিপাইনকে পূর্ব এশিয়ায় জাপানীর 'নূতন যুগ' আনয়নের সম্পূর্ণ অধীন যন্ত্রতে পরিণত হতে হবে। এদিকে ফিলিপাইনের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি দমন করে 'কালিবাপী' নামক একটি জো হুকুম দল গঠন করা হোল যারা বিনা প্রতিবাদে জাপানী সামরিক শাসন কর্তাদের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য করবে। ১৯৪৩ সালের ১৪ই অক্টোবর ফিলিপাইন গণতন্ত্রের তাঁবেদার প্রেসিডেন্ট ডাঃ জোস পি, লরেল, ফিলিপাইনকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। এই তাঁবেদার গণতন্ত্রের প্রথম বাৎসরিক অনুষ্ঠান উৎসবের পরই মিত্রশক্তি ফিলিপাইন আক্রমণ করে। ১৯৪৪'র ১৭ই অক্টোবর আমেরিকান বিমান বহর ভিসায়াস ও লীট দ্বীপের টেকলোবানে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে। ২১শে অক্টোবর জেনারেল ম্যাক আর্থার প্রেসিডেন্ট সার্জিও ওসমেনা ও মন্ত্রীপরিষদের অন্যান্য সহকর্মীদের সহ লীট দ্বীপে অবতরণ করেন। ১৯৪৩ সালে ১লা আগষ্ট ম্যানুয়েল কুয়েজনের মৃত্যুর পর ওসমেনাই ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন।

জাপানী সরকার জেনারেল টোমোয়ুকী ইয়ামাশিটাকে ফিলিপাইন রক্ষা করার জন্য ম্যাক আর্থারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে লুজনের প্রায় ৯৫ মাইল দক্ষিণে মিণ্ডোরোতে মিত্র সৈন্য অবতরণ করে। ৯ই জানুয়ারী থেকে সুরু হয় লুজনের যুদ্ধ। তিন সপ্তাহ পরে ক্লার্ক ফিল্ড অধিকৃত হল। ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকান সৈন্যরা ম্যানিলা সম্পূর্ণ অধিকার করে। ১৯৪৫ সালে ২৬শে ফেব্রুয়ারী জেনারেল ম্যাক আর্থার ম্যালাকানান প্রাসাদে সামান্য উৎসবের পর ফিলিপাইনের অসামরিক কর্তৃত্ব প্রেসিডেণ্ট ওসমেনার হস্তে সমর্পণ করেন।

বস্তুতঃ এই চারটি বছর ফিলিপাইন রাহুগ্রস্ত হয়েছিল। যুদ্ধে ফিলিপাইনের যা ক্ষতি হয়েছে তার একটা হিসেব করেছেন ফিলিপাইনের অর্থনীতিবিদদের সংসদ। ফিলিপাইনের পুনর্গঠন পরিকল্পনার ব্যয়ভার করবে কে? হয়ত শেষ অবধি সামান্য কিছু যুদ্ধক্ষতি, ব্যয় হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ ছাড়া সবই ফিলিপাইনের স্কন্ধে চাপবে। একদিকে স্বাধীন ফিলিপাইন আমেরিকার সংগে বাণিজ্যিক চুক্তিতে সর্বপ্রকার শুল্কঘটিত সুবিধা হারাবে অপরদিকে দেশকে পুনর্গঠিত করার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে সংহত শক্তি অর্পণ করতে হবে—এদু'য়ের মাঝে দাঁড়িয়ে অনেক আমেরিকান এবং কিছু ফিলিপাইন উদার মতাবলম্বী নেতা, চিন্তা করছেন ফিলিপাইনের পক্ষে সব থেকে সুবিধাজনক পথ অবলম্বন করাই হবে এই অন্তর্বর্তীকালীন সময় আরো কিছুদিন বিলম্বিত করা। মনে রাখতে হবে যে ফিলিপিনো নেতারা বহুকাল ধরেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে আসছেন। এখন দুর্যোগের ক্ষতির শেষে এবং অনিশ্চিত বাণিজ্যিক ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তারা যে স্বাধীনতার পরিবর্তে অন্য কোন প্রকার তাঁবেদারী সরকার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করবে তারও কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য আমেরিকানরা স্বাধীন ফিলিপাইনের অন্ধকার ভবিষ্যতের ছবি এঁকে এই তরুণ জাতিটিকে ভয় দেখাবে এও ঠিক।—কারণ সাম্প্রতিক যুদ্ধে আমেরিকা পৃথিবীর

অন্যতম শক্তি হয়ে উঠেছে। ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিয়ে সে পূর্ব আঙিনার দিকের দরজা চিরকালের মত বন্ধ করে দেবে এ আশ্বাসে বিশ্বাস হয় না। কেন না চীনে ভারতবর্ষে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকা তার অর্থনৈতিক সুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে ওঠবার সম্ভাবনাকে মুকুলে ঝরে যেতে দেবে না—দিতে পারে না। এ ভিন্নও বৃটেন ফ্রান্স এবং ডাচ সরকার ফিলিপাইনের এই সদ্য সদ্য স্বাধীনতা লাভের পক্ষপাতী নয়। কারণ তার ফলে তাদেরও শাসিত অঞ্চলে দারুণতম বিক্ষোভ ফণা তুলবে এবং বিশ্ব-রাজনীতিতে এইসব রাষ্ট্রের হানাহানি ঘটবে। সুতরাং আমেরিকার উপর এইসব রাষ্ট্রের অপ্রত্যক্ষ চাপ পড়বেই যে কোন প্রকারে এই স্বাধীনতা দানের সময়কে আরো বিলম্বিত করবার।

জাপানী জংগীবাদের পতনের পর ফিলিপাইনের পরিস্থিতি জটিল। ১৯৪৫'র ১লা সেপ্টেম্বর অবধি আমেরিকান সামরিক শক্তি ফিলিপাইনের সর্বময় কর্তা হয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রায় কোন বিষয়েই হাত ছিল না। যুদ্ধকালীন দুর্ভোগ ছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেংগে পড়েছে—মুদ্রাস্ফীতির বিপর্যয়ে দেশে দুর্বিপাক এসেছে—সমস্ত দ্বীপপুঞ্জে নানা কঠিনতম সমস্যা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। জাপানী জংগীবাদের সংগে যেসব ফিলিপিনো নেতা ও জনসাধারণ আপোষ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন গেরিলাবাহিনী ও অন্যান্য ফিলিপিনোদের আক্রোশ দুর্দম হয়ে উঠেছে। সেইসব বিশ্বাসহন্তাদের উপর চরম প্রতিশোধের পালা চলছে। অধিকাংশ আপোষীকেই ইওয়হিগ্ বন্দীশালায় কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। জাপানীদের কাছে সংগ্রহ করা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আজো জনসাধারণ ও গেরিলাবাহিনীর হাতে রয়ে গেছে। বিশেষ করে মোরোসদের হাতে এখন যত অস্ত্র রয়েছে তার ফলে স্বাধীন ফিলিপিনোরা যদি তাদের আবার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে তাহলে সংগ্রাম বেধে উঠবেই। সে সমস্যার কথা ভাবতে হবেই।

মোরোসদের সমস্যা ছাড়াও আরো জটিলতর সমস্যা হচ্ছে ফিলিপিনোদের মধ্যে সাম্যবাদী আদর্শের জোয়ার।

অন্যসব কৃষি প্রধান দেশের মতই ফিলিপাইনেও জমির মালিকানা কৃষকের নয়। জমাই জমিতে চাষ করে খায় কৃষক সম্প্রদায়। অধিক সংখ্যায় প্রজাকে জমি বিলি করার ফলে, ১৯১৮ সালে প্রায় পনের লক্ষ জমাই জমি বিলি ছিল আড়াই লক্ষ জোতদারের মধ্যে। ১৯৩৮ সালে এই অনুপাতে গিয়ে দাঁড়ায় ৮ লক্ষ জমাই জমিতে সাড়ে পাঁচলক্ষ জোতদার। এইসব জোতদারদের অবস্থা অতি শোচনীয়। স্পেনীয় এবং আমেরিকান দুই তন্ত্রেই এইসব জোতদারদের শোষণ করে এসেছে জমিদার আয় সুদখোরেরা। জমির মালিকানাহীন এই কৃষাণ সম্প্রদায় যে কোনদিন সাম্যবাদের সূর্যালোকে দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করবে এ আশা দুরাশা নয়। মধ্য লুজনে এবং অন্যান্য জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এই সব চাষীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'হুকবালাহল'। বহুদিন অসন্তোষ পুষে রাখবার পর কিষাণ সম্প্রদায় আজ এই প্রতিষ্ঠানের পতাকা তলে সমবেত কণ্ঠ তুলেছে। এই অসন্তোষ মাথা ঝাড়া দিয়েছে অনেকবার। তার মধ্যে সশস্ত্র বিক্ষোভও হয়েছে। ১৯২৫ সালে এই কিষাণ আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে এবং তারপর থেকে এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে নানাভাবে নানা সময়ে। তার কারণ কোনদিনই আমেরিকান রাজকর্মচারীরা এদের দুর্দশার অন্ত করবার চেষ্টা করেনি অথবা ফিলিপাইনের জাতীয় সরকারকে এমন কোন আইন পাশ করতে জাগ্রত করেনি যার দ্বারা এদের দুর্দশার লাঘব হয়। অবশ্য স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় প্রেসিডেণ্ট কুয়েজনের দৃষ্টি এদিকে পড়েছিল। তার সভাপতিত্বে এক সংসদ শ্রমিক ও কিষাণদের অবস্থার উন্নতির জন্য একটা পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিতে সুবিধা হ্রাসের ফলে ফিলিপাইনে রাজস্ব ঘাটতি পড়তে সুরু করেছিল যার জন্য এই পরিকল্পনা সুচারুভাবে কার্যকরী করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে জাপানীদের আক্রমণের ফলে এসব পরিকল্পনা ধূলিসাৎ

হয়ে যায়। সে পরিকল্পনার মধ্যে শ্রমিকদের আটঘণ্টা কাজ এবং বিবাদের ফলে মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধিদের নিরপেক্ষ পঞ্চায়েতের নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য করার ব্যবস্থা হয়েছিল। সুতরাং যুদ্ধশেষে আশা করা যায় যে স্বাধীন ফিলিপাইন সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় কেবলমাত্র জমিদার উকিল অথবা অন্য অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত শাসন পরিষদকে এরা চূড়ান্তভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করবে। এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা আছে চীনা ও রাশিয়ান সাম্যবাদীদের সংগে যার ফল খুবই দূরপ্রসারী হতে পারে।

তা ভিন্ন স্বাধীন ফিলিপাইন তার বৈদেশিক চুক্তি কোন রাষ্ট্রের সংগে কিভাবে সম্পন্ন করবে তাতেও আমেরিকানদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। জাপানের পতনের পর যদিও এশিয়ায় চীন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে কিন্তু এখনই কোন প্রকার সাম্রাজ্যিক সম্প্রসারণের প্রয়োজন তার হবে না। কিন্তু বহুকাল ধরে ফিলিপাইনে চীনা বিরোধী যে আন্দোলন চলে আসছে যার ফলে গত দেড় হাজার বছর ধরে বহু চীনা ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবি বারে বারে ধন ও সম্পত্তি হারিয়েছে—তার পূর্ণ সম্ভাবনাকে আর চীনা সরকার বরদাস্ত করবে না—এ অবধারিত সত্য। কেবলমাত্র ফিলিপাইনেই নয়, এশিয়ার কোন রাষ্ট্র যে তার প্রজাকে অসুবিধায় ফেলবে—মহাচীন তা সহ্য করতে পারে না।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এখন দিনে দিনে পরিবর্তিত হচ্ছে। ফিলিপাইনে বৈদেশিক মূলধন যা খাটে তার পরিমাণ সাড়ে বিয়াল্লিশ কোটী ডলার। তার মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ আমেরিকার।

সমগ্র পরশাসিত এশিয়ার জনগণ ৪ঠা জুলাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ফিলিপাইনের চেয়েও অনেক পিছিয়ে পড়া দেশ অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা এবং প্রতিবেশী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সহযোগিতায় তাদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছে এবং জাতীয় সমৃদ্ধিকে বাড়িয়ে তুলছে। ফিলিপাইনও তা পারবে।

স্বাধীনতা লাভের পর ফিলিপাইনের শাসন বলগা দেশের পুঁজী-বাদীদের হাতে থাকবে কি জনসমাজের হাতে গিয়ে পড়বে সে সমস্যা ফিলিপাইনের নিজের। বস্তুতঃ বিশ্বের লোক ও পরাধীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আমেরিকানদের প্রতিশ্রুতির সততার দিকে চেয়ে আছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপাবলি, জনসংখ্যা ও শাসনতন্ত্র

শাসক সম্প্রদায়	জায়গা	শাসনতন্ত্র	আয়তন বর্গ মাইল	প্রধান প্রধান জাতির	লোকসংখ্যা
১। অষ্ট্রেলিয়া	নিউগিনি	Mandated Territory	৯৩,০০০	স্থানীয়	৮৫০,০০০
				চীনা	২,০০০
				শ্বেত	৪,৪০০
	পাপুয়া	Territory	৯০,৫৪০	স্থানীয়	৩৫০,০০০
				শ্বেত	১,৮০০
২। অষ্ট্রেলিয়া, গ্রেটব্রিটেন ও নিউজিল্যাণ্ড	নাউরু (Nauru)	Mandated Territory Controlled by Australia	৯	স্থানীয়	১,৯০০
				চীনা	১,৪০০
				শ্বেত	২০০
৩। চিলি	ইষ্টার	Dependency	৫০	স্থানীয়	৫০০

শাসক সম্প্রদায়	জায়গা	শাসনতন্ত্র	আয়তন বর্গ মাইল	প্রধান প্রধান জাতির	লোকসংখ্যা
৪। ফ্রান্স	নিউ ক্যালিডোনিয়া ও লয়ালটিস	কলোনী	৮,০০০	স্থানীয়	৩০,০০০
				শ্বেত	১৮,০০০
				এশিয়াবাসী	১২,০০০
	ওয়েলিস ও হর্ণ সেসাইটি দ্বীপপুঞ্জ	কলোনী	৫৯	স্থানীয়	৬,৫০০০
	টুয়ামোটাস	Establishments of Oceania	৬৫৭	স্থানীয়	২৭,৫০০
				চীনা	৪,৫০০
				শ্বেত	১,২০০
	গ্যামবিয়ারস		৩৩০	স্থানীয়	৬,৮০০
				চীনা	৩০০
	অষ্ট্রালস		৭০	স্থানীয়	৩,২০০
	মারকইসাস		৪৯০	স্থানীয়	২,৫০০
৫। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স	নিউ হেবরাইডস	কনডোমিনিয়াম	৫,৭০০	স্থানীয়	৪০,০০০
				এশিয়াবাসী	২,০০০
				শ্বেত	১,০০০

শাসক সম্প্রদায়	জায়গা	শাসনতন্ত্র	আয়তন বর্গ মাইল	প্রধান প্রধান জাতির লোকসংখ্যা	
৬। গ্রেট ব্রিটেন	নর্থ বোর্ণিও	State owned by Chartered Company	২৯,৫০০	স্থানীয়	২৫০,০০০
				চীনা	৫০,০০০
				শ্বেত	৩৫০
				অন্যান্য	২,০০০
	সারবাক	Protected State	৫০,০০০	স্থানীয়	৩৫০,০০০
				চীনা	১০০,০০০
				শ্বেত	৪০০
	ব্রুণেই	Protected State	২,২২৬	স্থানীয়	৩০,০০০
				চীনা	৩,০০০
				অন্যান্য	৫০০
	সলোমনস	Protectorate	১১৭,০০০	স্থানীয়	৯৫,০০০
				শ্বেত	৪০০
				চীনা	২৫০

শাসক সম্প্রদায়	জায়গা	শাসনতন্ত্র	আয়তন বর্গ মাইল	প্রধান প্রধান জাতির লোকসংখ্যা	
গ্রেট ব্রিটেন	ফিজি ও রোটুমা	ক্রাউন কলোনী	৭,০৮৩	স্থানীয়	১১৩,০০০
				ভারতীয়	১০৫,০০০
				শ্বেত	৪,৫০০
				চীনা	২,২০০
	গিলবার্ট ও এলিস দ্বীপ ওসেন প্রভৃতি	ক্রাউন কলোনী	২০০	স্থানীয়	৩৬,০০০
				চীনা	৮০০
				শ্বেত	২৫০
	টোংগা	Protected Kingdom	২৫০	স্থানীয়	৩৪,০০০
				আধা-দেশীয়	৪৫০
				শ্বেত	৪০০
	পিটকারিণ (Pitcairn)	Possession	২	আধা-দেশীয় (Part Native)	২২০
৭। জাপান	মেরিয়ানাস	Mandated Territory	২৪৫	স্থানীয়	৪,৫০০
				জাপানী	৪৫,০০০

শাসক সম্প্রদায়	জায়গা	শাসনতন্ত্র	আয়তন বর্গ মাইল	প্রধান প্রধান জাতির	লোকসংখ্যা
জাপান	পালাউ	Mandated Territory	১৮৫	স্থানীয়	৬,৫০০
				জাপানী	২০,০০০
	ক্যারোলাইনস	Mandated Territory	৩৭০	স্থানীয়	৩০,৫০০
				জাপানী	১১,০০০
	মার্শাল	Mandated Territory	৭৬	স্থানীয়	১০,০০০
				জাপানী	৬০০
	বোনিনস	মূল জাপানের অংশ	৪০	জাপানী	৭,০০০
৮। ওলন্দাজ	জাভা	ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ Netherlands Indies	৫১,০৩০	ইন্দোনেশিয়ান	৫১,০০০.০০০
				চীনা	৬০০,০০০
				ইউরোপীয়ান	২২০,০০০
				অন্যান্য এসিয়াবাসী	২৫,০০০

শাসক সম্প্রদায়	জায়গা	শাসনতন্ত্র	আয়তন বর্গ মাইল	প্রধান প্রধান জাতির লোকসংখ্যা	
ওলন্দাজ	সুমাত্রা	ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ Netherlands Indies*	১৮২,৮৭০	ইন্দোনেশিয়ান	৮,৫০০,০০০
				চীনা	৫০০,০০০
				ইউরোপীয়ান	৩০,০০০
				অন্যান্য এশিয়াবাসী	৩৫,০০০
	ডাচ বোর্ণিও	ঐ	২০৮,২৯০	ইন্দোনেশিয়ান	২,৪০০,০০০
				চীনা	১৭০,০০০
				ইউরোপীয়ান	৬,৫০০
				অন্যান্য এশিয়াবাসী	১৫,০০০
	সেলিবিস	ঐ	৭২,৯৮৬	ইন্দোনেশিয়ান	৪,৭৫০,০০০
				চীনা	৫০,০০০
				ইউরোপীয়ান	৯,০০০
				অন্যান্য এশিয়াবাসী	১৫,০০০

শাসক সম্প্রদায়	জায়গা	শাসনতন্ত্র	আয়তন বর্গ মাইল	প্রধান প্রধান জাতির লোকসংখ্যা	
ওলন্দাজ	লেসার সুনডাস	ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ Netherlands Indies	২৮,৪২২	ইন্দোনেশিয়ান	৪,০০০,০০০
				চীনা	২০.০০০
				ইউরোপীয়ান	১,৭৫০
				অন্যান্য এশিয়াবাসী	৬,০০০
	মলাক্কাস	ঐ	৩২,৪২২	ইন্দোনেশিয়ান	৬০০,০০০
				চীনা	৬,৫০০
				ইউরোপীয়ান	৪,৫০০
				অন্যান্য এশিয়াবাসী	৪,০০০
	ডাচ নিউগিনি	ঐ	১৬০,৬৯০	স্থানীয়	৪৫০ ০০০
				চীনা	১,৫০০
				ইউরে:পীয়ান	৪০০
৯। নিউজিল্যাণ্ড	পশ্চিম স্যামোয়া	Mandated Territory	১,১৩০	স্থানীয়	৬১.০০০
				আধা-দেশীয়	৩.০০০
				শ্বেত	৩০০

শাসক সম্প্রদায়	জায়গা	শাসনতন্ত্র	আয়তন বর্গ মইল	প্রধান প্রধান জাতির লোকসংখ্যা	
নিউজিল্যাণ্ড	কুকদ্বীপ ও নিউয়ি	Dependency	২৯৯	স্থানীয়	১৭,৫০০
				শ্বেত	৩০০
	টোকলাউ দ্বীপ	Dependency	৭	স্থানীয়	১,২০০
১০। পর্তুগাল	পোর্ট টাইমর	Province	৭,৩৩০	স্থানীয়	৪৭৫,০০০
				চীনা	৫০০
				শ্বেত	২০০
১১। আমেরিকার যুক্তরাজ্য	ফিলিপাইন	কমন ওয়েল্‌থ In transition to Indepenence	১১৪,৪০০	ফিলিপিনো	১৭,০০০.০০০
				চীনা	১২০.০০০
				জাপানী	৩০ ০০০
				শ্বেত	১৯.০০০

শাসক সম্প্রদায়	জায়গা	শাসনতন্ত্র	আয়তন বর্গ মাইল	প্রধান প্রধান জাতির লোকসংখ্যা	
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	হাওয়াই	Organised Territory	৬,৪৩৫	এশিয়াবাসী	২৫০,০০০
				শ্বেত	১১০.০০০
				আধা হাওয়াইয়ান	৪৫,০০০
				হাওয়াইয়ান	২১,০০০
				অন্যান্য	৯,০০০
	গুয়াম	Territory	২১০	চামোরো	২৪,০০০
				শ্বেত	৮০০
				ফিলিপিনো	৬০০
				অন্যান্য এশিয়াবাসী	৮০০
	আমেরিকান সামোয়া	ঐ	৭৬	স্থানীয়	১৩,০০০
				আধা-দেশীয়	১,৫০০
				শ্বেত	৪০০

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপাবলির ক্রম ইতিহাস

সম্ভবতঃ ৫০০,০০০ বছর আগের কথা: জাভা 'এপম্যান Pithecan thropusi জাভায় বসবাস।

সম্ভবতঃ ২৫,০০০ বছর আগের কথা: Australoid ও Negritoid জাতীয় লোকের মালয়েশিয়ায় আগমন এবং সম্ভবতঃ ৮০০০ হাজার বছর পূর্বে ইন্দোনেশিয়ান ও পরে মালয়ী জাতের লোকের আগমন।

সম্ভবতঃ ৫০০—২০০ খৃষ্ট জন্মের পূর্বে: প্রথম ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মালয়েশিয়ায় আগমন ও বসতি স্থাপন।

খৃষ্টযুগের প্রারম্ভে: আরবীয়ান ও চীনারা মালয়েশিয়ায় এসেছে। পলিনেশিয়ানদের পূর্ব পুরুষেরা পূর্ব মালয়েশিয়া থেকে দক্ষিণ সমুদ্রে পাড়ি জমায়।

৪১৩: চীনা পরিব্রাজক Fa-Hsien এর লেখায় পশ্চিম জাভায় সুগঠিত রাজ্যের উল্লেখ।

৬৮৩: শিলালিপিতে সুমাত্রার পেলেমবাংয়ে শ্রীবিজয় (Srivishaya) রাজ্যের উত্থানের উল্লেখ।

৭৫০-৮৫০: মধ্য জাভায় বরভুধরের বেদীমূল নির্মাণ।

৯৩৯: চীনাদের কবল হতে আনামদের স্বাধীনতা লাভ, কম্বোজ ও চম্পা রাজ্য ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

৯৮২: চীনা পুরাদপ্তরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রথম উল্লেখ।

১২২৫: চীনা কাষ্টম অফিসার Chau-Ju-Kua কর্তৃক শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের বর্ণনা।

১২৯২ : মালয়েশিয়ার ভিতর দিয়ে মার্কোপোলোর চীন থেকে নৌপথে দেশযাত্রা ; পূর্ব জাভায় মাঝপীঠ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত।

১৩৫০ : বংশকুলজি অনুযায়ী নিউজিল্যাণ্ডে পলিনেশিয়ানদের বসতি স্থাপনের কাছাকাছি সময়। পলিনেশিয়ানরা ইতিমধ্যে পূর্বাঞ্চলের ভূভাগে ছড়িয়ে পড়েছে দলে দলে।

১৩৭৭ : মাঝপীঠ তখন ক্ষমতার উচ্চ শিখরে। মাঝপীঠ জাভানীজ কর্তৃক শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য ধ্বংস।

১৪০৫ : Chung Ho'র নেতৃত্বে চীনাদের বিরাট নৌ অভিযান ; মালয়েশিয়া ভ্রমণ ; চীনের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তার ; ১৪০৮ ও ১৪১২ খৃষ্টাব্দে আরো কয়েকটি অভিযান।

১৪১০ : মালাক্কার বন্দর মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকার এবং মালয়েশিয়া অভিযানের ঘাঁটিতে পরিণত।

১৪৭৮ : মুসলমান শক্তি কর্তৃক মাঝপীঠ বিজয়।

১৫১১-১৪ : পর্তুগীজরা মালাক্কা ও 'মসলাদ্বীপপুঞ্জ' অধিকার করে।

১৫৬৫ : ফিলিপাইন ও পশ্চিম মাইক্রোনেশিয়াতে স্প্যানিশ আধিপত্য বিস্তার।

১৫৯৬ : পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজ অভিযান, ১৬৪১ সালের মধ্যে তারা এসব স্থানের পর্তুগীজ অধিকার পর্যুদস্ত করে ফেলে।

১৭৬৮-৭৯ : কুকের নৌ-যাত্রা। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের ছক রচনা।

১৭৮৮ : অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথম বৃটিশ বসতি স্থাপন।

১৮২৮ : ডাচদের পশ্চিম নিউগিনি অধিকার।

১৮৪২ : ফরাসীরা তাহিতি অধিকার করে এবং চতুপার্শ্বস্থ দ্বীপে রাজ্য বিস্তার করে। ১৮৫৬ সালে নিউ ক্যালিডোনিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত।

১৮৬৩ : দক্ষিণ সমুদ্রে আবাদ উন্নয়ন এবং কাজেই কুলী চালান ব্যবসা সুরু।

১৮৭৪ : ফিজি ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত; এক বছর পরে ঐ অঞ্চলে আইন শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় ব্রিটিশ হাইকমিশন গঠিত।

১৮৮১ : ব্রিটিশ নর্থ বোর্ণিও কোম্পানীর নর্থ বোর্ণিও উন্নয়নের চার্টার লাভ।

১৮৮৪ : জার্মাণী কর্তৃক সুদূরতম উত্তর নিউগিনি অধিকার। ব্রিটিশের পাপুয়া গ্রাস। এক বছর পরে জার্মানদের মার্শাল দ্বীপের কর্তৃত্বভার গ্রহণ।

১৮৮৭ : আমেরিকার যুক্তরাজ্যের হাওয়াইয়ের পার্লহারবার দখল।

১৮৯৮ : স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ; আমেরিকার যুক্তরাজ্য কর্তৃক ফিলিপাইন, গুয়াম ও হাওয়াই অধিকারভুক্ত।

১৮৯৯ : যুক্তরাজ্য ও জার্মাণীর মধ্যে সামোয়া ভাগাভাগি। টোংগা রাজ্য ব্রিটিশের করতলগত।

১৯০০ : অষ্ট্রেলিয়ার ছয়টি কলোনী মিলিত হয়ে একটি কমনওয়েলথ বা যৌথ রাজ্য গঠন।

১৯০৬ : নিউ হেবরাইডসে ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক সম্মিলিত 'Condominium' স্থাপন।

১৯১৪ঃ মিত্রশক্তি কর্তৃক জার্মাণ কলোনী অধিকারঃ ১৯২ সালে লীগ অফ নেশানের অছিগিরির কর্তৃত্ব।

১৯৩৬ঃ ফিলিপাইনকে অন্তর্বর্তীকালীন স্বাধীনতা প্রদান এবং ১৯৪৬ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি।

১৯৩৬ঃ ক্যানটন ও এনডারবারী দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটেন ও আমেরিকার যৌথ কর্তৃত্ব।

১৯৩৯ঃ প্রশান্ত মহাসাগরের ব্রিটিশ ফ্রান্স ও ডাচ সাম্রাজ্যে যুদ্ধ বিস্তার।

এই লেখকদের লেখা

গ্রেট হাঙ্গার (২য় সংস্করণ)

পাওয়ার অব্ এ লাই

— জোহান বয়ার

কিসলিয়াকফ

—রোমানফ্

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

শিশির সেনগুপ্তের উপন্যাস

সূর্যতপস্যা